# আমার ছেলেবেলা



ম্যাক্সিম গোর্কি

দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেড
২২।১, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সিংহ

প্রীতিনিলয়েষু

# মুখবন্ধ



আলেকসি ম্যাকসিমিচ পিয়েশকফ 'ম্যাক্সিম গোর্কি' এই ছদ্মনামে জগতে সুপরিচিত। পিয়েশকফের জীবন অতি দুঃখময়। তাই তিনি 'গোর্কি' এই উপাধি নিয়েছিলেন। জগতে আজ নূতন চিন্তাধারার আবির্ভাব হয়েছে এবং নূতন সভ্যতার উদয় হচ্ছে। গোর্কি তার অগ্রদূত। রুষ-সাহিত্যে লিও টলষ্টয়ের প্রভাব সব চেয়ে বেশি এ কথা যদি বলা চলে তবে গোর্কির প্রভাবও যে এ-যুগের বিশ্বসাহিত্যে ছড়িয়ে পড়েছে, এ কথা বললেও বেশি বলা হয় না। গোর্কি নিজে যেমন সমাজের নিম্নস্তর থেকে উন্নীত হয়ে পৃথিবীর সর্ব্বকালের, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের মধ্যে সগৌরবে নিজ বিশিষ্ট আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তেম্নি তাঁর সাহিত্যেও প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে নিম্নস্তরের, নিপীড়িত ও দুঃস্থ জনগণ। তিনি সত্যকে আহরণ করেছেন মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে। গোর্কি যে-আত্মচরিত রচনা করেছেন তা অতি বিরাট এবং উপন্যাসের মতোই সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক। তনি এই গ্রন্থখানির নাম দিয়েছিলেন 'আমার ছেলেবেলা।' কি দুঃখময় ও প্রতিকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যে যে তিনি পুষ্ট হয়েছেন তা বিদ্বেষহীন অন্তরে, সত্যকে কোথাও অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন; নিজকে কখনও অসাধারণ বলে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নি। গ্রন্থখানি পাঠকালে সাধারণ ব্যক্তিও অনুভব করবেন, গোর্কি যেন তাঁরই দুঃখময় জীবনের ঘটনাবলী, শোচনীয় পরিবেষ্টনী ও তার মাঝে মাঝে উজ্জ্বল, মধুর মুহূর্ত্তগুলিকে সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় বর্ণনা করছেন। অতিরঞ্জনের রঙ তাতে নেই!

আমি গ্রন্থখানি অবিকল অনুবাদের চেষ্টা করেছি। তবুও নানা ত্রুটি রয়ে গেছে। মেসার্স বুক এম্পোরিয়াম লিমিটেডের মতো বিশিষ্ট প্রকাশকের সাহায্য লাভ না করলে গ্রন্থখানির প্রকাশ অসম্ভব হতো। এজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে মনের সব কথা বলা হয় না। শিল্পী শ্রীযুক্ত নির্মল মজুমদারকেও সাধুবাদ দিই। কারণ তিনি প্রচ্ছদচিত্রখানি এঁকেছেন বড় দরদ দিয়ে।

গোকির রচনার অনুবাদ বলে গ্রন্থখানি পাঠকসমাজে সমাদৃত হলে কৃতার্থ হব।

কলিকাতা
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

# আমার ছেলেবেলা

## প্রথম পরিচ্ছেদ



একখানি অপরিসর অন্ধকার ঘর। তার জানলাটির নিচে মেঝেয় আমার বাবা শাদা ও খুব লম্বা একটি পোশাক পরে শুয়ে ছিলেন। তার খালি পা দুখানির আঙুলগুলি ছিল অদ্ভুতভাবে বেরিয়ে, হাত দুখানি ছিল বুকের ওপর স্থির হয়ে, হাতের আঙুলগুলো ছিল বেঁকে আর হাসিভরা চোখদুটি ছিল দুটি কালো তাম্রমুদ্রা দিয়ে চেপে বন্ধ করা। তাঁর অসাড় মুখখানি থেকে জীবনের আলো গিয়েছিল নিভে। তিনি যে-রকম বিশ্রী ভাবে দাঁতগুলো বার করে ছিলেন তাতে আমার ভয় করছিল।

আমার মা লাল রঙের একটি পেটিকোট মাত্র পরে হাঁটুগেড়ে বসে বাবার লম্বা নরম চুলগুলো কপাল থেকে ঘাড় অবধি চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দিচ্ছিলেন। এই চিরুনিখানা দিয়েই আমি তরমুজের শাঁস চাঁচতে ভালবাসতাম। তিনি খাটো ও ভাঙা গলায় অনর্গল কথা বলছিলেন; বোধ হচ্ছিল, বিরামহীন অশ্রুধারায় তার ফোলা চোখ দুটি নিশ্চয় ভেসে যাবে।

দিদিমা আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মাথাটি ছিল গোল প্রকাণ্ড ও চোখ দুটি বড়, আর নাকটি স্পঞ্জের মতো। তাঁর গায়ের রঙ ছিল ময়লা, মনটি ছিল কোমল। তিনি মানুষটি ছিলেন আশ্চর্য্য রকমের কৌতুকময়ী। তিনিও অশ্রুবর্ষণ করছিলেন। তাঁর দুঃখ

আমার মায়ের দুঃখের সঙ্গে বেশ মিলে গিয়েছিল। তিনি কাঁপতে কাঁপতে বাবার দিকে আমাকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। কিন্তু আমি ভয়ে অস্থির হয়ে তাঁর দেহের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করছিলাম। আমি আগে কখনো বয়স্কদের কাঁদতে দেখিনি। দিদিমা বারবার যা বলছিলেন আমি তা বুঝতে পারছিলাম না।



তিনি বলছিলেন, "বাবার কাছ থেকে বিদায় নাও। তুমি ওকে আর দেখতে পাবে না। ও অকালে মারা গেছে।"

আমারও খুব অসুখ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আমি তখন সবে বিছানা থেকে উঠেছি। পরিষ্কার মনে পড়ে, আমার অসুখের প্রথম দিকে বাবা আমার বিছানাটির চারধারে আনন্দের সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করতেন। তারপর তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যান; তাঁর স্থান গ্রহণ করেন আমার দিদিমা। তিনি তখন ছিলেন আমার কাছে অপরিচিত।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

তিনি উত্তর দেন, "সেই ওপর থেকে, নিজ্‌নি থেকে। কিন্তু আমি এখানে হেঁটে আসিনি, স্টীমারে এসেছি। কেউ জলের ওপর হাঁটে না বুঝলে ক্ষুদে ভূত?"

তাঁর কথাগুলি আমার কাছে ঠেকল অদ্ভুত, দুর্বোধ্য, অলীক। কেননা বাড়িটার ওপর-তলায় থাকতো এক দাড়িওয়ালা জমকালো ইরানি, আর নিচ-তলায় মাটির নিচের কুঠুরিটাতে ছিল হলদে রঙের এক বুড়ো কালমুক। সে ভেড়ার চামড়া বেচতো। সিঁড়ির রেলিং বেয়ে উঠলেই ওপরে গিয়ে পৌঁছনো যেত। আর তার ওপর থেকে পড়ে গেলে গড়াতে গড়াতে যেতে হত সেই নিচের দিকে! আমি অভিজ্ঞতার ফলে এটা জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু ওখানে জল কোথায়? তাঁর কথাগুলো ভারী মজার বোধ হল।

জিজ্ঞেস করলাম, "আমি ক্ষুদে ভূত কেন?"

তিনি হেসে উত্তর দিলেন, "কেন ? তুমি এত গোলমাল কর বলে।"

তিনি কথাগুলি বললেন মিষ্ট করে, আনন্দে, সুমধুর স্বরে ; এবং সেই প্রথম দিন থেকেই আমি তার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করলাম। আমি তখন মনে মনে কামনা করতে লাগলাম, তিনি যেন আমাকে তাড়াতাড়ি সে-ঘর থেকে বার করে নিয়ে যান।



মা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখের জল ও কান্নার শব্দ আমার মনে এক বিচিত্র অশান্তি এনে দিল। সেই প্রথম আমি তাঁকে সেই অবস্থায় দেখলাম। তাকে বরাবর দেখেছি কঠোর, স্বল্পভাষী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল। তাঁর দেহটি ছিল অশ্বের মতো মজবুত। শক্তি ছিল প্রায় অসুরের মতো। হাত দুখানি ছিল ভীষণ বলিষ্ঠ। কিন্তু এখন তাঁর সেই দৃঢ়তা আর ছিল না ; তিনি থরথর করে কাঁপছিলেন, এবং হয়ে পড়েছিলেন একেবারে অসহায়। মাথার চুলগুলি দিয়ে বেণী রচনা করে তিনি মাথার চারধারে অতি পরিপাটি করে জড়িয়ে রাখতেন। তার ওপর পরতেন প্রকাণ্ড সুন্দর একটি টুপি। কিন্তু চুলগুলি এখন খসে পড়েছিল তাঁর খোলা কাঁধ ও মুখের ওপরে। তবে তখনও ছিল বেণী বাঁধা। সেই অংশটি বাবার ঘুমন্ত মুখের ওপর লুটোচ্ছিল। আমি অনেকক্ষণ ধরে সেই ঘরে থাকলেও মা একবারও আমার দিকে তাকান নি। অশ্রু-অবরুদ্ধ হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে বাবার চুলগুলি আঁচড়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতেও পারছিলেন না।

একটু পরেই কয়েকজন কবর-কাটা-ওয়ালা ও একজন সৈনিক এসে দরজায় উঁকি দিতে লাগলো।

সৈনিকটি রাগের সঙ্গে চীৎকার করে বললে, "সরে যাও ! শিগগির কর !"

জানলায় একখানা কালো রঙের শাল দিয়ে পর্দা করা ছিল ;

সেটা বাতাসে পালের মতো ফুলে উঠছিল। পালের মতো যে আমি তা জানতাম। কারণ বাবা আমাকে একদিন নৌকোয় বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কোন রকম আভাস না দিয়েই হঠাৎ ঝঞ্ঝা এসেছিল ছুটে। বাবা হাসতে হাসতে আমাকে তাঁর হাঁটুতে চেপে ধরে বলেছিলেন, "ও কিছু নয়। ভয় পেও না!"

হঠাৎ মা মেঝেয় ধপ করে পড়ে গেলেন, কিন্তু প্রায় তৎক্ষণাৎ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর শান্ত, শুভ্র মুখখানি হয়ে গেল নীল। তিনি বাবার মতো দাঁত বার করে চীৎকার করে বললেন, "দরজাটা বন্ধ করে দাও...আলেক্সি...বেরিয়ে যাও।"

আমাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে দিদিমা দরজাটার কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, "বন্ধুগণ! ভয় নেই, বাধা দিও না, খ্রীষ্টের দোহাই, সরে যাও। এটা কলেরা নয়, প্রসবের ব্যাপার...অনুনয় করছি তোমাদের। ভালো মানুষ তোমরা!"

একটা বাক্সের পিছনে অন্ধকার কোণে আমি লুকিয়ে রইলাম, এবং সেখান থেকে দেখলাম, মা কেমনভাবে মেঝেয় কুণ্ডলি পাকাচ্ছেন, হাঁপাচ্ছেন, দাঁত কড়মড় করছেন; আর দিদিমা তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে স্নেহ ভরে, আশা দিয়ে বলছেন:

"...ধৈর্য্য ধর, ভারুশা...ভগবান আমাদের সহায়..."

আমি ভয়ানক ভয় পেয়েছিলাম। তাঁরা দুজনে আর্ত্তনাদ করতে করতে বাবার পাশে মেঝেয় চারধারে হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন। তাঁর গায়ে তাঁদের গা লাগছিল। বাবা ছিলেন অবিচলিত, স্থির; প্রকৃত-পক্ষে তিনি হাসছিলেন। অনেকক্ষণ এই রকম গড়াগড়ি চললো। মা বার কয়েক উঠে দাঁড়ালেন, আবার পড়ে গেলেন, আর দিদিমা একটা বড়, কালো নরম বলের মতো ঘরের ভেতর থেকে বাইরে, বাইরে থেকে ভেতরে গড়িয়ে বেড়ালেন। হঠাৎ একটি শিশু কেঁদে উঠলো।

দিদিমা বললেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ। একটা খোকা!"

তিনি একটি মোমবাতি জ্বাললেন।

আমি সেই কোণটিতে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়ে থাকব। কারণ আমার আর কিছুই মনে নেই।



তারপরের যে-স্মৃতি আমার মনে রয়েছে, সেটি হচ্ছে এক বাদল দিনে একটি সমাধিক্ষেত্রের জনবিরল একটি কোণ। আমি একটা পিছল, আঠাল মাটির ঢিপির পাশে দাঁড়িয়ে কবরের খাদটার মধ্যে তাকিয়ে আছি। তার মধ্যে আমার বাবার কফিনটাকে সকলে নামিয়ে দিয়েছে। তার তলায় রয়েছে খানিকটা জল; কতকগুলো ব্যাঙও আছে। তাদের মধ্যে দুটো কফিনটার হলদে ডালাটার ওপর লাফিয়ে উঠেছে।

কবরটার পাশে ছিলাম আমি, দিদিমা, একজন সেকসটন—লোকটা জলে ভিজে গিয়েছিল—আর দুজন কবর-কাটা-ওয়ালা। তাদের হাতে ছিল শাবল, মুখে বিরক্তি।

আমরা সকলেই উষ্ণ বৃষ্টিধারায় ভিজে গিয়েছিলাম; ধারাগুলো পড়ছিল ক্ষুদে ক্ষুদে ফোঁটায় কাঁচের পুঁতির মতো।

সেকসটন সরে যেতে যেতে বলে উঠলো, "কবরটা বুজিয়ে দাও।"

দিদিমা মুখে শালের একটি কোণ চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগালেন। শালখানা দিয়ে তিনি মাথার ঢাকা করেছিলেন। কবর-কাটা-ওয়ালারা কফিনটির ওপর তাড়াতাড়ি মাটির তাল ফেলতে আরম্ভ করলে। ব্যাঙগুলো খাদটার গায়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলো। মাটির তালগুলো গিয়ে পড়তে লাগলো তাদের গায়ে। তাতে তারা খাদটার তলায় পড়ে যেতে লাগলো।

আমার কাঁধ ধরে দিদিমা বললেন, "এস, লেনিয়া।" কিন্তু আমার যাবার ইচ্ছে ছিল না তাই তাঁর হাত ছাড়িয়ে সরে গেলাম।

—"হে ভগবান, এর পর কি?" দিদিমা কথাগুলো বললেন, খানিকটা আমাকে ও খানিকটা ভগবানকে উদ্দেশ করে। এবং বিমর্ষভাবে মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।



কবরটা বুজিয়ে দেওয়া হয়ে গেলেও তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। কবর-কাটাওয়ালারা মাটিতে শাবল দুখানা ঢং করে ফেলে দিল। হঠাৎ বাতাসের একটা দমকা উঠে বৃষ্টি ধারাগুলোকে চারধারে ছড়িয়ে দিয়ে গেল থেমে। তারপর দিদিমা আমার হাত ধরে একটি পথ দিয়ে কিছুদূরে একটা গির্জায় নিয়ে গেলেন। পথটা ছিল কতকগুলো ক্রুশের মাঝখান দিয়ে।



সমাধিক্ষেত্র থেকে চলে আসতে আসতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কাঁদছ না কেন? তোমার কাঁদা উচিত।"

জবাব দিলাম, "আমি কাঁদতে চাই না।"

তিনি ধীরে বললেন, "যদি না চাও, কেঁদ না।"

তাতে খুব অবাক হয়ে গেলাম। কারণ আমি কাঁদতাম কদাচিৎ। কাঁদলেও দুঃখের চেয়ে রাগেই বেশি। তার ওপর আমার চোখে জল দেখলে বাবা হাসতেন, মা বলতেন, "খবরদার কেঁদ না!"

তারপর আমরা একখানা দ্রোশ্‌কিতে চড়ে একটা চওড়া, নোংরা রাস্তা দিয়ে চল্‌তে লাগলাম। রাস্তাটার দু'ধারে ছিল বাড়ির সারি বাড়িগুলো ছিল গাঢ় লালে রঙ-করা।

যেতে যেতে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, "সেই ব্যাঙগুলো বেরিয়ে আসতে পারবে?"

তিনি জবাব দিলেন, "কখন না। ভগবান ওদের মঙ্গল করুন।"

ভাবলাম, আমার বাবা-মা কখন এত ঘন ঘন এমন আপন মনে করে ভগবানের কথা বলেন না।

* * *

কয়েক দিন পরে আমার মা ও দিদিমা আমাকে একখানি ষ্টীমারে নিয়ে গেলেন। তাতে আমাদের একটি ছোট কেবিন ছিল।

আমার [illegible] ভাইটি ম্যাকসিম মারা গিয়েছিল। সে শুয়েছিল কোণে একখানা টেবিলের ওপর। তার দেহটি ছিল সাদা কাপড় দিয়ে মোড়া। তার ওপর ছিল লাল ফিতে জড়ানো। বোচকা-বুচকি ও ট্রাংকগুলোর ওপর উঠে আমি ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিলাম। ঘুলঘুলিটাকে আমার বোধ হচ্ছিল ঠিক [illegible] চোখের মতো। কাদা ও ফেনা ভরা জল সার্সিখানার গা বেয়ে অবিরাম পড়ছিল। একবার তা সার্সিখানাতে এত জোরে ধাক্কা দিলে যে, আমার গায়ে ছিটকে লাগলো; আমি চমকে উঠে পিছিয়ে মেঝেয় লাফিয়ে পড়লাম।

"ভয় নেই" বলে দিদিমা আমাকে লঘুভাবে দুহাতে তুলে বোচকা-বুচকির ওপর আমার জায়গাটিতে আবার বসিয়ে দিলেন। জলের ওপর ছাই রঙের ভিজে কুয়াসা স্থির হয়ে ছিল; থেকে থেকে দূরে ছায়ার মতো ডাঙা দেখা যাচ্ছিল, আবার তখনই তা কুয়াসা ও ফেনায় যাচ্ছিল ঢেকে। আমার মা ছাড়া আমাদের চারধারের প্রত্যেকটি সামগ্রীকে মনে হচ্ছিল কাঁপছে। মা তাঁর মাথার পিছনে হাতদুখানি যুক্ত করে দেওয়ালে হেলান দিয়ে স্থির শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মুখখানিকে দেখাচ্ছিল লোহার মতো কঠিন, অসাড়। তিনি লাগছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিতার মতো। তাঁর ফ্রকটাও আমার কাছে হয়ে উঠেছিল অচেনা।

দিদিমা বার কয়েক কোমল স্বরে বললেন, "ভারিয়া, তুমি কিছু খাবে না কি?"

মা মৌনতাও ভঙ্গ করলেন না বা তাঁর জায়গা থেকেও নড়লেন না।

দিদিমা আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন চুপি চুপি, কিন্তু মার সঙ্গে বলছিলেন জোরে সাবধান হয়ে, ভয়ে ভয়ে এবং যেটুকু বলছিলেন সেটুকুও কদাচিৎ। মনে করছিলাম, তিনি মাকে ভয় করেন আর সেটা বেশ বোঝাও যাচ্ছিল। বোধ হচ্ছিল, এই ভয়টাই আমাদের দুজনকে পরস্পরের কাছে এনেছিল।



মা হঠাৎ জোরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন: "সারাটফ! খালাসিটা কোথায়?"

কথাগুলো তিনি এমন হঠাৎ বললেন যে, চমকে উঠলাম।

আমার কানে অদ্ভুত, নতুন কথা! সারাটফ? খালাসি?

নীল পোশাক-পরা বলিষ্ঠ পলিতকেশ একটি লোক এসে কেবিনে ঢুকলো। তার হাতে একটি ছোট বাক্স। দিদিমা তার হাত থেকে সেটি নিয়ে তার মধ্যে আমার ভাইয়ের দেহটি রাখবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। দেহটি রাখা হলে বাক্সটি তুলে নিয়ে হাতখানা সামনে লম্বা করে দরজার কাছে গেলেন; কিন্তু হায়! তাঁর দেহটি ছিল এমন মোটা যে, সেই অপরিসর দরজাটা দিয়ে তিনি সোজা হয়ে বেরিয়ে যেতে পারলেন না। দরজাটার সামনে থমকে দাঁড়ালেন এবং এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যে, দেখে হাসি পেল।

মা তার কাছ থেকে ছোট বাক্সটি নিয়ে অধীর ভাবে বলে উঠলেন, "আচ্ছা মা!" তারপর দুজনেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন; আর আমি কেবিনটাতে পড়ে থেকে সেই নীল পোশাক-পরা লোকটিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

লোকটি আমার দিকে ঝুঁকে বললে, "তাহলে তোমার ক্ষুদে ভাইটি চলে গেল?"

—"তুমি কে?"

—"একজন খালাসি।"

—"আর সারাটফ কে ?"

—"সারাটফ হচ্ছে একটা শহর। জানালাটা দিয়ে তাকিয়ে দেখ। ঐ যে শহরটা।"

জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে মনে হল, ডাঙ্গাটি দুলছে। মায়িত কুয়াসার মাঝে সেটা অস্পষ্ট আংশিক ভাবে ফুটে উঠছিল। তাতে আমার মনে পড়ে গেল, একখানা গরম পাঁউরুটি থেকে সদ্য-কেটে-নেওয়া একটা বড় টুকরোর কথা।

জিজ্ঞেস করলাম, "দিদিমা কোথায় গেছে ?"

—"তার ক্ষুদে নাতিটিকে কবর দিতে।"

—"ওঁরা কি তাকে মাটিতে কবর দিতে গেলেন ?"

—"হাঁ, নিশ্চয়ই।"

যে-জীবন্ত ব্যাংগুলোকে আমার বাবার সঙ্গে কবর দেওয়া হয়েছিল খালাসিটিকে তাদের কথা বললাম।

সে আমাকে বুকে চেপে চুমো খেয়ে বললে, "আহা! তুমি বুঝতে পারছো না। ঐ ব্যাংগুলোর জন্যে দুঃখ করতে হবে না, করতে হবে তোমার মায়ের জন্যে। ভেবে দেখ শোকে তিনি কি রকম হয়ে পড়েছেন।"

তখন মাথার ওপর থেকে একটা গম্ভীর হুঙ্কার উঠলো: আমি আগেই জেনেছিলাম, ষ্টীমারে এই রকম শব্দ করে; তাই ভয় পেলাম না। কিন্তু খালাসিটি আমাকে মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলো, "আমাকে এখনই পালাতে হবে।"

পালিয়ে যাবার ইচ্ছেটা আমাকেও পেয়ে বসলো। সাহস করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। বাইরে অন্ধকার, সঙ্কীর্ণ জায়গাটিতে কেউ ছিল না; অদূরে সিঁড়ির গায়ের পেতল ঝক্ ঝক্ করছিল। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, লোকেরা থলি ও বোচকা-বুচকি হাতে

নিয়ে ষ্টীমার থেকে নেমে যাচ্ছে। তাতে বুঝলাম, আমাকেও যেতে হবে।

কিন্তু আমি যখন চাষীদের ভিড়ের মধ্যে গ্যাংওয়েটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারা সকলে আমাকে উদ্দেশ করে চীৎকার করতে লাগলো—"ছেলেটা কার?" কার ছেলে তুমি?"

কেউ জানে না।

অনেকক্ষণ ধরে তারা আমাকে ঠেলা দিল, ঝাঁকি দিল ও খোঁচা মারলো। শেষে এল সেই পলিতকেশ খালাসিটি। সে আমাকে ধরে তাদের বললে, "ছেলেটি হচ্ছে আস্ত্রাখানের; কেবিন থেকে এসেছে

সে আমাকে নিয়ে কেবিনে গেল, এবং সেই বোচকা-বুচকি-গুলোর ওপর আমাকে বসিয়ে রেখে চলে যেতে যেতে আঙুল নেড়ে শাসিয়ে বললে, "আমি তোমাকে মজা দেখাচ্ছি!"

মাথার ওপর গোলমালটা ক্রমেই কমে যেতে লাগলো। জল-স্রোতের টানে ষ্টীমারখানা তখন আর কাঁপছিল না বা দুলছিল না। কেবিনের জানলাটা গিয়েছিল বাইরের ভিজে দেওয়ালে ঢেকে ভেতরে অন্ধকার; বাতাসে দম আটকে যায়। মনে হল, সেই বোচকা-বুচকিগুলোই আরও বড় হয়ে আমাকে চেপে ধরছে অবস্থাটা হয়ে উঠলো ভয়ঙ্কর। ভাবতে লাগলাম, সেই শূন্য ষ্টীমারে আমাকে কি চিরকাল একা ফেলে রাখবে?

দরজাটির কাছে গেলাম, কিন্তু সেটি খুললো না, পিতলের হাতলটা ঘুরলোই না। তাই একটা দুধের বোতল নিয়ে আমার গায়ের সব জোর দিয়ে সেটাতে দিলাম এক ঘা। তার একমাত্র ফল হল এই, বোতলটা ভেঙ্গে দুধ আমার পায়ের ওপর পড়ে বুটজুতো বেয়ে পড়তে লাগলো গড়িয়ে। বিফলতায় ক্লিষ্ট হয়ে আমি বোচকাগুলোর ওপর লুটিয়ে পড়ে আস্তে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন আমার ঘুম ভাঙলো ষ্টীমারখানা তখন আবার চলছে, আর জানালাটা হয়েছে সূর্য্যের মতো উজ্জ্বল।

দিদিমা আমার কাছে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, আর ভ্রূ কুঁচকে কি যেন বিড় বিড় করে বলছিলেন। তাঁর মাথায় চুল ছিল প্রচুর। সেগুলো তাঁর কাঁধ ও বুকের ওপর দিয়ে হাঁটু অবধি পড়ে ছিল, এমন কি মেঝেয়ও ঠেকে ছিল। চুলগুলোর রং ছিল সাদা কালোয় মিশানো। সেগুলো মেঝে থেকে একহাতে তুলে এবং কষে ধরে একখানা কাঠের চিরুনি মোটা গোছাটাতে চেপে বসিয়ে আঁচড়াচ্ছিলেন। চিরুনিখানার দাঁড়া প্রায় ছিলই না। দিদিমার ঠোঁট দুখানি ছিল দুমড়ে, কালো চোখ দুটি জ্বল্ জ্বল্ করছিল আর মুখখানির চারধার ঘিরে ছিল চুলের রাশি। তাতে মুখখানিকে এত ছোট দেখাচ্ছিল যে, মজা লাগছিল। তার চোখ-মুখের ভাবটা ছিল নষ্টামি ভরা। কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম, তার চুলগুলো এত লম্বা কেন তখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কোমল, স্নিগ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই ভগবান আমাকে এগুলো শাস্তি-স্বরূপ দিয়েছেন…চুলগুলো আঁচড়ালেও কি রকম হয় দেখ…আমার বয়স যখন ছিল অল্প তখন এই চুলের জন্যে মনে হত গর্ব্ব; কিন্তু এখন বুড়ো হয়েছি এগুলোকে শাপ দিই। কিন্তু তুমি ঘুমোও। এখনও বেলা হয়নি। সবে রোদ উঠেছে।"

—"কিন্তু আমি আর ঘুমোতে চাই না।" তিনি বেণী রচনা করতে করতে মা যে-বারথটির ওপর চিৎ হয়ে অসাড়ে শুয়ে ছিলেন সেদিকে একবার তাকিয়ে বললেন, "বেশ, তাহলে ঘুমিও না। কাল বিকেলে তুমি এ বোতলটা কি করে ভাঙলে আমাকে চুপি চুপি বল তো।"

তিনি কথা বলবার সময় এমন বিচিত্র সুসংবদ্ধ শব্দ ব্যবহার করতেন যে, তা আমার স্মৃতিতে সুগন্ধি, উজ্জ্বল, অমর কুসুমের

মত ফুটে থাকতো। তিনি যখন হাসতেন তখন তাঁর কালো মধুময় চোখ দুটির তারকা বিস্তৃত হয়ে এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, আর তার শক্ত সাদা দাঁতগুলি আনন্দে ঝক্ ঝক্ করতো। তাঁর রঙ ছিল ময়লা ও মুখে ছিল অসংখ্য রেখা; তবুও তাঁর চেহারাটি ছিল যৌবনশ্রীমাখা ও উজ্জ্বল। যা তাঁর শ্রী নষ্ট করে দিয়েছিল তা ছিল তাঁর গোল নাকটি ও লাল ঠোঁট দুখানি। তাঁর নস্য নেওয়ার অভ্যাস ছিল। তার ফলে নাকের ছিদ্র দুটো হয়ে গিয়েছিল বড়। তাঁর নস্যের কৌটোটা ছিল কালো, রুপোবাঁধানো। মদেও তার আসক্তি ছিল। বাইরে তার চারধারের সব কিছু ছিল কালো কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন এক অমর, আনন্দময় ও দীপ্ত শিখায় আলোকিত সেই আলোক প্রকাশিত হত তার দুই চোখে। বয়সের ভারে তিনি নুয়ে পড়লেও, প্রায় কুঁজো হয়ে গেলেও প্রকাণ্ড মার্জারটির মতো লঘুপায়ে প্রায় নিঃশব্দে চলাফেরা করতেন। আর এই সোহাগপ্রিয় প্রাণীটির মতোই ছিলেন নিরীহ।

যতদিন না তিনি আমার জীবনের মাঝে এসে পড়েছিলেন ততদিন আমি যেন ছিলাম ঘুমিয়ে, অন্ধকারের মাঝে ডুবে। তিনি এসে আমাকে জাগিয়ে দিনের আলোয় নিয়ে গেলেন। আমার মনে যে-সব ছাপ পড়তো তিনি সেগুলিকে একসূত্রে গেঁথে তাই দিয়ে নানা রঙের একখানি নক্সা বুনেছিলেন। এই ভাবে তিনি নিজেকে করে তুলেছিলেন আমার জীবনের বন্ধু, আমার অন্তরের নিকটতম মানুষটি সকলের চেয়ে প্রিয় ও সকলের চেয়ে পরিচিত। আর, তাঁর সকলের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আমাকে করে তুলেছিল ঐশ্বর্য্যময় এবং আমার মধ্যে গড়ে তুলেছিল সেই শক্তি কঠোর জীবন-যাত্রায় যা একান্ত প্রয়োজন।

* * * *

চল্লিশ বছর আগে স্টীমার চলতো মন্থর গতিতে। নিজ্‌নি পৌঁছতে আমাদের অনেক সময় লাগলো। সৌন্দর্য্যে কানায় কানায় ভরা সেইদিনগুলি আমি কখন ভুলবো না।

ভাল আবহাওয়া শুরু হয়েছিল। সকাল থেকে রাত অবধি [illegible] ডেকে থাকতাম। আমাদের মাথার ওপর নির্মল আকাশ। শরতের আমেজ-দেওয়া [illegible] দুটি তট-ভূমির মাঝ দিয়ে [illegible] চলেছি [illegible] মতো, তাড়া নেই। আমাদের উজ্জ্বল লাল [illegible] স্টীমারখানির পিছনে লম্বা কাছি দিয়ে একখানি বজরা বাঁধা ছিল। বজরাখানি ধূসর-নীল জলের বুকে যখন উঠছিল-পড়ছিল [illegible] মনে হচ্ছিল গোসাপের মতো। বজরাখানার রঙ ছিল ছাইয়ের [illegible], [illegible] আমার চোখে লাগছিল, গাছের গায়ে যে বড় বড় [illegible] থাকে তার মতো।

[illegible] অসংখ্য [illegible] বুকে ভাসছিল। প্রতি ঘণ্টায় আমরা নতুন নতুন দৃশ্যের মাঝে গিয়ে পড়ছিলাম। সবুজ পাহাড়গুলো উঠে দাঁড়িয়েছিল ধরণীর গায়ে মহার্ঘ পরিচ্ছদের ভাঁজের মতো। তটভূমিতে ছিল নগর ও গ্রাম, জলে ভেসে যাচ্ছিল শরতের সোনালি রঙের পাতাগুলি।

স্টীমারের এক পাশ থেকে আর এক পাশে যেতে যেতে দিদিমা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বলে উঠছিলেন, "দেখ, সব কি সুন্দর!"

আনন্দে তাঁর মুখখানি উজ্জ্বল ও চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠছিল।

বেশির ভাগ সময়ই তীরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি আমাকে ভুলে যেতেন। হাত দুখানি বুকের ওপর যুক্ত রেখে হাসিমাখা মুখে নীরবে, জলভরা চোখে তিনি ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর স্কারটটা ছিল কালো, লতাপাতা-কাটা কাপড়ের। আমি তখন সেটা ধরে টানতাম।

তিনি চমকে উঠে বলতেন, "আহা, আমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম...স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।"

—"কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন?"



তিনি হেসে উত্তর দিতেন, "আনন্দে আর বুড়ো বয়সের জন্যে, মানিক। আমি বুড়ো হচ্ছি, বুঝলে—আমার মাথার ওপর দিয়ে ষাটটি বছর চলে গেছে।"



একটিপ্‌ নস্য নিয়ে তিনি আমাকে সদয় দস্যুর, পুণ্যাত্মা ব্যক্তির এবং নানা রকমের বন্য জন্তু ও দুষ্ট প্রকৃতি ভূত-প্রেতের অতি চমৎকার গল্প বলতে শুরু করতেন। তার কথাগুলি শুন্‌তে অনির্বচনীয় আনন্দ হ'ত।

আমি মন দিয়ে শুনতাম, এবং বলতাম, "আর একটা"। গল্পগুলির মধ্যে পেয়েছিলাম এই একটি :

"ষ্টোভের ভেতর আছে একটা বুড়ো ভূত। একবার তার থাবায় একটা গোঁজ ঢুকে গিয়েছিল। তখন যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট করতে করতে কেঁউ কেঁউ করে বল্‌তে লাগলো 'ও ক্ষুদে ইঁদুর, আমার বড় লাগছে,' 'ও ক্ষুদে ইঁদুর, আমি আর সইতে পারছি না।'"

দিদিমা একখানা পা তুলে সেটি হাত দিয়ে ধরে এদিক-ওদিক দোলাতে দোলাতে, মুখখানা এমনভাবে কোঁচকাতেন যে, দেখে হাসি পেত। তিনি এমন ভাব দেখাতেন যেন নিজেই আহত হয়েছেন।

মুখে লম্বা দাড়ি, নিরীহ প্রকৃতি খালাসিরা তাঁর চারধারে দাঁড়িয়ে শুনতো, হাসতো, গল্পগুলোর তারিফ করতো আর বলতো, "দিদিমা আর একটা।"

তারপর তারা বল্‌তো, "আমাদের সঙ্গে খাবে চল।"

খেতে বসে তারা তাঁকে দিত ভদ্‌কা আর আমাকে দিত তরমুজ।

এই কাজটা তারা করতো গোপনে। কারণ ষ্টীমারে একটা লোক ছিল. সে এধার-ওধার ঘুরে বেড়াতো আর সকলকে ফল খেতে বারণ করতো; ফল দেখলেই কেড়ে নিয়ে নদীতে দিত ফেলে। সে পদস্থ কর্মচারীর পোশাক পরতো আর সব সময় মাতাল হয়ে থাকতো, লোকে তার সামনে থেকে যেত সরে।



মা কদাচিৎ ডেকের ওপর আসতেন এবং আমাদের কাছ থেকে একেবারে তফাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি সব সময় থাকতেন চুপ করে। তার বিশাল, সুঠাম দেহ, দৃঢ় মুখখানি উজ্জ্বল কেশভারের বর্ণ-রচিত খোপাটি—তার চারধারের সব কিছু ছিল আঁট ও সবেট। তাকে আমার বোধ হ'ত, যেন কুয়াসা বা স্বচ্ছমেঘভারে ঘেরা। তার মাঝ দিয়ে তিনি ধূসর চোখে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তার চোখ দুটি ছিল দিদিমার মতোই বড়।

একবার তিনি কঠোর কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, "লোকে তোমাকে ঠাট্টা করছে মা."

দিদিমা অবিচলিত ভাবে উত্তর দেন, "ভগবান ওদের মঙ্গল করুন। করুক ঠাট্টা, ওদের কপাল ভাল হোক।"

মনে পড়ে, নিজনির দৃশ্য চোখে পড়তে দিদিমা ছেলেমানুষের মতো কিরকম আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। আমার হাত ধরে স্টীমারের পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলছিলেন, "দেখ! দেখ কি সুন্দর! ঐ নিজনি, ঐ! ওর চারধারে আছে স্বর্গীয় ভাব! ঐ গির্জাটাও দেখ। ওর ডানা আছে বলে মনে হচ্ছে না কি?" এবং মায়ের দিকে ফিরে প্রায় সজল চোখে বললেন, "ভারুশা, দেখ, দেখবে না? এখানে এস। বোধ হচ্ছে তুমি জায়গাটার কথা সব ভুলে গেছ। তুমি একটুও আনন্দ দেখাতে পারো না?"

মা ভ্রূকুটি করে তিক্ত হাসি হেসেছিলেন।

ষ্টীমারখানি সুন্দর নগরটির বাইরে এসে দুটি নদীর মাঝে একটা জায়গায় ভিড়লো। নদী দুটি ছিল নানা রকমের জলযানে অবরুদ্ধ, শত শত সরু মাস্তুল ওপর দিকে উঠেছে। একখানি বড় নৌকো আমার আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে ষ্টীমারখানির পাশে এসে লাগলো। গ্যাংওয়ের ডাণ্ডাটা ধরে নৌকোর যাত্রীরা একে একে ষ্টীমারে উঠলেন। কালো পোশাক-পরা খর্বাকার, শুষ্ক শীর্ণ একটি লোক সকলকে ঠেলে বেরিয়ে এসে সকলের আগে দাঁড়ালেন। তাঁর দাড়ির রঙ কটা, নাকটি পাখীর ঠোঁটের মতো, চোখ দুটি ধূসর।



ভাঙ্গা গলায় জোরে "বাবা" বলেই মা তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি মায়ের মুখখানি ধরে তাড়াতাড়ি তাঁর গাল দুখানিতে দুটি চড় দিয়ে বলে উঠলেন :

—"বোকা! কি হয়েছে তোমার?..."

দিদিমা সকলকেই তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন ও চুমো দিতে দিতে লাটিমের মতো ঘুরতে লাগলেন। তিনি আমাকে তাদের দিকে ঠেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন :

—"শিগগির! এই হচ্ছে মাইকেল-মামা, এই হল জাকফ, এই নাটালিয়া-মামী, এই হচ্ছে তোমার দুজন মামাতো ভাই—দুজনের নামই সাস্‌কা; এই ওদের বোন কাটেরিনা। এই আমাদের সমস্ত পরিবার। বড় নয় কি?"

দাদামশায় তাকে বললেন : "মা, তুমি বেশ ভাল আছ?" এবং তাঁরা তিনবার পরস্পরকে চুম্বন করলেন।

তারপর তিনি আমাকে লোকের ভিড়ের ভেতর থেকে টেনে নিয়ে আমার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন : "আর তুমি কে বাপু?"

বললাম, "আমি আস্ট্রাখানের ছেলে, কেবিন থেকে এসেছি।"

দাদামশায় আমার মায়ের দিকে ফিরে বললেন, "ও কি মাথা-মুণ্ডু

বলছে ?” এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমাকে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, “তুমি হচ্ছ বাপ্‌কো বেটা। নৌকোয় ওঠ।”



নৌকো থেকে সকলে ঘাটে নেমে রুক্ষ পাথর বাঁধানো একটা পথ দিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলো। পথটার দুপাশে খাড়াই। খাড়াই দুটো ছিল চাবড়া ঘাসে ঢাকা।



দাদামশায় আর মা যেতে লাগলেন আমাদের সকলের আগে। দাদামশায় ছিলেন আমার মায়ের চেয়ে মাথায় ছোট। তিনি ছোট ছোট পা ফেলে তাড়াতাড়ি হাঁটছিলেন। আর মা, তাঁর মুখের দিকে ঘাড় নিচু করে তাকাচ্ছিলেন। তাঁদের পরে যাচ্ছিলেন মাইকেল-মামা, আর স্ফূর্তিবাজ, মাথায় কোঁকড়া চুল জাকফ-মামা। মাইকেল-মামা ছিলেন দাদামশায়ের মতোই শুষ্ক, শীর্ণ। আর যাচ্ছিল রংচঙে পোশাক-পরা মোটা-সোটা কয়েকটি স্ত্রীলোক এবং ছ'টি ছেলে-মেয়ে। তারা সকলেই ছিল আমার চেয়ে বয়সে বড়। সকলেই চলছিল চুপ-চাপ করে। আমি যাচ্ছিলাম, দিদিমা আর নাতালিয়া-মামীর সঙ্গে। নাতালিয়া-মামীর মুখখানি ছিল বিষাদমাখা, চোখ দুটি নীল, দেহটি স্থূল। তিনি ঘন ঘন স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন, হাঁফাচ্ছিলেন আর ফিস্ ফিস্ করে বলছিলেন, “আমি আর হাঁটতে পারছি না।”

দিদিমা রাগের সঙ্গে বললেন, “ওরা তোমাকে আসবার কষ্ট দিলে কেন ? বেয়াকুফের দল !”

বয়স্কদের বা ছেলে-মেয়েদের কাউকেই আমার পছন্দ হল না। তাদের মধ্যে নিজেকে মনে হতে লাগলো, বিদেশী ; এমন কি দিদিমাও আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে গিয়েছিলেন।

সব চেয়ে খারাপ লাগছিল দাদামশায়কে। আমি তখনই বুঝতে পারলাম তিনি আমার শত্রু। তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে যে একটা

সতর্ক কৌতূহল জেগে উঠছিল সে বিষয়ে আমি সচেতন হয়ে ছিলাম।

অবশেষে আমরা গিয়ে পৌছলাম পথের শেষে।

ডান দিকের ঢালু জায়গাটার একেবারে ঠিক মাথায় বসানো ছিল পথটার প্রথম বাড়িখানি। নিচু, একতলা, শেওলাধরা লালচে রঙের কোঠা। তার অপরিসর ছাদটা যেন ঝুলছিল, জানলাগুলো ছিল বাইরের দিকে ঠেলে বার করা। রাস্তা থেকে বাড়িখানাকে দেখাচ্ছিল বড় কিন্তু ভেতরটা ছিল ছোট ছোট অন্ধকার কুঠুরিতে একেবারে ঠাসা। তার প্রতি অংশে ক্রুদ্ধ লোকজন পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করছিল, আর সমস্ত জায়গাটা জুড়ে ছিল বিশ্রী গন্ধ।

আমি আঙিনায় গেলাম সে জায়গাটাও লাগলো বিশ্রী। সেখানে সর্ব্বত্র ছড়ানো ছিল বড় বড় ভিজে কাপড় আর বসানো ছিল ময়লা জলভরা টব। টবগুলোর ভেতর আবও যে-সব কাপড় ছিল জলের রং ছিল সেই রকমের। সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়া একটা ছাপড়ের কোণে একটা ষ্টোভে দাউ দাউ করে জ্বলছিল কাঠ। ষ্টোভটাতে কি যেন সিদ্ধ বা সেঁকা হচ্ছিল আর একজন অদৃশ্য ব্যক্তি এই অদ্ভুত কথাগুলো বলছিল ঃ "স্যানটালাইন, ফুক্সিন, ভিট্রিওল।"



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তারপর শুরু হল এক জমাট, বিচিত্র, অবর্ণনীয় নতুন জীবন। এবং তা বিস্ময়কর দ্রুত গতিতে বয়ে যেতে লাগলো। এই জীবনটির কথায় আমার মনে পড়ে একটি অপরিমার্জ্জিত গল্প। গল্পটি বলা হয়েছিল বেশ। কিন্তু যে বলেছিল সে উৎকট সত্যপ্রিয় প্রতিভা। এখন সেই অতীতের কথা মনে করে, কালের এই দূর ব্যবধানে, আমার পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন যে, যেমন দেখেছিলাম সে-সব প্রকৃতই ছিল সেই রকমের

সেই সত্য ঘটনাগুলিকে অস্বীকার করতে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি—অবাঞ্ছিত আত্মীয়ের বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাত্রার কঠোরতার কথা ভাবতে বেদনা জাগে। কিন্তু সত্য হচ্ছে অনুকম্পার চেয়ে প্রবল। তা ছাড়া আমি নিজের কথা লিখছি না, লিখছি অপ্রীতিকর ঘটনাবলীর, সেই সম্পূর্ণ শ্বাসরোধকারী পরিবেষ্টনির কথা, যার মধ্যে এই শ্রেণীর রুষদের অধিকাংশই তখন বাস করতো—এমন কি আজও করে।

আমার দাদামশায়ের বাড়িখানি গৃহবিবাদে একেবারে গরম হয়ে থাকতো। বয়স্কেরা তো এই বিষে আক্রান্ত ছিলই, এমন কি, ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও তা সংক্রামিত হয়ে ছিল। আড়াল থেকে দিদিমার কথাবার্তা শুনে বুঝেছিলাম, মামারা যেদিন দাদামশায়ের কাছ থেকে তার বিষয়টি ভাগ করে নিতে চাইছিলেন মা এসে পৌছন ঠিক সেই দিন। তার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব তাঁদের এই বাসনাকে আরও তীব্র ও প্রবল করে তোলে। কারণ তাঁদের ভয় হয়েছিল, মাকে বিয়ের সময় যে-যৌতুক দেবার কথা ছিল—দাদামশায়ের অমতে ও গোপনে বিয়ে করার জন্যে তিনি মাকে তা দেন নি—মা বুঝি এখন সেটা চাইবেন। মামারা মনে করতেন এই টাকাগুলো তাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া উচিত। এরই সঙ্গে ছিল আবার তাঁদের মধ্যে অনেকদিনের এক বিবাদ। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে এই নিয়ে প্রবল বিবাদ করছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে কে শহরে, কে বা ওকা-নদীর তীরে কুনাভিন-গ্রামে একটা কারখানা খুলবেন।

আমাদের পৌঁছবার অল্পকাল পরে, একদিন, খাবার সময় হঠাৎ ঝগড়া বাধলো। মামারা উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর ভর দিয়ে দাদা-মশায়কে চীৎকার করে নানা কথা বলতে লাগলেন। কথাগুলো বলতে বলতে তাঁরা কুকুরের মতো দুলতে ও দাঁত বার করতে শুরু করলেন। আর দাদামশায় মুখ-চোখ লাল করে, টেবিলে একটা চামচ ঠুকতে

ঠুকতে তীক্ষ্ণ গলায় চীৎকার করে বলতে লাগলেন, "আমি তোমাদের বাড়ি থেকে বার করে দেব।" তাঁর গলার স্বরকে আমার মনে হতে লাগলো মোরগের ডাকের মতো।

দিদিমা বেদনায় মুখখানি বিকৃত করে বললেন, "ওরা যা চাইছে তাই দাও, বাবা। তাহলে তুমি কিছু শান্তি পাবে।"

দাদামশায় জলজলে চোখে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠলেন, "চুপ কর নির্বোধ।" তিনি মানুষটি ছিলেন ছোট-খাট, কিন্তু এমন জোরে চীৎকার করলেন যে, কানে তালা ধরে গেল। তাঁর পক্ষে এমন চীৎকার বড়ই আশ্চর্য্যের।

মা টেবিল থেকে উঠে শান্তভাবে জানলার কাছে গিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন।

মাইকেল-মামা তাঁর ভাইয়ের মুখে হাতের উল্টো দিক দিয়ে হঠাৎ মারলেন চড়। আর তিনি রাগে হুঙ্কার দিয়ে তাকে চেপে ধরলেন এবং দুজনেই মেঝেয় পড়ে গড়াগড়ি দিতে দিতে পরস্পরকে গাল দিতে লাগলেন। ছেলে-মেয়েরা কাঁদতে আরম্ভ করলো। নাতালিয়া-মামী ছিলেন অন্তঃস্বত্ত্বা। তিনি সরু গলায় পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলেন। মা তাঁকে জড়িয়ে ধরে বাইরে কোথায় টেনে নিয়ে গেলেন। নার্স ইউজেনিয়া ছেলে-মেয়েগুলোকে রান্না ঘর থেকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। চেয়ারগুলো গেল পড়ে। ফোরম্যান সিগানক মাইকেল-মামার পিঠের ওপর চেপে বসলো আর কারখানার সর্দ্দার গ্রেগরি আইভানোভিচ শান্তভাবে মামার হাত দুখানা তোয়ালে দিয়ে বেঁধে ফেললো। গ্রেগরির মাথায় ছিল টাক, মুখে দাড়ি, চোখে রঙিন চষমা। সিগানক ছিল বলিষ্ঠ, তরুণ।

মাইকেল-মামা মাথা ঘুরিয়ে মেঝেতে তাঁর পাতলা, লম্বা, কালো দাড়ি লুটোতে লুটোতে ভয়ঙ্কর গালাগাল দিতে লাগলেন। আর,

দাদামশায় টেবিলের চারধারে ছুটতে ছুটতে তিক্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "এরা হচ্ছে ভাই…রক্তের সম্পর্ক !…ধিক তোদের !"



আমি ঝগড়ার গোড়াতেই ভয়ে ষ্টোভের ওপর লাফিয়ে উঠেছিলাম। সেখান থেকে বেদনায় বিস্ময়ে দেখছিলাম দিদিমা জাকফ-মামার থেঁৎলানো মুখখানা একটি ছোট জল-পাত্রে ধুইয়ে দিচ্ছিলেন, আর মামা কাঁদছিলেন, পা ঠুকছিলেন। দিদিমা ব্যথিতকণ্ঠে বললেন, "শয়তানগুলো ! তোরা একটা বুনো জানোয়ার পরিবারের চেয়ে একটুও ভাল নয়। কবে তোদের জ্ঞান হবে ?"

দাদামশায় তাঁর ছেঁড়া শার্টটা কাঁধের ওপর দিকে টান্‌তে টান্‌তে তাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, "তাহলে তুমি বুনো জানোয়ারের জন্ম দিয়েছ, অ্যাঁ, বুড়ী ?"

জাকফ-মামা বেরিয়ে গেলে দিদিমা একটি কোণে গিয়ে দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে মেরীকে উদ্দেশ বলতে লাগলেন : "হে ঈশ্বরের জননি, আমার ছেলেদের চৈতন্য জাগিয়ে দাও মা।"

দাদামশায় তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। টেবিলের ওপর যা-কিছু ছিল সব উল্টে বা চলকে পড়ে গিযেছিল। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "তুমি কখন ওদের আর ভারিয়ার কথা ভাব মা ?…কার স্বভাব সবচেয়ে ভাল ?"

—"দোহাই তোমার, চুপ কর ! শার্টটা খুলে ফেল আমি সেলাই করে দেব…" বলে দিদিমা হাত দুখানি দাদামশায়ের মাথায় রেখে তার কপালে চুমো দিলেন, আর দাদামশায়—তাঁর তুলনায় এত ছোট—তাঁর মুখখানি দিদিমার কাঁধে চেপে ধরে বললেন, "ওদের অংশ আমাদের দিতেই হবে, মা। এটা একেবারে সাদা কথা !"

—"হাঁ, বাবা, তাই-ই করতে হবে।"

দুজনে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। প্রথমে কথাবার্তা চললো বেশ

বন্ধুর মতো, কিন্তু বেশিক্ষণও কাটলো না, লড়াইয়ের আগে মোরগের মতো পা দুখানা মেঝেয় ঘষে. দিদিমাকে একটি আঙুল তুলে শাসিয়ে দাদামশায় রুক্ষ কণ্ঠে বল্‌লেন, "আমি তোমাকে জানি! তুমি ওদের আমার চেয়েও বেশি ভালোবাস···তোমার মিশকা কি? তোমার জামাই বা কি? আমি যে-ধর্ম্ম মানি ওরা সে-ধর্ম্ম মানে না···অথচ ওরা আমার খায়···গলগ্রহ! ওরা একেবারে ভাই!"



সেই সময় অস্থিরভাবে ষ্টোভের ওপর পাশ ফিরতেই ঠেলা লেগে একটা ইস্ত্রি বজ্র শব্দে নিচে পড়ে গেল।

দাদামশায় লাফ দিয়ে সিঁড়ির ওপর উঠে আমাকে টেনে নামিয়ে এমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন তিনি আমাকে সেই প্রথম দেখছেন।

বললেন, "কে তোমাকে ষ্টোভের ওপর তুলে দিয়েছিল? তোমার মা?"

—"আমি নিজেই উঠেছিলাম।"

—"মিছে কথা বল্‌ছো!"

—"না। আমি ওখানে নিজেই উঠেছিলাম। আমার ভয় করছিল।"

আমার মাথায় আলগোচে একটি চড় মেরে আমাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে বললেন, "বাপের মতো! আমার সামনে থেকে সরে যাও!"

আমিও তখন রান্নাঘর থেকে পালাতে পারলে খুব খুশি।

*　　*　　*　　*　　*

দাদামশায়ের শঠতাময়, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে আমাকে সর্ব্বত্র অনুসরণ করতো এ বিষয়ে আমি খুব সচেতন ছিলাম। আমি তাঁকে ভয় করতাম। মনে পড়ে, কিভাবে আমি সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি থেকে সব সময়ে লুকোতে চাইতাম। আমার বোধ হত দাদামশায় ছিলেন

দুষ্টপ্রকৃতির। তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে বিদ্রূপ করে বা তার আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলতেন। তার কথায় রাগ হত। সেই জন্যে লোকের মেজাজ খারাপ করে দেবার তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।



প্রায়ই তাঁর বুলি ছিল, "উফ্! উঃ!"



শব্দটা শুনলেই আমার মনে জাগে কেমন একটা দুঃখ-বেদনার ভাব। জলখাবার ছুটি হলে তিনি, আমার মামারা আর কারিগরেরা শ্রান্তক্লান্ত হয়ে রান্নাঘরে চা খেতে আসতেন।



কারিগরদের হাতে দুখানা থাকতো স্যানটালাইনের দাগে ভরা ও সালফিউরিক অ্যাসিডে পোড়া, মাথার চুলগুলো বাঁধা থাকতো কাপড়ের ফালা দিয়ে। তাদের সকলকে দেখাতো রান্নাঘরের কোণে কালো বিগ্রহটার মতো। সেই সময়টি ছিল আমার ভয়ের। তখন দাদামশায় বসতেন আমার সামনে। আর সব ছেলে-মেয়েদের মনে হিংসা জাগিয়ে তিনি তাদের চেয়ে আমার সঙ্গেই কথা বলতেন বেশি। তাঁর চালধারের সব কিছু ছিল তীক্ষ্ণ ও একেবারে ঠিক মতো। তার রেশমে কারুকার্য্য-করা মোটা সাটিনের ওয়েষ্টকোটটা ছিল পুরনো, রঙিন সুতি কাপড়ের শার্টটা ছিল কোঁকড়ানো। শার্টটাকে কাচা হত খুব বেশি। তার পাজামার হাঁটুতে ছিল বড় বড় তালি। তবুও মনে হ'ত তার পোশাক তাঁর ছেলেদের চেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। তাঁর ছেলেরা পরতো নকল শার্ট ও রেশমের নেকটাই।

আমাদের পৌছবার কিছুদিন পরে তিনি আমাকে প্রার্থনা শিখাবার ব্যবস্থা করলেন। আর সব ছেলে-মেয়েরা ছিল আমার চেয়ে বয়সে বড়। তাদের আগেই লিখতে-পড়তে শিখানো হয়েছিল। নাতালিয়া-মামী ছিলেন নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। তিনি আমাকে আস্তে আস্তে শিক্ষা দিতেন। তাঁর মুখখানি ছিল ছেলে-মানুষের মতো; চোখ দুটি ছিল এমন স্বচ্ছ যে, আমার বোধ হ'ত তার ভেতর

দিয়ে তাকালে তাঁর মাথার ভিতর পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। আমি একভাবে অপলক চোখে তাঁর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালবাসতাম। যখন তিনি মাথা ঘুরিয়ে, খুব আস্তে, প্রায় চুপে চুপে কথা বলতেন তখন চোখ দুটি ঝিক্ ঝিক্ করতো। বলতেন, “ওতেই হবে।...এখন বলতো, ‘আমাদের পিতা ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, তাঁর নাম মহিমোজ্জ্বল হোক’।”



আমি যদি জিজ্ঞেস করতাম “তাঁর নাম মহিমোজ্জ্বল হোক মানে কি?” তিনি তখন চারধারে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আমাকে এই বলে ভৎর্সনা করতেন, “প্রশ্ন করো না। প্রশ্ন করা অন্যায়। আমার সঙ্গে সঙ্গে বল, ‘আমাদের পিতা...’,

তাঁর কথাগুলি আমাকে বিচলিত করতো। প্রশ্ন করা অন্যায় কেন? “তাঁর নাম মহিমোজ্জ্বল হোক” এই কথাগুলি আমার কাছে হয়ে উঠলো রহস্যময়। যত রকমে পারতাম আমি ইচ্ছা করেই কথাগুলো গুলিয়ে ফেলতাম।

কিন্তু আমার মামীমা, পাংশু মুখে, ক্লান্তি ভরে, সহিষ্ণুতার সঙ্গে গলা পরিষ্কার করে বলতেন, “না, ওটা ঠিক নয়। বল ‘তাঁর নাম মহিমোজ্জ্বল হোক।’ কথাগুলো তো বেশ সহজ।”

কিন্তু তিনি বা তাঁর কথাগুলো কোনটিই সহজ ছিল না। এতে আমার বিরক্তি ধরতো। তার ফলে প্রার্থনাটি মনে রাখায় বাধা ঘটতো।

একদিন দাদামশায় জিজ্ঞেস করলেন, “ওলেশা, তুমি আজ কি করছিলে? খেলা করছিলে? তোমার কপালে আঁচড়ানোর দাগগুলো আমাকে অনেক কথা জানাচ্ছে! সহজেই আঁচড়ানোর দাগ হয়। কিন্তু ‘আমাদের পিতার’ কি হচ্ছে? তুমি ওটা শিখেছ?’

মামীমা আস্তে আস্তে বললেন, “ওর স্মরণ-শক্তি ভাল নয়।”

দাদামশায় তাঁর পাতলা ভ্রূ-জোড়া কপালে তুলে হাসলেন, যেন খুশি হয়েছেন। "তাতে কি? ওকে বেত মারতে হবে। ব্যস্।"

আবার তিনি আমার দিকে ফিরলেন, "তোমার বাবা তোমাকে কখন বেত মারতো?"

তিনি কি বলছেন, আমি বুঝতে পারলাম না বলে চুপ করে রইলাম, কিন্তু আমার মা উত্তর দিলেন, "না, ম্যাক্সিম কখন ওকে মারতো না। আবার আমাকেও মারতে বারণ ক'রে দিয়েছিল।"

—"কেন. জিজ্ঞেস করতে পারি কি?"

—"সে বলতো, মারা শিক্ষা নয়।"

—"ঐ ম্যাকসিমটা ছিল সব বিষয়ে বোকা। যে মরে গেছে তার সম্বন্ধে এভাবে কথা বলার জন্যে ভগবান যেন আমাকে ক্ষমা করেন।" তিনি রাগের সঙ্গে কথাগুলো বলে উঠলেন। এবং তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন, কথাগুলোয় আমার রাগ হ'ল। জিজ্ঞেস করলেন, "মুখখানা অমন রাগে ভরা কেন? উফ্!...এই!" এবং তাঁর রুপালি আঁজিটানা চুলগুলো সমান করতে করতে আবার বললেন, এই শনিবারেই আমি শাসকার 'পিঠে চামড়া চালাবো'।"

জিজ্ঞেস করলাম, " 'চামড়া চালাবো' মানে কি?"

সকলে হেসে উঠলেন; দাদামশায় বললেন: "একটু থাম, দেখতে পাবে।"

"চামড়া চালানো" কথাটা মনে মনে আলোচনা করতে লাগলাম। চাবুক মারা ও মার-দেওয়ার অর্থ যা, এই কথাটার অর্থও স্পষ্টত তাই। আমি লোককে ঘোড়া, কুকুর ও বিড়ালকে মারতে দেখেছিলাম। আস্ত্রাখানে সৈন্যদের পারসিকদের মারতে দেখেছি; কিন্তু আগে কখন কাউকে ছোট-ছেলেকে মারতে দেখিনি। অথচ এখানে আমার মামারা নিজেদেরই ছেলে-মেয়েদের মারেন মাথায়

ও ঘাড়ে। আর তারা কোন রকম উষ্মা না দেখিয়ে তা সহ্য করে, যে অংশে আঘাত লাগে সেখানে হাত বুলোয়। আমি যদি জিজ্ঞেস করতাম, লেগেছে কি না, তাহলে তারা বীরের মতো উত্তর দিত :

"একটুও না।"

তারপরে সেই বিখ্যাত দর্জির আঙুলের ঠুসির গল্প। বিকেলে চা খাবার সময় থেকে সন্ধ্যায় খাবার সময় পর্যন্ত, আমার মামারা ও সদ্দার কারিগর রং করা কাপড়-চোপড়ের টুকরোগুলোকে এক একটি খণ্ডে সেলাই করে তাতে টিকিট এঁটে রাখতেন। একদিন আধকাণা গ্রেগরিকে নিয়ে একটু মজা করার জন্যে মাইকেল-মামা তাঁর ন'বছরের ছেলেটিকে ঠুসিটা মোমবাতির শিখায় ধরে টকটকে লাল করে তুলতে বললেন। শাস্‌কা ঠুসিটা বাতির শিখায় ধরে বাস্তবিকই টকটকে লাল করে তুলে গ্রেগরির অলক্ষ্যে তার একেবারে হাতের কাছে রেখে নিজে ষ্টোভের পাশে লুকিয়ে রইলো। কিন্তু এমনই কপাল, দাদামশায় নিজেই ঠিক সেই সময়ে এসে পড়লেন, এবং কাজ করতে বসে সেই গরম টক-টকে লাল ঠুসিটার মধ্যে আঙুল গলিয়ে দিলেন।

গোলমাল শুনে আমি রান্নাঘরে ছুটে গেলাম; দাদামশায় পোড়া আঙুলটাতে ফুঁ দিতে দিতে সারা ঘরে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলেন আর চীৎকার করছিলেন। তাঁকে তখন যে-রকম মজার দেখাচ্ছিল তা আমি কখন ভুলবো না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এই শয়তানিটা যে করেছে সেই বদমায়েশটা কোথায়?"

মাইকেল-মামা টেবিলের তলায় নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে ওপর থেকে ঠুসিটা চট করে টেনে নিয়ে সেটায় ফুঁ দিতে লাগলেন। গ্রেগরি নির্বিকার মুখে সেলাই করে যেতে লাগলো আর তার প্রকাণ্ড টাকটার ওপর নাচতে লাগলো ছায়া। জাকফ-মামা এসে ঘরে

ঢুকলেন এবং ষ্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসতে আরম্ভ করলেন। দিদিমা একমনে আলু ছেঁচ্‌তে লাগলেন।

মাইকেল-মামা হঠাৎ বলে উঠলেন, "ওটা করেছে জাকফ।"



জাকফ-মামা ষ্টোভের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বললেন, "মিথ্যাবাদী।"



কিন্তু তাঁর ছেলে একটি কোণ থেকে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলো, "বাবা, ওর কথা বিশ্বাস করো না। কি করে গরম করতে হয় ও নিজে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল।"



মামারা পরস্পরকে গাল দিতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু দাদামশায় আঙুলে ছেঁচা আলুর পুলটিশ দিয়ে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে নীরবে বেরিয়ে গেলেন।

সকলে বলতে লাগলো, মাইকেল-মামারই দোষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাকে বেত মারা হবে, না, তার 'পিঠে চামড়া চালানো' হবে?

দাদামশায় আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, "চালানো তো উচিত।"

মাইকেল-মামা টেবিলের ওপর চাপড় মেরে হুঙ্কার দিয়ে মাকে বললেন, "তোমার বাচ্চাটাকে মুখ বুজে থাকতে বল, নইলে ওর মাথা ভেঙ্গে দেব।"

মা উত্তর দিলেন, "তাহলে যাও, ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখ।"

মা এই ধরনের দু'একটি সংক্ষিপ্ত কথায় লোককে এমন করে ফেলতেন যে, তাঁর তুলনায় লোকটির মনে হ'ত সে কি সামান্য ব্যক্তি। আমি পরিষ্কার জানতাম, তাঁরা সকলেই আমার মাকে ভয় করেন। এমন কি দাদামশায়ও আর সকলের সঙ্গে যে-ভাবে কথা বলতেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন তার চেয়ে নরম স্বরে। তা দেখে খুব খুশি হ'তাম।

এবং গর্ব্বভরে আমার মামাতো ভাই-বোনদের বলতাম, "আমার মা ওদের সকলের সমান শক্তি রাখেন।"

তারা সে কথা অস্বীকার করতো না।

কিন্তু শনিবারে যে-সব ঘটনা ঘটলো তাতে আমার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা গেল কমে।



* * *

শনিবারের মধ্যে আমিও বিপদে পড়বার সময় পেলাম। বয়স্কেরা খুব সহজে নানা রকমের জিনিষের রঙ বদলে ফেলতো দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তারা হলদে রঙের কোন কিছুকে কালো রঙে ডুবিয়ে তুললেই সেটার রঙ হয়ে যেত ঘন নীল; ছাই রঙের একটা জিনিষকে লালচে রঙের জলে ডোবালেই জিনিষটা হত মভ্ রঙের। ব্যাপারটা ছিল খুবই সহজ, কিন্তু আমার কাছে ছিল দুর্ব্বোধ্য। আমার ইচ্ছা হল আমি নিজেও কিছু রঙ করি। মনের কথাটা বললাম শাসকা জাকোভিচের কাছে। সে ছেলেটি ছিল চিন্তাশীল। বয়স্কেরা তার ওপর ছিল সদয়। সেও ছিল শান্ত-প্রকৃতির ও লোকের বাধ্য। প্রত্যেকেরই কাজ করে দিতে সে প্রস্তুত ছিল।

বয়স্কেরা তার বাধ্যতা ও বুদ্ধির জন্যে খুব প্রশংসা করতো, কিন্তু দাদামশায় তাকে সুনজরে দেখতেন না, বলতেন, "ওটা হচ্ছে মিটমিটে শয়তান।"

আমিও তাকে পছন্দ করতাম না। তার চেয়ে পছন্দ করতাম নিষ্কর্ম্মা শাস্‌কা মাইকেলোভিচকে। কেউই তাকে পছন্দ করতো না। সে ছেলেটি ছিল শান্ত-শিষ্ট; তার চোখ দুটি ছিল করুণ, মুখে লেগে থাকতো তার করুণাময়ী মায়ের মতো স্নিগ্ধ হাসি। তার ওপর-নিচের দাঁতগুলো থাকতো বিশ্রীভাবে বেরিয়ে। সেজন্যে তার মনে ছিল দুঃখ। তাই সে সব সময় মুখে আঙুল

পুরে রাখতো। বাড়িতে লোকজনের ভিড়ের মধ্যেও সে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতো। দিনের বেলা সে বসে থাকতো অন্ধকার কোণটিতে, বিকেলে নীরবে বসে থাকতো জানলায় বাইরের দিকে তাকিয়ে।



আর জ্যাকব-মামার ছেলে সাসকা ছিল ঠিক তার বিপরীত। সে বয়স্কের মতো সকল বিষয়ে ভারিক্কী চালে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে পারতো। রং করা প্রণালীটা আমার শিখবার ইচ্ছা আছে শুনে, সে আমাকে কাবার্ড থেকে সব চেয়ে ভাল সাদা টেবিল ক্লথগুলির একখানি নীল রঙে ছোপাবার পরামর্শ দিলে।



আমি একখানা ভারী টেবিল-ক্লথ টেনে বার করে সেটা নিয়ে ছুটলাম আঙিনার দিকে। কিন্তু সেটার কিনারাটা গাঢ় নীল রঙে ভরা পিপেটার মধ্যে ডোবাতে ডোবাতেই সিগানক কোথা থেকে যেন আমার কাছে ছুটে এল। এবং সেটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তার কর্কশ হাত দুখানি দিয়ে নিঙড়তে নিঙড়তে আমার মামাতো ভাইকে চীৎকার করে বললে, “শিগগির তোমার ঠাকুমাকে ডাকো।”

মামাতো ভাইটি একটি নিরাপদ জায়গা থেকে আমার কাজ-কর্ম দেখছিল। সিগানক তার কালো, উস্কোখুস্কো চুলে ভরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে আমাকে আবার বললে, “এর মজাটা টের পাবে।”

দিদিমা হাহাকার করতে করতে ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন এবং দৃশ্যটি দেখে, এমন কি কাঁদতে কাঁদতেই বলে উঠলেন, “হায়রে ক্ষুদে শয়তান! এর জন্যে তোমার পিঠটা যেন ভেঙে দেওয়া হয়।”

কিন্তু, তারপরই তিনি সিগানককে বললেন, “এ-সম্বন্ধে ওর দাদা-মশায়কে কিছু বলবার দরকার নেই, বাংকা। তার কাছ থেকে কথাটা আমি গোপন রাখবার চেষ্টা করবো। আশা করা যাক্ এমন

কিছু ঘটবে যাতে তাঁর মনটা থাকবে ডুবে।”

বাংকা তার নানা রঙের এপ্রনখানিতে হাত মুছ্‌তে মুছ্‌তে অন্য-মনস্কভাবে বললে, “আমি? আমি বল্‌বো না; কিন্তু নজর রেখ ঐ নাসকাটা গিয়ে সকলকে না বলে বেড়ায়।”



দিদিমা আমাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যেতে যেতে বললেন, “চুপ করে থাকবার জন্যে আমি ওকে কিছু দেব।”



শনিবারে সন্ধ্যার আগে আমাকে রান্নাঘরে ডাকা হল। ঘরখানা ছিল অন্ধকার, নিস্তব্ধ। মনে পড়ে ছাদটা ও ঘরখানার বন্ধ দরজাগুলো, শরতের শেষবেলার ঘন কুয়াশা ও বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দের কথা। ষ্টোভটার সামনে একখানি অপরিসর বেঞ্চিতে বিরক্ত মুখে সিগানক বসেছিল। দাদামশায় চিমনির পাশে দাঁড়িয়ে একটা জল-ভরা জালা থেকে লম্বা বেতগুলো তুলে নিয়ে সেগুলো মাপছিলেন, একত্র করছিলেন আর উঁচিয়ে সাঁই সাঁই করে ঘোরাচ্ছিলেন। দিদিমা আড়ালে কোথায় যেন বসে সশব্দে নস্য নিচ্ছিলেন আর বিড়্‌বিড় করে বলছিলেন, “এবার নিজ মূর্তি ধরেছ, অত্যাচারী।”

সাশ্‌কা জাকফ্‌ রান্না ঘরের মাঝখানে চেয়ারে বসে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছিল আর বুড়ো ভিখারীটার মতো কেঁউ কেঁউ করে বলছিল, “খ্রীষ্টের দোহাই, আমাকে ক্ষমা কর…”

চেয়ারের ধারে, কাঠের পুতুলের মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল মাইকেল-মামার ছেলে-মেয়ে— দুটি ভাই-বোন।

হাতের উল্টো পিঠের ওপর দিয়ে একখানা লম্বা ভিজে বেত টানতে টানতে দাদামশায় বললেন, “তোমাকে বেত মারবার পর ক্ষমা করবো। আচ্ছা এবার…তোমার ব্রীচেসটা খুলে ফেল!”

তিনি খুব শান্তভাবে কথাগুলো বল্‌লেন। সেই প্রায়ান্ধকার কালি-পড়া নিচু-ছাদ ঘরখানার জমাট স্তব্ধতা তাঁর কণ্ঠস্বরে বা ছেলেটা

নড়া-চড়ায, চেয়ারের ক্যাঁচকোচ আওয়াজে অথবা দিদিমার মেঝেয় পা-ঘষার শব্দেও ভঙ্গ হ'ল না।

সাস্‌কা উঠে দাঁড়িয়ে পা-জামাটা খুলে হাঁটু-অবধি নামিয়ে দিল। তারপর নিচু হযে সেটা হাত দিয়ে ধরে বেঞ্চির ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। তার দিকে তাকিয়ে থাকা হয়ে উঠলো কষ্টকর। আমার পা দুখানাও কাঁপতে লাগলো।



কিন্তু ব্যাপারটা সব চেয়ে শোচনীয় হয়ে উঠলো তখন যখন সে বেঞ্চির ওপর সুবোধ ছেলেটির মতো উপুড় হযে শুযে পড়লো আর বাংকা তাকে বেঞ্চির সঙ্গে একখানা চওড়া তোয়ালে দিয়ে বেঁধে তার পা দুখানা টেনে ধরে নিচু হযে দাঁড়িয়ে রইলো।

দাদামশায় ডাক্‌লেন, "লেক্‌সি! কাছে এস! এস! আমি যে তোমায় ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না? দেখ 'চামড়া চালানো' কাকে বলে…এক।"

দাদামশায় বেতখানা একটু উঁচিয়ে সাস্‌কার পিছনে এক ঘা দিলেন; আর সে চীৎকার করে উঠলো।

দাদামশায় বললেন, "ধ্যেৎ! এতো কিছুই নয়!…কিন্তু এইবার তুমি চিট্‌পিটিযে উঠবে।"

তারপরই তিনি এত জোরে মারতে লাগলেন যে, আমার মামাতো ভাইটির পিছনের মাংস কেটে কেটে তার ওপর লাল দাগ পড়তে লাগলো আর সে সমানে চীৎকার করতে লাগলো।

দাদামশায়ের হাতখানা উঠ্‌ছে পড়ছে। সেই সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "খাসা লাগ্‌ছে, না? তোমার ভাল লাগছে না?…এটা হচ্ছে ঠুসিটার জন্যে!"

যখন তিনি হাতখানা ঝাঁকি দিযে তুল্‌ছিলেন সেই সঙ্গে আমারও হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠছিল, আর যখন তাঁর হাতখানা নামছিল

তখন আমার ভেতরেও কি যেন ধ্বসে যাচ্ছিল।

সাস্‌কা ভীষণ তীক্ষ্ণ স্বরে কাঁদছিল, "আমি আর করবো না।" স্বরটা শুনতে ভাল লাগছিল না। "আমি কি—আমি কি টেবিল-ক্লথখানার কথা বলে দিই নি?"

দাদামশায় শান্তকণ্ঠে বল্‌লেন, যেন মন্ত্র পড়ছেন, "কারো নামে লাগালেই রেহাই পাওয়া যায় না। যে দোষায় সেই আগে বে[ত] খায়। কাজেই টেবিল-ক্লথখানার জন্যে এই এক ঘা।"

দিদিমা হঠাৎ আমাকে আগলে দাঁড়ালেন এবং জড়িয়ে ধরে বলে উঠ্‌লেন, "লেকসির গায়ে হাত দিতে আমি দেব না। দেবই না। রাক্ষস কোথাকার।" এবং তিনি দরজায় লাথি মারতে মারতে চীৎকার করে ডাক্‌তে লাগলেন, "ভারিয়া! ভারবারা।"

দাদামশায় তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে ঠেলে ফেলে আমাকে চেপে ধরে নিয়ে গেলেন বেঞ্চির কাছে। আমি তাঁকে ঘুষি মারতে লাগ্‌লাম, তাঁর দাড়ি ধরে টানলাম, আঙুল কামড়ে ধরলাম। তিনি ষাঁড়ের মতো চীৎকার করতে করতে বাইশ-যন্ত্রের মতো আমাকে চেপে ধরে রইলেন। পরিশেষে আমাকে বেঞ্চির ওপর ফেলে আমার মুখে মারলেন ঘুষি।

তাঁর সেই বিকট চীৎকার আমি কখন ভুলবো না, "বাঁধ ওকে! খুন করে ফেলবো।"

আর মায়েরও সেই তখনকার ফ্যাকাসে মুখ ও বড় বড় চোখ দুটিও ভুলতে পারবো না। তিনি বেঞ্চিখানার এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন, আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করছিলেন, "বাবা! মের না! ওকে ছেড়ে দাও।"

* * * *

যতক্ষণ আমার চেতনা ছিল দাদামশায় ততক্ষণ আমাকে বেত মারলেন

আমি অসুস্থ হয়ে একখানি ছোট ঘরে দিন কয়েক বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম। ঘরখানিতে ছিল একটি মাত্র জানলা। তার এক কোণে বিগ্রহটার সামনে সারাদিন জ্বলতো একটি আলো। সেই অনুজ্জ্বল দিনগুলি ছিল আমার জীবনে সব চেয়ে বড়। তারই মাঝে আমি বর্ধিত হয়ে উঠেছিলাম চমৎকার। আর আমার নিজের মাঝেই যে এক বিচিত্র অসামঞ্জস্য ছিল সে বিষয়ে ছিলাম সচেতন। অপরের জন্যে অনুভব করতে লাগলাম এক অভিনব উদ্বেগ। তাদের ও আমার নিজের দুঃখ-বেদনার বিষয়ে এমন তীব্রভাবে সচেতন হয়ে উঠলাম যে, তাতে হৃদয় প্রায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তাকে সংচেত্য করে তুললো।

এই কারণেই আমার মা ও দিদিমার মধ্যে কলহ আমার মনে একটি আঘাত দিল। সেই অপরিসর ঘরখানির মধ্যে দিদিমাকে দেখাতে লাগলো কালো, প্রকাণ্ড। তিনি রেগে উঠে মাকে ঠেলা দিয়ে বিগ্রহটার কাছে নিয়ে গিয়ে বলে উঠলেন, "ওকে তুমি সরিয়ে নিয়ে গেলে না কেন?"

—"আমার ভয় করছিল।"

—"তোমার মতো এই রকম সুস্থ সবল মানুষের! তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ভারবারা! আমি বুড়ী হয়েছি। আমি ভয় পাই না, ধিক!"

—"থামো মা। সমস্ত ব্যাপারে আমার বিরক্তি ধরে গেছে।"

—"না, তুমি ওকে ভালোবাস না। ঐ অনাথ ছেলেটার জন্যে তোমার মনে কোন রকম অনুকম্পা নেই।"

মা বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, "সারা জীবন আমিও হয়ে আছি অনাথা।"

তারপর এক কোণে একটি বাক্সের ওপর বসে দুজনে কাঁদতে

লাগলেন এবং খানিক পরে মা বললেন, "যদি আলেকসির জন্যে না হত তাহলে আমি এ বাড়ি ছেড়ে সোজা চলে যেতাম। এই নরকে আমি থাকতে পারি না মা; পারি না! আমার শক্তি নেই।"



দিদিমা আস্তে আস্তে বললেন, "বাছা রে! আমারই রক্ত-মাংস।"



এ-সব কথা আমি মনে গেঁথে রাখলাম। মা ছিলেন দুর্বল চিত্ত, আর সকলের মতো তিনিও দাদামশায়কে ভয় করতেন। তিনি বুঝেছিলেন, যে-বাড়িতে বাস করা অসম্ভব, সে-বাড়ি ছেড়ে যেতে আমিই তাঁকে বাধা দিচ্ছিলাম। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বড়ই দুঃখের। কিন্তু বেশি দিনও গেল না, তিনি সত্যই একদিন বাড়ি ছেড়ে কোথায় কার সঙ্গে যেন দেখা করতে চলে গেলেন।



তারপরই হঠাৎ যেন ছাদ থেকে পড়েছেন এমনই ভাবে একদিন দাদামশায় এসে আমার বিছানায় বসে তার তুষার-শীতল হাতখানি রাখলেন আমার মাথায়।

—"কেমন আছ হে? উত্তর দাও। মুখ লুকিও না। কি? তোমার কি বলবার আছে?"

তাঁর পা দু'খানা লাথি মেরে সরিয়ে দিতে আমার ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু একটু নড়লেই আমার লাগছিল। তার হলদে রঙের মাথাটা অস্থিরভাবে এপাশে-ওপাশে নাড়তে লাগলেন। তিনি পকেট থেকে টেনে বার করতে লাগলেন, আদা-দেওয়া বিস্কুট, মঠ, আপেল ও একগোছা লাল আঙুর। সেই সঙ্গে খরখরে চোখ দুটি দিয়ে যেন দেওয়ালের গায়ে কি খুঁজতে লাগলেন। জিনিসগুলো পালিশের ওপর ঠিক আমার নাকের কাছে রেখে বললেন, "এই নাও! তোমার জন্যে উপহার।"

তিনি নিচু হয়ে আমার কপালে চুমো দিলেন। তারপর সেই ছোট নিষ্ঠুর হাত দুখানি আমার মাথায় বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে

শুরু করলেন, "বন্ধু, তোমার পিঠে আমার দাগ রেখে দিয়েছি। তুমি খুব রেগে উঠেছিলে। তুমি আমাকে আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছিলে, তাতে আমারও মেজাজ হয়ে গিয়েছিল খারাপ। যা হোক তোমার যে-রকম দরকার তার চেয়েও কঠোর শাস্তি দিলে তোমার কোন ক্ষতি হত না। সে পরে হবে। তোমার নিজের পরিবারের লোক যখন তোমাকে মারবে তখন কিছু না মনে করতে শিখ। এটা হচ্ছে তোমার শিক্ষার অংশ। যদি বাইরের কোন লোকের কাছ থেকে এরকমটা ঘটে তাহলে তফাৎ আছে বটে, কিন্তু আমাদের কারো কাছ থেকে হলে ধরবার মধ্যেই নয়। বাইরের কোন লোককে তোমার গায়ে হাত দিতে দিও না, কিন্তু তোমার নিজের পরিবারের কেউ মারলে তাতে মনে করবার কিছু নেই। বোধ হয় ভাবছো আমি কখন চাবুক খাইনি। ছেলেইশা! আমি তোমার চেয়ে এত বেশি চাবুক খেয়েছি যা তুমি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। এমন নিষ্ঠুর ভাবে আমাকে চাবুক মারা হত যে, স্বয়ং ভগবানও তা দেখে চোখের জল ফেলে থাকবেন। আর তার ফল হয়েছে কি? আমি এক দুঃখিনীর সন্তান—অনাথ – আমার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছেছি। আমি এখন একটা সমিতির কর্তা, একজন ওস্তাদ কারিগর।"

তার শুষ্ক সুগঠিত দেহখানি আমার দিকে ঝুইয়ে জোরালো ভাষায়, যোগ্য শব্দ নির্বাচন করে তাঁর শৈশবের কথা বলতে শুরু করলেন।

"তুমি এখানে এসেছ ষ্টীমারে···বাষ্পশক্তি এখন তোমাকে যে-কোন জায়গায় নিয়ে যাবে, কিন্তু আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমাকে দড়ি দিয়ে গুণ টেনে বজরা আনতে হয়েছিল। বজরাখানা থাকতো জলে আর আমি হেঁটে আসতাম ডাঙার ওপর দিয়ে খালি পায়ে। ডাঙায় থাকতো ধারালো পাথর ছড়ানো।···এই ভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলত তা। রোদে আমার ঘাড় জলে-পুড়ে যেত, মাথা দপ্

দপ্ করতো যেন মাথার ভেতরে রয়েছে তরল লোহাভরা। কখন কখন আমার হাড়গুলো টন্ টন্ করতো, তবুও চল্‌তে হত সামনে। চোখে পথ দেখতে পেতাম না। দু'চোখে জল ছাপিয়ে উঠতো। গাল বেয়ে যখন পড়তো তখন আমার বুক যেত ফেটে। হা ওলেইশা! সে কথা বলা যায় না।



"যতক্ষণ না আমার হাত থেকে গুণ খসে পড়তো ততক্ষণ চলতাম, কেবলই চলতাম। চলতে চলতে উপুড় হয়ে পড়ে যেতাম কিন্তু তার জন্যে আমি দুঃখিত হতাম না। আরও শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতাম। এক মিনিটও বিশ্রাম করতে না পেলে মারা যেতাম যে।

"এই অবস্থার মধ্যে আমরা তখন ভগবানের চোখের সামনে জীবন ধারণ করতাম। এম্নি করে আমি ভলগা-মায়ের তীর দিয়ে আসা-যাওয়া করতাম, সিমবিরসক্ থেকে রিবিনসক্, সেখান থেকে সারাটফ, সেই আস্ট্রাখান আর মারকারেফে মেলা অবধি—দু'হাজার মাইলের ওপর। বছর চারেক পরে আমি হলাম এক স্বাধীন নেয়ে। আমার মনিবকে দেখালাম আমি কি দিয়ে তৈরী।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে তিনি যেন ক্ষুদ্রকায় শুষ্কশীর্ণ বৃদ্ধ থেকে আমার চোখের সামনেই মেঘের মতো আয়তনে বর্দ্ধিত হয়ে রূপকথার এক অসাধারণ পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। তিনি কি কালো রঙের একখানা বজরা নদী দিয়ে একা টেনে নিয়ে যান নি? মাঝে মাঝে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে আমাকে দেখাতে লাগলেন, নেয়ের গায়ে গুণ জড়িয়ে কি করে হেঁটে চলতো, কি করে তারা মোটা গলায় গান গেয়ে নৌকো থেকে জল ছেঁচে ফেলতো। আবার বিছানায় লাফ দিয়ে উঠে আমার বিস্ময়কে আরও প্রবল করে তুলে ভাঙা গলায়, জোর দিয়ে বলে যেতে লাগলেন :

"বুঝলে ওলেইশা, কখন কখন গ্রীষ্মের বেলা শেষে আমরা যখন

জিগুলাক বা ঐ ধরনের কোন জায়গায় সবুজ পাহাড়গুলোর তলায় গিযে পৌছতাম তখন সকলে অলসের মতো বসে সেখানে রান্না চড়িয়ে দিতাম, আর সেই পাহাড়ে জায়গার মাঝিরা রসের গান গাইতো। তারা শুরু করলেই নেয়েরা সকলে মিলে তাদের সঙ্গে সুর ধরতাম। সেই গানের সুরে মন উঠ্‌তো শিউরে, ভলগাও যেন ছুটে চলতো ঘোড়ার মতো, আর মেঘের মতো উঠতো ফুলে। তখন যত দুঃখ-কষ্ট সব উড়ে যেত ধুলোর মতো।"



কয়েকবার কয়েকজন তাঁকে ডাকতে দরজায় উঁকি দিলে কিন্তু প্রত্যেক বারই আমি তাঁকে মিনতি জানিয়ে যেতে দিলাম না।

তিনি হেসে তাদের হাত নেড়ে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "একটু সবুর কর।"

তিনি আমার পাশে বসে, যতক্ষণ না সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল ততক্ষণ অবধি গল্প দল্‌লেন। তারপর যখন আমার কাছ থেকে সস্নেহ বিদায় নিলেন তখন জানতে পারলাম, তিনি দুষ্ট-প্রকৃতিরও নন, দুর্দ্ধষও নন। এই কথা মনে করে আমার চোখে জল এল যে, তিনিই আমাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে বেত মেরেছিলেন।

দাদামশায়ের আসবার পর থেকে আর সকলের আসবার পথও সুগম হয়ে গেল। সকাল থেকে রাত অবধি কেউ না কেউ আমার কাছে এসে বিছানায় বসে আমাকে আমোদ দেবার চেষ্টা করতো; কিন্তু মনে পড়ে সেটা সব সময়ে আনন্দের বা সুখের হত না।

সকলের চেয়ে বেশি আসতেন দিদিমা। তিনি আমার সঙ্গে একই বিছানায় শুতেন। কিন্তু সে সময়ে আমার মনে সব চেয়ে স্পষ্ট ছাপ ফেলেছিল সিগানক। সে আস্‌তো শেষ বেলায়—সুগঠিত দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, কুঞ্চিত কেশ, পরিপাটি বেশ। তার শার্টে ছিল জরির কাজ, পায়ে ছিল বুট জুতো। জুতোজোড়া হারমোনিয়মের মতো

ক্যাচকোঁচ করতো। তার চুলগুলো ছিল চকচকে, ভ্রূ-জোড়া ছিল ঘন, চোখ দুটি ঝক্ ঝক্ করতো, গোঁফজোড়া ছিল কচি। তার ছায়ায় ছিল সাদা দাঁতগুলি। তার শার্টটা ছিল কোমল, ঝলমলে।

সে একদিন এসে হাতের আস্তিন গুটিয়ে কনুই অবধি দেখিয়ে বল্লে, "এই দেখ।" হাতখানা ছিল লাল দাগে ভরা। "হাতখানা কিরকম ফুলে উঠেছে। কাল ছিল আরও খারাপ—খুব ব্যথা ছিল। যখন তোমার দাদামশায় রাগে ক্ষেপে গেলেন, আর আমি দেখলাম, তিনি তোমাকে বেত মারতে যাচ্ছেন, হাতখানা বাড়িয়ে দিলাম এই ভেবে যে বেতখানা ভেঙে যাবে। তারপর তিনি যখন আর একখানা নিতে যাবেন সেই অবসরে তোমার দিদিমা বা মা এসে তোমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখবেন। এ-বিষয়ে আমি একেবারে পাকা।"

সে সস্নেহে ধীরে হাসতে লাগলো। আবার তার ফোলা হাতখানার দিকে তাকিয়ে বল্লে, "তোমার জন্যে আমার এত কষ্ট হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে! কি লজ্জা!… কিন্তু তিনি তোমাকে সমানে বেত মারছিলেন।"

অশ্বের মতো হ্রেষাধ্বনি করে, মাথা নেড়ে সে ঘটনা বৃত্তান্ত বলে যেতে লাগলো। এই শিশু-সুলভ সরলতা যেন তাকে আমার আরও কাছে টেনে নিয়ে এল। আমি বললাম তাকে আমি খুবই ভালোবাসি; আর সে যে সরলতার সঙ্গে উত্তর দিল তা আমার স্মৃতিপটে সর্ব্বদা জেগে আছে।

"আর আমিও তোমাকে ভালোবাসি! তাইতো আমি এতখানি আঘাত সয়েছিলাম। তুমি কি মনে কর, আর কারো জন্যে এটা করতাম? তা হলে কাজটা হত বোকার মতো।"

তারপর সে আমাকে চুপি চুপি পরামর্শ দিতে লাগলো; আর বার

বার দরজার দিকে তাকাতে লাগলো।

"এরপরেও যখন তোমাকে মারবে তখন পালাবার চেষ্টা করো না, ধস্তাধস্তিও কোরো না। যদি বাধা দাও তাহলে আরও লাগবে। যদি তুমি নিজেকে সম্পূর্ণ ওর হাতে ছেড়ে দাও তাহলে ও তোমাকে কম মারবে। শরীর আর হাত-পা নরম করে থেকো, ওর ওপর রাগ দেখিও না। কথাটা মনে করে রেখ।"



বললাম, "নিশ্চয়ই ও আমাকে আর মারবে না?"

সিগানক শান্তভাবে উত্তর দিলে, "নিশ্চয়ই ও তোমাকে আবার মারবে, প্রায়ই মারবে।"

—"কিন্তু কেন?"

—"কারণ দাদামশায় তোমার ওপর নজর রেখেছেন।" এবং আবার সে আমাকে পরামর্শ দিলে, "মারবার সময় বেতখানা পড়ে সোজা। তুমি যদি স্থির হয়ে শুয়ে থাক তাহলে সম্ভবত বেতখানাকে আরও নিচু করতে হবে। তাতে তোমার গায়ের চামড়া কাটবে না··· বুঝলে? তোমার শরীরটা ওর আর বেতের দিকে তুলো। তাতে তোমার ভালো হবে।"

তারপর তার কালো বাঁকা চোখ দুটোতে একটু ইসারা করে আবার বললে, "পুলিশের চেয়ে এসব বিষয় আমি বেশি জানি। বাবা! আমার খোলা কাঁধে এমন মার মারতো যে চামড়া উঠে আসতো।"

আমি তার উজ্জ্বল মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলাম। দিদিমার একটি গল্প মনে পড়ে গেল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেরে উঠলে বুঝ্‌তে পারলাম, পরিবারের মধ্যে সিগানক বেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। দাদামশায় তার ছেলেদের যেমন ধমক দিতেন তাকে তেমন ধমক দিতেন না, তার অসাক্ষাতে চোখ দুটি অর্দ্ধ নিমীলিত করে, মাথা নেড়ে বলতেন: "ঐ সিগানকটা ভাল কারিগর। আমার কথাগুলো মনে করে রেখ। ও উন্নতি করবে। ওর পয়সা-কড়ি হবে।"

আমার মামারাও তার সঙ্গে নম্র ব্যবহার করতেন এবং তার বন্ধুর মতো ছিলেন। তারা সর্দ্দার কারিগর গ্রেগরির সঙ্গে যেমন রূঢ় রসিকতা করতেন তার সঙ্গে তেমন করতেন না। গ্রেগরিকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাঁদের কোন-না-কোন রকমের অপমানকর বা রূঢ় রসিকতা ভোগ করতে হত। কখন কখন তারা কাঁচির হাতল দুটো আগুনে টকটকে লাল করে রাখতেন অথবা তার চেয়ারের তলা দিয়ে পেরেক পুঁতে ওপর দিকে ধার করে রাখতেন, কখন বা তার হাতের কাছে রাখতেন একই রঙের নানা রকমের জিনিষ। সে ছিল আধকাণা। সেগুলো এক সঙ্গে সেলাই করলে দাদামশায় তাকে বক্‌তেন।

একদিন সে খাবার পর রান্নাঘরে ঘুমিয়ে পড়লে, মামারা তার মুখে রঙ মাখিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে তাকে দেখতে হয়েছিল ভারী মজার। তার চোখে ছিল রঙিন চষমা, মুখে দাড়ি, সাদা নাকটা বেরিয়ে ছিল জিভের মতো।

এই ধরনের নষ্টামী মামাদের ছিল অফুরন্ত। গ্রেগরি সে-সব নীরবে সহ্য করতো। কেবল বিড় বিড় করে দুই একটি কথা বল্‌তো। আর ইস্ত্রি, কাঁচি, সূঁচের কাজ বা ঠুসি ছোঁবার আগে সে আঙ্গুলে বেশ করে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে নিত। এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল

চার অভ্যাস। এমন কি খাবার আগেও সে ছুরি-কাঁটা ধরবার সময় আঙুলগুলো জিভে ঠেকাতো। তাতে ছেলেমেয়েরা ভারী আমোদ পেত। আহ্লাদ হলে তার প্রকাণ্ড মুখখানির ওপর দিয়ে তরঙ্গের মতো খেলে যেত কুঞ্চন-রেখা। সেগুলো উঠে যেত তার কপালে, ঠেলে তুলতো তার ভ্রূজোড়া, অবশেষে মিলিয়ে যেত টাকে।



মনে পড়ে না দাদামশায় তাঁর ছেলেদের রসিকতা কিভাবে সহ্য করতেন, হয়ে দিদিমা তাদের ঘুষি দেখিয়ে বলতেন, "নির্লজ্জ, শয়তানগুলো!"

কিন্তু আমার মামারা আড়ালে সিগানকেরও নিন্দা করতেন। তারা তাকে বিদ্রূপ করতেন, তার কাজের দোষ ধরতেন। তাকে বলতেন, চোর ও অলস।

দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁরা কেন এরকম করেন। তিনি কোন দ্বিধা না করে আমাকে বুঝিয়ে দেন। ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি বলেন, "ওরা প্রত্যেকেই চাইছে সে যখন ব্যবসা শুরু করবে তখন বানিউশকাকে নেবে সঙ্গে। তাই ওরা পরস্পরের কাছে ওর নিন্দে করে। ওরা মুখে বলে 'ও বাজে কারিগর', কিন্তু ওদের মনের কথা তা নয়। এটা হচ্ছে ওদের চালাকি। এর ওপর, ওদের ভয় আছে বানিউশকা ওদের কারো সঙ্গেই যাবে না, দাদামশায়ের কাছেই থাকবে। দাদামশায় সব সময়ে চলেন নিজের পথে। তিনি আইভানকার সঙ্গে আর একটি কারখানা খুলবেন। তাতে তোমার মামাদের সুবিধে হবে না। এখন বুঝলে? দাদামশায় ওদের শয়তানী দেখে ওদের আরও ক্ষেপিয়ে তোলেন। বলেন, 'আমি টাকা দিয়ে ওকে একখানা সার্টিফিকেট কিনে দেব যাতে সরকার ওকে সৈন্যদল না নিয়ে যায়। ওকে না হলে আমার চলে না।' এ কথা শুনে ওরা চটে ওঠে। ঠিক এইটেই

ওরা করতে চায় না। তা ছাড়া, ওরা টাকা খরচেও নারাজ। সৈন্যদল থেকে ছাড়ান পেতে গেলে টাকা খরচ করতে হবে।”

স্টীমারে থাকবার সময়ের মতো আবার আমি দিদিমার কাছে ছিলাম। এবং প্রতি রাতে ঘুমিয়ে পড়বার আগে তিনি আমাকে রূপকথা বা তাঁর জীবনের কাহিনী বলতেন। সেগুলো ছিল ঠিক গল্পের মতোই। তিনি সাংসারিক ব্যাপারের কথা এমন ভাবে বলতেন, যেন তিনি সংসারের কেউ নন, একজন অপরিচিত বা পড়শী মাত্র।



তাঁর কাছ থেকে শুনেছিলাম, সিগানক ছিল, কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে। বসন্তের প্রথম দিকে বর্ষারাতে বারান্দায় একখানি বেঞ্চির ওপর তাকে তিনি পেয়েছিলেন।

দিদিমা গম্ভীর মুখে হেঁয়ালিভরে বললেন, “সেখানে ও পড়ে ছিল। কাঁদবার শক্তি ছিল না, ঠাণ্ডায় হয়ে গিয়ে ছিল প্রায় অসাড়।”

—“কিন্তু লোকে ছেলে ফেলে দিয়ে যায় কেন?

—“কারণ মায়ের ছেলেকে খাওয়াবার দুধ বা কিছু থাকে না বলে। মা যখন শোনে কোথাও ছেলে হয়ে তখনই মারা গেছে তখন সেখানে নিজের ছেলেটিকে রেখে আসে।”

তিনি চুপ করলেন এবং মাথা চুলকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ছাদের দিকে তাকিয়ে আবার বলে যেতে লাগলেন, “ওলেইশা, এর কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। এক ধরনের দারিদ্র্যের কথা বলা বারণ। কোন কুমারী স্বীকার করতে সাহসই পায় না যে তার ছেলে হয়েছে—লোকে যে তাকে ধিক্কার দেবে।

“দাদামশায় বানিউশাকাকে পুলিশের হাতে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি বলি, ‘না, যেগুলি মারা গেছে ওকে আমরা তাদের শূন্য জায়গা পূরণ করতে রাখবো। তুমি তো জান, আমার আঠারোটি ছেলে-মেয়ে ছিল। তারা যদি সকলে বেঁচে থাকতো

াহলে একটা রাস্তা ভরে যেত—আঠারোটি নতুন পরিবার! আমার
ায়ে হয়েছিল আঠারো বছর বয়সে। আর ঐ সময়ের মধ্যে
য়েছিল আমার পনেরোটি ছেলে-মেয়ে। কিন্তু ভগবান আমার
ক্ত-মাংসকে এত ভালোবাসেন যে, তাদের প্রায় সকলকেই—আমার
চি বাচ্চাদের—দেবদূতের কাছে স্বর্গে টেনে নিয়েছেন। তাতে আমি
াশ্বিত ও সুখী দুই-ই হয়েছিলাম।"



বাতের পোশাক পরে তিনি বিছানার ধারে বসেছিলেন।
প্রাণু শরীর ও আলুথালু বেশ কালো চুলগুলি খুলে পড়েছিল তাঁর
রপাশে। তাঁকে দেখাচ্ছিল সেই প্রকাণ্ড ভাল্লুকটার মতো, যাকে
নরগাছের দাড়িওয়ালা জঙ্গলিটা একদিন আমাদের আঙিনায়
নেছিল।

ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে তিনি কোমল হাসি হেসে
ললেন:

"নেওয়াটা তাদের পক্ষে ভালই হয়েছিল, কিন্তু আমি একা
ড় কষ্ট পাচ্ছিলাম। তাই আইভাংকাকে পেয়ে এত খুশি হয়েছিলাম।
মন কি এখনও আমি তাদের জন্যে দুঃখ পাই। বাছারা
ামার!...তা, আমরা ওকে রেখে, খ্রীষ্টান করে নিই। ও এখনও
ামাদের সঙ্গে সুখে বাস করছে। প্রথমে আমি ওকে 'গুবরে পোকা'
লে ডাকতাম। কারণ ও সত্যিই মাঝে মাঝে গুনগুন করতো, গুবরে
পাকার মতোই এঘরে-ওঘরে গুন গুন করতে করতে হামাগুড়ি দিয়ে
রে বেড়াতো। তুমি ওকে নিশ্চয়ই ভালোবাসবে। ও খুব ভাল
লাক।"

আমি আইভানকে সত্যই ভালোবাসতাম, তার প্রশংসাও
রতাম। শনিবারে, সারা সপ্তাহের দোষ-ত্রুটির জন্যে ছেলেদের
াস্তি দিয়ে দাদামশায় যখন সান্ধ্যোপাসনায় যেতেন তখন রান্নাঘরে

আমরা সকলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে কাটাতাম।

সিগানক ষ্টোভ থেকে কয়েকটা তেলাপোকা ধরে তাদের জন্যে সুতো দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি একটা ঘোড়ার সাজ তৈরি করতো, একটা কাগজের শ্লেজ কাট্‌তো। তারপরই পরিষ্কার, মসৃণ, হলুদ-রঙের টেবিলের ওপর দিয়ে কদমে ছুটে যেত এক জোড়া কালো ঘোড়া। আইভান একটা সরু কাঠি চাবুকের মতো করে তাই দিয়ে তাদের চালাতো, তাড়া দিত; আর বলতো, "ওরা এখন চলেছে বিশপের বাড়ি।"



তারপর সে আর একটা তেলাপোকার পিঠে একখানা কাগজ এটে দিয়ে তাকে শ্লেজের পিছন পিছন চালাতো। আর বলতো "আমার থলিটা ভুলে ফেলে গিয়েছিলাম। সন্ন্যাসী ওটা নিয়ে ছুটছে চলো—হেট্ হেট্!"

সে আর একটা তেলাপোকার পা সুতো দিয়ে বেঁধে দি· পোকাটা তাতে মাথাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে লাফিয়ে চলতো। তখন সে হাত তালি দিয়ে বলে উঠ্‌তো, "ডিকন-মশাই সান্ধ্যোপাসনার জন্যে মদের দোকান থেকে বেরিয়ে আসছেন।"

তারপর সে আমাদের দেখাতো একটি ইঁদুর। ইঁদুরটা তার কথায় দুপায়ে উঠে দাঁড়াতো, পিছনের পায়ে ভরদিয়ে লম্বা লেজটা ছেঁচড়ে টেনে কালো কাঁচের গুটির মতো, খরখরে চোখ দুটো মিট্ মিট্ করতে করতে হেঁটে চল্‌তো।

সে ইঁদুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতো। তাদের বুক-পকেটে নিয়ে বেড়াতো, চিনি খাওয়াতো, চুমো খেত।

সে শান্ত কণ্ঠে বলতো, "ইঁদুরেরা হচ্ছে চালাক প্রাণী। বাস্তুভূত ইঁদুর খেতে বড় ভালোবাসে। যে তাদের ইঁদুর খাওয়ায় বুড়ো ভূত তার মনস্কামনা পূর্ণ করে।"

সে তাস ও টাকার খেলাও দেখাতে পারতো। তার আর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তফাৎ বিশেষ কিছু ছিল না। একদিন সে তাস খেলায় পর পর কয়েকবার হেরে যাওয়ায় চটে গেল, আর খেলতেই চাইলো না। পরে সে আমাকে বলেছিল, "ওরা নিজেদের মধ্যে ষড় করে ছিল! ওরা ইসারা করছিল আর টেবিলের নিচে তাস চালাচালি করছিল। তুমি কি এটাকে তাস খেলা বল? চালাকিতে আমিও কম নয়।"



অথচ তার বয়স ছিল উনিশ বছর। শরীরটা ছিল আমাদের চারজনের সমান।

ছুটির দিনের সন্ধ্যায় তার বিশেষ স্মৃতি আমার মনে আছে। দাদামশায় আর মাইকেল-মামা যেতেন তাঁদের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে, জাকফ-মামা আসতেন তার গিটার নিয়ে। তাঁর মাথায় ছিল কোঁকড়া চুল, বেশভূষা ছিল অপরিচ্ছন্ন। দিদিমা নানা রকমের মুখরোচক উপকরণ দিয়ে তৈরি করতেন চা, তৈরি করতেন ভদকা। যে-বোতলে তিনি ভদকা রাখতেন সেটার আকার ছিল চৌকো। তার নিচের দিকে ছিল লাল গোলাপ ফুল তোলা। ছুটির দিনের পোশাক-পরে সিগানক ঝলমল করতো। আর আসতো গ্রেগরি, নিঃশব্দে, কাৎ হয়ে, চোখে রঙিন চষমা। আসতো দাস ইউজেনিয়া। তার মুখখানি ছিল বয়স-ফাটে ভরা, রাঙা, শরীরটা জালার মতো। তাদের সঙ্গে আসতো আরও অনেকে। তাদের কারো চেহারা ছিল গাঙদাড়া মাছের মতো, কাউকে দেখতেছিল বান-মাছের মতো। তারা সকলেই ঠেসে খেত, প্রাণভরে মদ টানতো। ছেলে-মেয়েদের দেওয়া হত মিষ্ট সিরাপ। ক্রমে আসরটা বেশ গরম হয়ে সব স্ফূর্তিতে মেতে উঠতো।

জাকফ-মামা তাঁর গিটারে রসের সুর তুলতেন। রসের গান

বাজাবার আগেই তিনি বলতেন, "এস এবার শুরু করা যাক।"

তাঁর কোঁকড়া চুলভরা মাথাটা তুলিয়ে গিটারটার ওপর ঝুঁকে তিনি হাঁসের মতো গলা বাড়িয়ে দিতেন। তাঁর গোল মুখখানি হয়ে যেত স্বপ্নালু, আবেগময় মায়াবিস্তারী চোখ দুটি ঘন কুয়াসায় যেত ছেয়ে। তিনি গিটারের তারে লঘু আঘাত করে আপনা হতেই এক খানি পা তুলে এলো-মেলো সুর বাজাতেন। তার সঙ্গীতের পক্ষে প্রয়োজন ছিল গাঢ় স্তব্ধতার। সে সঙ্গীত বয়ে আসতো সুদূরের এক শান্তিময় নিঝরের মতো। তা সারা অন্তরকে তুলিয়ে দিয়ে এক অজ্ঞাত বেদনা ও চঞ্চলতায় ভরে তুলতো। সেই সঙ্গীতের সুরে আমরা সকলেই হয়ে পড়তাম বিষণ্ণ। সবচেয়ে বয়স্ক যারা ছিলেন তাঁরাও নিজেদের শিশুর চেয়ে বেশি কিছু মনে করতেন না। আমরা স্থির হয়ে বসে স্বপ্নালু স্তব্ধতায় ডুবে যেতাম। বিশেষ করে সাশা মাইকেলফ আমার পাশে একেবারে সোজা হয়ে বসে তার সারা দেহ-দিয়ে শুনতো, হাঁ করে গিটারটার দিকে তাকিয়ে থাকতো আর আনন্দে পরিসিক্ত হত। আমরা বাকি সকলে বসে থাকতাম যেন জমে গেছি বা মন্ত্রে বশীভূত হয়ে পড়েছি। কেবল একটি মাত্র শব্দ শোনা যেত, সেটি সামোভারের মৃদু সোঁ সোঁ। গিটারের মিনতি-ধারায় সে একটুও বিঘ্ন ঘটাতো না।

মনে পড়ে শারদ-রাত্রির অন্ধকারের গায়ে দুটি ছোট চৌকো জানলা থেকে আলো গিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে কে যেন সে দুটিতে লঘু আঘাত করছে। টেবিলের ওপর জলছে দুটি মোমবাতি তাদের হলুদ রঙের শিখা, সড়কির মতো তীক্ষ্ণ, থরথর করে কাঁপছে।

জাকফ-মামা যখন মদ খেতেন তখন দাঁতের ফাঁক দিয়ে বিশ্রী সুরে গান গাইতেন। সে গানের শেষ ছিল না।...

একটি গানের একটি অংশে ছিল ভিখারীর কথা। তিনি যখন

দহ অংশটি গাইতেন, আমি সইতে পারতাম না, বন্ধনহীন বেদনার আবেগে কাঁদতাম। গান শুনে আর সকলের মনে যেমন ভাব হত সিগনাকেরও মনেও হত তেমি। সে মন দিয়ে শুনতো আর কালো ব'চ চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করতে করতে আধ ঘুম ভরে দৃষ্টি কোণের দিকে তাকিয়ে থাকতো।



কখন কখন সে হঠাৎ আকুল কণ্ঠে বলে উঠতো, "আহা! যদি আমার গানের গলা থাকতো! ভগবান! আমি কি রকম গান গাইতাম!"

আর দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন, "তুমি কি আমাদের ক ভেঙ্গে দেবে জাশা?···বানিয়াংকা একটু নাচবে কি?"

তার অনুরোধটি অবিলম্বে পালিত হত না। কিন্তু কখন কখন যক হঠাৎ সমস্ত তারগুলোর ওপর দিয়ে অঙুল বুলিয়ে হাত মুঠো রে এমন ভাব দেখাতেন যেন মেঝেয় অদৃশ্য কিছু ছুড়ে ফেলছেন। তারপরই বলে উঠতেন, "দুঃখ দূর হয়ে যাও! বাংকা উঠে দাঁড়াও।"

সিগনাক তার হলদে রঙের ব্লাউসটা টেনে সমান করে নামিয়ে রান্নাঘরখানির মাঝখানে খুব সাবধানে, যেন পেরেকের ওপর দিয়ে হাঁটছে এমনি ভাবে এসে দাঁড়াতো। তার কালো মুখখানি লজ্জায় লাল হয়ে যেতো। আর সে মিনতিভরে বলতো, "আরও তাড়াতাড়ি, যাকফ বাসিলিচ!"

তারপরই দেখতাম, গিটারটা ঝম ঝম করে বেজে উঠলো, মেঝেয় গোড়ালিটা ঘা দিতে লাগলো, টেবিলের ওপর ও কাবার্ডে পিরিচ-ডিশ উঠলো খড় খড় করে আর রান্নাঘরের আলোয় ঝলমল করতে লাগলো সিগানক। হাওয়াই যাতা কলের মতো হাত দুখানা দুলিয়ে যেন চিল ছোঁ দিচ্ছে এম্নি ভাবে নিচু হয়ে পা দুখান এত তাড়াতাড়ি নড়তো যে মনে হত সে স্থির হয়ে আছে। তারপর সে মেঝের

দিকে নুয়ে পড়তো, সোনালি সোয়ালো পাখিটির মতো ঘুরপাক দিত তার রেশমের ব্লাউসটা যখন তরঙ্গভঙ্গে কাঁপতো তখন তার ঝলমলানি চারধারে ছড়িয়ে পড়তো। মনে হত আলোয় যেন সে জলছে, বাতাসে ভাসছে। সে নাচতো আত্মবিস্মৃত হয়ে। তার ক্লান্তি ছিল না। মনে হত, যদি দরজা খুলে দেওয়া যায় তাহলে সে নাচতে নাচতে পথে বেরিয়ে, শহর দিয়ে চলে যাবে দূরে...আমাদের এলাকা পার হয়ে।



সেদিন ও যারা টেবিলে বসেছিল তারা পরস্পরকে আঁচড়াতে চীৎকার করতে লাগলো যেন তাদের জীবন্ত পোড়ানো হচ্ছে দাড়িওয়ালা সর্দার কারিগরটি তার সটাক মাথাটি চাপড়ে : কোলাহলে যোগ দিলে। একবার সে আমার দিকে ঝুঁকে আমার কাঁধে তার নরম দাড়িটা বুলিয়ে আমার কানে কানে বললে, যে আমি বয়স্ক লোক, "তোমার বাবা যদি এখানে থাকতো আলেক ম্যাকসিমিচ, তাহলে আরও মজা হত। স্ফূর্তিবাজ লোক ছিল সে সব সময় স্ফূর্তিতে থাকতো। তাকে তোমার মনে আছে, নেই?"

—"না।"

—"মনে নেই? একবার সে আর তোমার দিদিমা—কিন্তু এক থামো।"

তাকে দেখাচ্ছিল দীর্ঘাকার, শীর্ণ কতকটা আমাদের বিগ্রহটি মতো। সে উঠে দাড়িয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে অসাধারণ মোটা গলায় বললে, "আকুলিনা আইভানোভনা, তুমি একবার যেমন ম্যাকসিম সাবাতিয়েবিচের সঙ্গে নেচেছিলে আজও দয়া করে আমাদের সে রকম নেচে দেখাবে কি? আমরা তাতে খুব উৎসাহ আর আনন্দ বোধ করবো।"

দিদিমা সহাস্যে, জড়সড় হয়ে বললেন, "তুমি কি বলছো, বাপু ভেবে দেখ আমার এই বয়সে নাচ? কেবল লোক হাসাবো।"

কিন্তু তিনি যৌবন-সুলভ ভাব নিয়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে, স্কারটটা গুছিয়ে নিলেন এবং ভারী মাথাটি দুলিয়ে রান্না ঘরের মাঝখানে ছুটে যেতে যেতে বললেন, "যদি হাসতে চাও হাস তোমাদের অনেক ভাল হবে। জাসা, বাজাও!"

মামা নিজেকে দিলেন ছেড়ে। চোখ দুটো বন্ধ করে ধীরে বাজাতে লাগলেন। সিগানক ক্ষণিক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর যেখানে দিদিমা ছিলেন, সে এক লাফে সেখানে গিয়ে উবু হয়ে বসে তাঁর চারধারে ঘুরপাক দিল। আর দিদিমা হাত দুখানি ছড়িয়ে, ভুরু জোড়া তুলে, সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেঝেয় নিঃশব্দে চলতে লাগলেন যেন বাতাসে ভাসছেন। তাকে আমার লাগলো বড় মজার তাকে নিয়ে কৌতুক করতে লাগলাম। কিন্তু গ্রেগরি কঠোর ভাবে আঙুল তুলে রইলো, আর বয়স্করা আমি যে দিকে ছিলাম অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাতে লাগলেন।

গ্রেগরি বললে, "গোলমাল করো না আইভান।" সিগনাক বাধ্যের ভাবে লাফ দিয়ে একপাশে সরে গিয়ে দরজার পাশে বসলো। ইউজেনিয়া গলা ফুলিয়ে খাটো মিষ্ট সুরে গান ধরলো:

"সপ্তাহে সাতদিন শনিবার অবধি
রোজগার করে সে যাহা তার শকতি—
ভোর হতে সেই রাত বোনে সে লেশ-ফুল,
পরিশেষে ক্লান্তিতে চোখেতে দেখে ভুল।"

দিদিমাকে মনে হতে লাগ্‌লো তিনি যেন নাচছেন না, গল্প বল্‌ছেন। তিনি লঘু-পায়ে, স্বপ্ন-ভরে চল্‌ছেন, ফির্‌ছেন, ঈষৎ দুলছেন, হাত দুখানির তলা দিয়ে দেখ্‌ছেন। তাঁর প্রকাণ্ড দেহটির সবখানি অনিশ্চয়তায় কাঁপছে, পা দুখানি সাবধানে পথ অনুভব

করে চল্‌ছে। তারপর তিনি হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, যেন [illegible] পেয়েছেন। তাঁর মুখখানি [illegible] লাগলো ও কালো হয়ে উঠলো কিন্তু আবার তখনই তাঁর দীপ্তিময় প্রাণের হাসিতে হয়ে উঠ্‌লো উজ্জ্বল। তিনি একপাশে দেহটি হেলিয়ে দিলেন কাকে যে [illegible] নিজের [illegible] খানি দিতে চাইছেন না, তারপর মাথা নিচু করলেন, [illegible] সব শেষ হল আবার [illegible] কথাগুলি শুনতে [illegible] আনন্দে [illegible] তারপর হঠাৎ [illegible] ছিটকে [illegible] চরকির মতো ঘুরতে লাগলেন। তার [illegible] দেখাতে লাগল আরও চমৎকার। তিনি যেন আবার [illegible] হয়ে উঠলেন। [illegible] তার দিক থেকে চোখ ফিরাতে [illegible] কেউ [illegible] যৌবনোচ্ছ্বাসময় মুহূর্তে তাঁকে দেখাতে লাগলো যেন গৌরবময়ী, [illegible] সুষমা ও মোহিনী মণ্ডিতা। ইউজেনিদা গেয়ে যেতে লাগলো :

"তারপর বারবারে প্রাসাদ-পরে
মেয়েটি বহু রাত নাচে [illegible]-ভরে,
দেরি করে যতটা সাহসে কুলায়—
ছুটি সে কোন দিন, কখনো না পায়।"

নাচ শেষ করে দিদিমা আমোদভরে পাশে তার জায়গাটিতে ফিরে এলেন। সকলে হাততালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালে। দিদিমা তাঁর চুলগুলি সোজা করে তুলে বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে। তোমরা সত্যিকারের নাচ কখন দেখ নি। বালাখিয়ায় আমাদের বাড়িতে একটি মেয়ে ছিল, এখন তার নাম ভুলে গেছি, আরও অনেকের ভুলেছি। তোমরা তার নাচ দেখলে আনন্দে কাঁদতে। তার দিকে একবার তাকালেই খুশি হতে। আর কিছুর দরকার তোমাদের হ'ত না। আমি তার হিংসে করতাম—কি পাপী আমি!"

ইউজেনিয়া গম্ভীরভাবে বললে, "নাচিয়ে, গাইয়েরা জগতে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক।"



... রাজা ডেভিড সম্বন্ধে একটি গান গাইলে। জ্যাকভ ... সিগানককে আলিঙ্গন করে তাকে বললেন, "তোমার থাকা ... । ... মি লোকের মাথা ঘুরিয়ে দেবে।"

সিগানক বললে, "যদি পারতাম ... যদি ভগবান আমার গলায় ... প্রতিদিন গান গেয়ে বেড়াতাম। ফকিরের মতো ... পথে গান গাইতাম।"

তারা সকলে ভদকা পান করলেন। গ্রেগরি পান করলে সকলের চেয়ে কিছু বেশি। দিদিমা তাকে গেলাসের পর গেলাস ভদকা ঢেলে দিতে দিতে সাবধান করে বললেন, "সাবধান গ্রিশা, না হলে চোখে কিছুই দেখতে পারবে না।"

গ্রেগরি দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলে, "কুছ পরোয়া নেহি। আমার চোখের আর দরকার নেই।"

সে মদ টানতে লাগলো কিন্তু মাতাল হল না, তবে প্রতি মুহূর্তে হয়ে উঠতে লাগলো, বাচাল। সে প্রায় সারাক্ষণই আমার বাবার কথা আমাকে বললে।

"আমার বন্ধু ম্যাকসিম্ সাবাতিয়েবিচের অন্তর ছিল দরাজ..."

দিদিমা তার কথায় সায় দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন "হাঁ, সত্যিই..."

এসব আমার কাছে লাগছিল বড় মজার। আমাকে মন্ত্র-মুগ্ধের মত করে, আমার অন্তর এক কোমল, অনস্থকর বিষাদে ভরিয়ে দিল। কারণ বিষাদ ও আনন্দ আমাদের অন্তরে পাশাপাশি, প্রায় অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। একটির পর আর একটি আসে গোপনে, অদেখো দ্রুত গতিতে।

জাকফ-মামা একবার মাতাল হয়ে তাঁর শার্টটা ছিঁড়তে শুরু করলেন। তাঁর কোঁকড়া চুলগুলো, কটা রঙের গোঁফ জোড়া, নাকটা ও ঝোলা ঠোঁটটা জোরে চেপে ধরতে লাগলেন।



চোখের জলে গলে তিনি হাউহাউ করে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমি কি? আমি এখানে কেন?" এবং তার গাল, কপাল ও বুকে আঘাত করে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "অনাবশ্যক। হীন পশু! আমার কোন আশা নেই!"



গ্রেগরি বলে উঠলো, "আ—হা! তুমি ঠিক বলেছ!"

কিন্তু দিদিমাও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তার ছেলের হাত ধরে তাকে বললেন, "হয়েছে জাশা। ভগবান জানেন কি করে আমাদের শিক্ষা দিতে হয়।"

তিনি যখন ভদ্‌কা পান করছিলেন, তখন তাকে দেখাচ্ছিল আরও চমৎকার। চোখদুটি হয়ে উঠেছিল আরও কালো ও হাসছিল। সে চোখ থেকে সকলের ওপরে ঝরে পড়ছিল তাঁর অন্তরের ভালোবাসা। রুমালখানি মুখের একপাশে ঠেলে সরিয়ে তিনি মদিরা-জড়িত কণ্ঠে বললেন, "ভগবান! ভগবান! সব কি রকম ভাল! তোমরা কি দেখছ না সব কত ভাল?"

এটা ছিল তাঁর অন্তরের কথা—তাঁর সারা জীবনের মন্ত্র।

আমার বেপরোয়া মামাটির চোখের জল ও হাহাকারে বিস্মিত হলাম। দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, মামা অমন করে কেন কাঁদছে আর নিজেকেই বা মারলেন কেন?

দিদিমা কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, "তুমি সবকিছুই জানতে চাও! কিন্তু একটু সবুর কর। শীগগিরই এই ব্যাপারটার সব কিছু জান্‌তে পারবে।"

তাতে আমার কৌতূহল আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ্‌লো। আমি

সম্বন্ধে জানতে কারখানায় গিয়ে আইভানকে চেপে ধরলাম। কিন্তু সে কিছুই বলতে চাইলো না। সে গ্রেগরির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে আমাকে ঠেলে বার করে দিতে দিতে বললে, "ছেড়ে দাও, ভকশা, পালাও। তোমাকে ঐ পিপেটার মধ্যে ডুবিয়ে রঙে ছুবিয়ে দেব।"



গ্রেগরি চওড়া, নিচু ষ্টোভটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ষ্টোভটার ওপরে সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা ছিল রঙের বড় বড় হাণ্ডা। হাণ্ডাগুলোর ভিতরের রঙ একখানা লম্বা, কালো খুন্তি দিয়ে সে নাড়ছিল আর মাঝে মাঝে সেটা তুলে দেখছিল। খুন্তিখানার আগা থেকে রঙিন ফোঁটাগুলো হাণ্ডাতে ঝরে পড়ছিল টপ্ টপ্ করে। ষ্টোভের উজ্জল রঙিন শিখা নাচছিল তার চামড়ার এপ্রনের গায়ে। হাণ্ডাগুলোর রঙ সোঁ সোঁ করছিল, আর হাণ্ডা থেকে ঝাঁঝালো বাষ্প উঠে ঘন মেঘাকারে দরজা অবধি বিস্তৃত হচ্ছিল। গ্রেগরি রঙিন চষমা জোড়ার তলা দিয়ে তার ঘোলাটে লাল চোখে তাকিয়ে দেখে আইভানকে হঠাৎ বললে, "তোমাকে বাইরে দরকার দেখতে পাচ্ছ না?"

কিন্তু সিগানক চলে গেলে স্যানটালাইনের একটি বস্তার ওপর বসে সে আমাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলে।

"এখানে এস!"

আমাকে হাঁটুর কাছে টেনে নিয়ে তার তপ্ত নরম দাড়িগুলো আমার গালে বুলোতে বুলোতে যেন স্মৃতিকথা বলছে, এম্নিস্বরে বললে, "তোমার মামা তাঁর স্ত্রীকে মেরে, যন্ত্রণা দিয়ে খুন করেছেন। এখন বিবেক তাকে দংশন করছে। বুঝলে? তুমি সব-কিছু বুঝতে চাও। তাই গোলমালে গিয়ে পড।"

গ্রেগরি ছিল দিদিমার মতোই সরল; কিন্তু তার কথাগুলো লোককে

বিচলিত করতো। মনে হ'ত তার দৃষ্টি লোকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পায়।

সে জড়িতকণ্ঠে বলে যেতে লাগলো, "ও কি ভাবে ওর স্ত্রীকে মেরে ফেলেছিল? ও তার সঙ্গে বিছানায় শুয়ে ছিল। তারপর তার মাথায় একটা চাপা দিয়ে সেটা চেপে ধরে তাকে মারতে থাকে। কেন? ও নিজেই জানে না, কাজটা কেন করেছিল।"



আইভান আঙিনা থেকে পাজা ভরা জিনিষ-পত্র এনে আগুনের সামনে উবু হয়ে বসে হাত সেকছিল। গ্রেগরি তার দিকে মনোযোগ না দিয়ে বললে, "খুন করেছিল তার কারণ সে ছিল ওর চেয়ে ভাল। ও তাকে হিংসে করতো। কাশিবিনরা ভাল লোকদের পছন্দ করে না বাবা। ওরা তাদের হিংসে করে। ওরা তাদের সইতে পারে না। নিজেদের পথ থেকে তাদের সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে। তোমার দিদিমাকে জিজ্ঞেস করো ওরা কি করে তোমার বাবাকে সরিয়েছে। তিনি তোমাকে সব বলবেন। তিনি শঠতা ঘৃণা করেন কারণ তিনি তা বোঝেন না। তাকে সাধুদের মধ্যে একজন বলে ধরা যেতে পারে যদিও তিনি মদ খান, নস্যি নেন। উনি হচ্ছেন চমৎকার মানুষ। ওঁকে আঁকড়ে থেক, কখন ছেড় না।"

সে আমাকে ঠেলা দিয়ে দরজার দিকে সরিয়ে দিলে। আমি আঙিনায় বেরিয়ে গেলাম বিষণ্ণ শঙ্কিত মনে। বানিউশকা এসে আমাকে বাড়ির সদর দরজায় ধরলে এবং চুপি চুপি বললে, "ওকে ভয় করো না। ও ঠিক আছে। ওর চোখের দিকে সোজা তাকিও। ও তাই পছন্দ করে।"

সে-সব আমার কাছে ছিল বিচিত্র ও বেদনাময়। কিন্তু এই অবস্থা ছাড়া আমি আর কিছু জানতামও না। তবে অস্পষ্ট ভাবে মনে

ড়ে, আমাব মা-বাবা এ ভাবে জীবন যাপন করতেন না। তাঁদের থা বলবার ধরন ছিল পৃথক, সুখ-সম্বন্ধে ধারণাও ছিল ভিন্ন। তারা র্বদা একসঙ্গে বেড়াতেন না কোথাও যেতেন, পরস্পরের গা ঘেঁষে সে থাকতেন। দুজনে সন্ধ্যায় জানালায় বসে যখন সপ্তমে সুর রে গান গাইতেন তখন প্রায়ই অনেকক্ষণ ধরে হাসতেন। রাস্তায় লাক জড় হয়ে মুখ তুলে তাঁদের দিকে তাকাতো। তাদের খগুলোকে তখন আমার মনে হতো যেন খাবার পর কতকগুলো টো-মাখানো প্লেট। কিন্তু এখানে লোকে হাসতো কদাচিৎ। রা যখন হাসতো তখন বোঝা কঠিন ছিল, তারা কেন হাসছে। রা প্রায়ই পবস্পবের ওপর রেগে উঠতো, আর ঘরের কোণে গিয়ে রস্পবকে শাসাতো। ছেলে-মেয়েদের তারা রেখে ছিল একেবারে চো কবে। তাদের অবহেলা করতো। ছেলে-মেয়েরা ছিল যেন ধারায় মাটিতে চেপে বসানো ধুলো-রাশি। সেই বাড়িতে আমার জেকে মনে হ'ত অপরিচিত। আমার জীবন-যাত্রার সমস্তটাই ছিল ন একখানি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের পর আঘাত ছাড়া র কিছুই নয়। তাতে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হতো এবং কিছু ঘটতো সবগুলিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ ও ীক্ষা করতে আমি বাধ্য হতাম।

সিগানকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব খুব তাড়াতাড়ি জমে উঠতে গলো। দিদিমা সূর্য্যাস্ত থেকে গভীর রাত অবধি সংসারের কাজ-র্মে ব্যাপৃত থাকতেন, আর আমি প্রায় সারাদিনই সিগানকের াধারে ঘুরতাম। দাদামশায় যখনই আমাকে মারতেন সে তখনই র বেতের সামনে হাত পেতে দিত এবং পরদিন তার ফোলা ঙুলগুলো দেখিয়ে দুঃখের সঙ্গে বলতো, "এতে কোন লাভ নেই।

এতে তোমার শাস্তিটা কম হয় না, কিন্তু দেখ আমার কি দশা হয়
আর আমি এ রকম করবো না।”

কিন্তু তারপরের বারই আবার সে তেমি করতো এবং মিছামি
আঘাতগুলো সইতো।



আমি বলতাম, “মনে করেছিলাম তুমি এরকম আর করবে না।”

—“করতে চাইনি, কিন্তু কি রকম করে যেন হয়ে গেল। কাজ
না ভেবেই করেছি।”

তারপর অল্পদিনের মধ্যে সিগানকের সম্বন্ধে আরওকিছু জান
পারলাম। তাতে তার প্রতি আমার আকর্ষণ ও ভালোবাসা আর
বাড়িয়ে দিল।

প্রতি শুক্রবারে লালচে রঙের আক্তা-ঘোড়া শারাপাকে
শ্লেজে জুততো। ঘোড়াটা ছিল চতুর, শয়তান, দেখতে খাসা এ
দিদিমার আদুরে। তারপর সিগানক হাঁটু-সমান লম্বা ফারকোট
গায়ে দিয়ে, মাথায় ভারী টুপি পরে, কোমরে সবুজ রঙের বে
কষে এঁটে বাজারে যেত খাদ্য-সামগ্রী কিনতে। কখন কখন ত
ফিরে আসতে অনেক দেরি হ'ত। তখন বাড়ির সকলেই হয়ে উঠত
অস্থির। প্রতি মুহূর্তে এক একজন গিয়ে জানলায় দাঁড়াতো।
দিয়ে সার্সির গায়ের বরফ গলিয়ে তার ভেতর দিয়ে রাস্তার দি
তাকিয়ে দেখতো।

একজন জিজ্ঞেস করতো, “ওকে কি দেখা যাচ্ছে না?”

আর একজন উত্তর দিত, “না।”

সকলের চেয়ে বেশি ভাবনা হ'ত দিদিমার। তিনি দাদামশায়
তাঁর ছেলেদের কাছে বলতেন, “হায় রে! তোমরা মানুষ আর ঘো
দুটোকেই নষ্ট করে ফেললে। আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে, তোমাদে

নিজেদের লজ্জা হয় না। বিবেকহীনের দল! নির্ব্বোধ মাতালের গুষ্ঠি! ার জন্যে ভগবান তোমাদের শাস্তি দেবেন।"

দাদামশায় রুক্ষ মেজাজে হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন, "যথেষ্ট হয়েছে! যা চল এই!"



কখন কখন সিগানকের ফিরতে বেলা দুপুর হয়ে যেত। সে এলে মামারা আর দাদামশায় তাড়াতাড়ি আঙিনায় বেরিয়ে যেতেন তার াছে। আর দিদিমা নস্য নিতে নিতে কঠোর মুখে তাদের পিছন পিছন যেতেন ভালুকের মতো। কারণ তখন তাঁরই এক হাত নবার সময়। ছেলে-মেয়েরা ছুটে বেরিয়ে আসতো। আনন্দে শ্লেজ থেকে সব নামানো শুরু হ'ত। শ্লেজখানা ভরা থাকতো শূকরের াংসে, নানা রকমের মরা পাখীতে ও মাংসের রাঙে।

দাদামশায় তীক্ষ্ণ ও অপাঙ্গ দৃষ্টিতে জিনিষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতেন, "আমরা যা যা বলেছিলাম, তুমি সব কিনেছ?"

আইভান আঙিনায় লাফ দিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে আনন্দে উত্তর দিত, "হাঁ, সব ঠিক আছে।" এবং শরীরটা গরম করবার জন্যে দস্তানা-পরা হাত দুখানা চাপড়াতো।

দাদামশায় কঠোর স্বরে বল্‌তেন, "দস্তানা দুটো ছিঁড় না। কিন্‌তে টাকা লাগে। তোমার কাছে খুচরো আছে?"

—"না।"

দাদামশায় নীরবে বোঝাটার চারধারে একবার ঘুরে, খাটো গলায় বলতেন, "আবার তুমি এত-সব কিনেছ। টাকা ছাড়া তুমি এত কিনতে পার না, পার কি? এসব আমি আর হতে দেব না।" বলে তিনি গর্ গর্ করতে করতে চলে যেতেন।

মামারা আনন্দে জিনিষগুলো ঘাঁটতে আরম্ভ করতেন; শিষ দিতে

দিতে পাখী, মাছ, হাঁস, বাছুরের বাং, প্রকাণ্ড মাংস খণ্ড হাতে নিয়ে দোলাতেন।

বিশেষ করে মাইকেল-মামা হতেন খুব খুশি। তিনি জিনিষগুলোর চারধারে লাফিয়ে বেড়াতেন, সেগুলোর গন্ধ শুঁকতেন এবং পরম আনন্দে তার চঞ্চল চোখ ছুটি বন্ধ করে ঠোঁট চাটতেন। তাকে দেখতে ছিল তার বাবার মতো। তার চেহারাটি ছিল দাদামশায়ের মতোই শুষ্ক। কেবল তিনি ছিলেন মাথায় কিছু লম্বা; আর চুলগুলো কালো।



তার ঠাণ্ডা হাতখানা আস্তিনের ভিতর ঢুকিয়ে সিগানককে জিজ্ঞেস করতেন "বাবা তোমাকে কত দিয়েছিলেন?"

—"পাঁচ রুবল।"

—"জিনিষগুলোর দাম হবে পনের রুবল। তুমি কত খরচ করেছ?"

—"চার রুবল, দশ কোপেক।"

—"তাহলে হয়তো বাকি নব্বই কোপেক তোমার পকেটে আছে তুমি কি লক্ষ্য কর না জাকফ যে, কি ভাবে সবখানে টাকা ছড়িয়ে যাচ্ছে?"

জাকফ-মামা কেবল শার্ট গায়ে সেই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসতেন।

তিনি অলসের মতো জিজ্ঞেস করতেন, "বাংকা আমাদের জন্য কিছু ব্রাণ্ডি এনেছ, আন নি?"

দিদিমা ইতিমধ্যে ঘোড়াটার সাজ খুলতেন, আর তাকে আদর করতেন।

বিশাল দেহ শারাপা, ঘন কেশর দুলিয়ে, শাদা দাঁতগুলো দিয়ে দিদিমার ঘাড় কামড়ে তার রেশমী নাকটা ঢুকিয়ে দিত তার চুলে।

াব তাঁর চোখের দিকে তপ্ত চোখে তাকিয়ে চোখের পাতা থেকে ষার ঝেড়ে ফেলে আস্তে হ্রেষাধ্বনি করে উঠতো।

দিদিমা বলতেন, "আহা! তুমি কিছু রুটি চাও।"



তিনি নুণ মাখানো খানিকটা রুটি তার মুখে পুরে দিয়ে তার খনি থলির মতো করে তার নাকের নিচে ধরে গম্ভীর মুখে তার ওয়া দেখতেন।

সিগানক বাচ্চা ঘোড়ার মতো স্ফূর্তিভরে, তার পাশে লাফ দিয়ে য়ে দাঁড়াতো। আর বলতো "ঘোড়াটা এত ভাল দিদিমা! আর ন চালাক।"

দিদিমা মাটিতে পা ঠুকে বলতেন, "সরে যাও! আমার ওপর মার চালাকি খাটিও না। তুমি জান, আজ আমি তোমাকে ভালো সি না।"

দিদিমা পরে আমাকে বলেছিলেন, "সিগানক বাজারে যতখানি র করেছে ততখানি কেনে নি। দাদামশায় যদি ওকে পাঁচ রুবল ন, ও তাহলে তিন রুবল খরচ করে, আর চুরি করে আরও তিন বলের জিনিষ। ও হচ্ছে দুষ্ট ছেলের মতো। চুরি করতে আমোদ য়। একবার চেষ্টা করে সফল হয়েছিল। লোকে তাতে ওকে হবা দেয় আর খুব হাসে। সেই থেকে ওর চুরি করার অভ্যাস য়েছে। তোমার দাদামশায় যৌবনে দারিদ্র্যে কাটিয়েছেন। তখন শেষ খেতে পেতেন না। সে অবস্থায় আর দিন কাটাতে চান না। ই বুড়ো বয়সে হয়ে উঠেছেন লোভী। তার নিজের ছেলেদের কের চেয়ে তার কাছে টাকা হয়ে উঠেছে মূল্যবান। একটা উপহার লেও খুশি হয়ে ওঠেন। মাইকেল আর জাকফের কথা··"

তিনি অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে ক্ষণকাল নীরব রইলেন। তারপর তার

নস্যাধারটির বন্ধ ঢাকনিটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রুক্ষভাবে বলে যেতে লাগলেন, "কিন্তু ঐ লেনিয়া! ও এক অন্ধ নারীর হাতের কাজ… ভাগ্যদেবী…তিনি বসে বসে আমাদের সকলের জন্যে জাল বুনছেন আর আমরা বেছেই নিতে পারছি না, কোনটা ভাল…ঐ আইভান। ওকে যদি লোকে চুরি করতে দেখে তাহলে মারতে মারতে মেরে ফেলবে।"



আবার একটু চুপ করে থেকে শান্তভাবে বলে যেতে লাগলেন, "আমাদের কাজের নীতি আছে অনেক কিন্তু সেগুলো আমরা কাজে খাটাই না।"

পরদিন আমি বাংকার কাছে মিনতি করে বললাম, সে যেন আর চুরি না করে। "তুমি চুরি করলে লোকে তোমাকে মারতে মারতে মেরে ফেলবে।"

বাংকা হাসতে হাসতে বললে, "কেউ আমাকে ছোঁবেও না। আমি লোকের খপ্পর থেকে পিছলে বেরিয়ে আসব…আমি তেজী ঘোড়ার মতো চটপটে।" কিন্তু পর মুহূর্তেই তার মুখখানি ম্লান হয়ে গেল। বললে, "অবশ্য আমি জানি যে, চুরি করা অন্যায় আর বিপদের। আমি চুরি করি…একটু আমোদ পাবার জন্যে, কারণ হয়ে পড়েছি। টাকা থেকে আমি কিছুই বাঁচাই না। সপ্তাহ শেষ হবার আগেই তোমার মামারা আমার কাছ থেকে তা বার করে নেয়। কিন্তু তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। ওরা নিক। আমার যা দরকার তার চেয়ে বেশিই আছে।"

হঠাৎ সে আমাকে কোলে নিয়ে ধীরে দুলিয়ে বললে, "তুমি শক্তিমান পুরুষ হবে। তুমি এমন হালকা, ছিপছিপে! তোমার হাড়গুলো এমন শক্ত। তুমি গিটার বাজাতে শেখ না কেন? জাকভ মামাকে বল। কিন্তু তুমি এখনও খুব ছোট। এটা দুঃখের। তুমি ছো

নও তোমার নিজের একটা মেজাজ আছে! তোমার দাদামশায়কে
া বেশি ভালোবাস না, বাস কি?"

—"জানি না।"

—"তোমার দিদিমা ছাড়া কাশিরিনদের কাউকে আমি পছন্দ
র না। ওরা জাহান্নমে যাক্।"

—"আর আমাকে?"

—"তোমাকে? তুমি তো কাশিরিন নও। তুমি হচ্ছ পিয়েশকফ,
ওটা হল আলাদা রক্ত···সম্পূর্ণ আলাদা বংশ।"

হঠাৎ সে আমাকে খুব জোরে একটি চাপ দিলে।

তারপর প্রায় আর্ত্তনাদ করে বলে উঠলো, "আহা! আমার
ি গানের গলা থাকতো!···এখন পালাও, বুড়ো। আমাকে কাজ
তে হবে।"

সে আমাকে মেঝেয় নামিয়ে একমুঠো খুব সরু পেরেক মুখে
লো। তারপর একখানি বড় চৌকো তক্তার ওপর ভিজে কালো
পড় টান করে বিছিয়ে তাতে পেরেক মারতে লাগলো।

এর খুব অল্পকাল পরেই তার জীবনের শেষ হয়।

এইভাবে তা ঘটে। আঙিনার বেড়ার গায়ে ফটকের পাশে
কটি প্রকাণ্ড মোটা ওক-কাঠের ক্রশ হেলান দিয়ে রাখা ছিল।
শটার হাত দু'খানাও ছিল মোটা ও গ্রন্থিল। ক্রশটা সেখানে পড়ে
ল অনেক দিন ধরে। আমি সে বাড়িতে আসবার পরেই
খেছিলাম। তখন সেটা ছিল হলদে ও নতুন, কিন্তু এখন শরতের
ষ্টিতে হয়ে গিয়েছিল কালো। সেটা থেকে একটা বিশ্রী গন্ধ বার
ত। তাছাড়া জিনিষ-পত্রে ঠাসা আঙিনায় খানিকটা জায়গা জুড়ে
ল। সেজন্য যেতে-আসতে অসুবিধা হত।
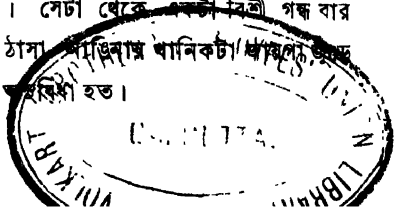
জাকফ-মামা সেটা তাঁর স্ত্রীর কবরের ওপর বসাবার জন্য কিনে ছিলেন। এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মামীমার মৃত্যুর দিনে সেটা নিজে কাঁধে করে গোরস্থানে নিয়ে যাবেন। সে দিনটা ছিল শীতকালের গোড়ার দিকে এক শনিবার।



যে দিনের কথা বলছি সে দিন খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল এবং জোরে বাতাস বইছিল। তুষারপাতও হয়েছিল। দাদামশায় ও দিদিমা মৃতদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা শুনতে তিনটি নাতি-নাতনীকে নিয়ে আগেই গির্জায় গিয়েছিলেন এবং কোন একটা দোষের শাস্তিস্বরূপ আমাকে রেখে গিয়েছিলেন বাড়িতে।

আমার মামারা দুজনে এক রকমের পোশাক পরে খাটো ফার কোট গায়ে দিয়ে, মাটি থেকে ক্রুশটা খাড়া করে রেখে তার হাত দুখানির নিচে দাঁড়ালেন। গ্রেগরি আর বাইরের কয়েকজন লোক সেই ভারী কাঠখানাকে খুব কষ্টে তুলে সিগানকের বলিষ্ঠ, প্রশস্ত স্কন্ধে চাপিয়ে দিল। সিগানক টলতে লাগলো। মনে হল তার পা দুখানা নুয়ে পড়ছে।

গ্রেগরি জিজ্ঞাসা করলে, "এটা বয়ে নিয়ে যাবার মতো জোর তোমার গায়ে আছে?"

—"জানি না। জিনিষটা ভারী মনে হচ্ছে।"

মাইকেল-মামা রাগের সঙ্গে বলে উঠলেন, "এই কানা ভূত, দরজা খুলে দে!"

জাকফ-মামা বললেন, "তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত বাংকা! আমাদের দুজনের চেয়ে তোমার গায়ে জোর বেশি।"

কিন্তু গ্রেগরি ফটকটা খুলে দিয়ে আইভানকে সমানে পরামর্শ দিতে লাগলো, "সাবধান। পড়ে যেওনা। যাও। ভগবান তোমার সঙ্গে থাকুন।"

মাইকেল-মামা রাস্তা থেকে বলে উঠলেন, "টেকো আহাম্মক।"

ইতিমধ্যে আঙিনায় যারা ছিল তারা হেসে উঠলো, জোরে কথা-বার্তা বলতে শুরু করলো, যেন তারা ক্রুশটাকে বিদায় করে বড় খুশি।

গ্রেগরি আমার হাত ধরে কারখানায় নিয়ে গিয়ে কোমল কণ্ঠে বললে, "যথার্থ অবস্থা দেখে দাদামশায় আজ তোমাকে মারবেন না।"

সে আমাকে পশমের কাপড়ের একটা গাদার ওপর বসিয়ে গুলো আমার কাঁধ অবধি জড়িয়ে দিলে। কাপড়গুলো ছিল রং করবার জন্যে। হাণ্ডাগুলো থেকে যে বাষ্প উঠছিল নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে সে গম্ভীর ভাবে বললে, "তোমার দাদামশায়কে আমি ত্রিশ বছর ধরে জানি, বাপু। এই ব্যবসাটার শুরু দেখেছি, শেষও দেখবো। তখন আমরা ছিলাম বন্ধু—প্রকৃতপক্ষে আমরাই দুজনে ব্যবসাটা শুরু করি। কি ভাবে চালাতে হবে সে-সবও ঠিক করি। তোমার দাদামশায় হচ্ছেন চালাক লোক। উনি হতে চেয়েছিলেন কর্তা। আমি তা বুঝতে পারতাম না। কিন্তু ভগবান আমাদের প্রত্যেকের চেয়ে চালাক। তিনি একটু হাসবেন, আর তোমার চেয়ে জ্ঞানী লোকও হয়ে যাবে বোকা। এখানে যে-সব কাণ্ড ঘটে বা কিছু বলা হয়, তুমি এখনও সব বুঝতে পার না; কিন্তু সব বুঝতে হবে। অনাথের জীবন কঠোর। তোমার বাবা, ম্যাকসিম্ সাভাতিয়েবিচ ছিল সেরা লোক। সে সুশিক্ষিতও ছিল। সেইজন্যে তোমার দাদামশায় তাকে পছন্দ করতেন না, তার সঙ্গে কোন সম্পর্কও রাখতে চাইতেন না।"

তার কথাগুলো শুনতে লাগছিল বেশ। আর দেখতে ভাল লাগছিল স্টোভে লাল ও সোনালী শিখাগুলির খেলা, এবং হাণ্ডা থেকে সাদা বাষ্প কুণ্ডলী উঠে ছাদের নিচের দিকে তক্তার গায়ে ঘন

নীল তুষারের মতো জমছিল সেই কুণ্ডলীগুলিকে। ছাদটাকে অসমান জোড়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। সেখান দিয়ে চোখে পড়ছিল আকাশখানা যেন একখানি নীল রিবন। বাতাস গিয়েছিল পড়ে। আঙিনাটাকে দেখাচ্ছিল যেন তার ওপর রয়েছে কাঁচের মতো চকচকে ধুলো ছড়ানো। রাস্তা দিয়ে যে-সব শ্লেজ যাচ্ছিল সেগুলোর খট্ খট্ শব্দ হচ্ছিল। বাড়ির চিমনি থেকে উঠ্ছিল ধোঁয়া। তুষারের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছিল অস্পষ্ট ছায়া···সবই গল্প বলছিল।

রোগা, লম্বা হাত-পা, মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি নেই, কান তুটি বড়, গ্রেগরিকে লাগছিল নিরীহ প্রকৃতি এক গুণীনের মতো। সে খুন্তি দিয়ে হাণ্ডার রঙ নাড়ছে আর আমাকে উপদেশ দিচ্ছে।

"প্রত্যেকের চোখের দিকে সোজা তাকাবে। যদি একটা কুকুরেও তাড়া করে, তুমিও তাই করো। সে তোমাকে ছেড়ে দেবে।"

সে কান পেতে শুনে হঠাৎ বলে উঠলো, "ও কি?"

তারপর পা দিয়ে ষ্টোভের দরজাটা বন্ধ করে ছুটে বরং বলা উচিত লাফিয়ে আঙিনার দিকে চললো। আমিও ছুটে চললাম তার পিছনে। রান্নাঘরের মাঝখানে মেঝেয় সিগানক চিৎ হয়ে পড়ে ছিল। জানলা থেকে আলোর প্রশস্ত রেখা পড়েছিল তার মাথা, বুক ও পায়ে। তার ভ্রূজোড়া ছিল উঠে, তার বাঁকা চোখ তুটি এক দৃষ্টিতে ছিল কালি-পড়া ছাদটার দিকে তাকিয়ে। তার বিবর্ণ ঠোঁট তুখানিতে ফুলে উঠছিল একটি লালচে ফেনা। তার তু কষ দিয়ে তুখানি গাল, গলা ও মাটিতে ঝরে পড়ছিল রক্তের ধারা। আর রক্তের একটা গাঢ় ধারা বয়ে যাচ্ছিল তার পিঠের নিচে। তার পা তুখানি ছড়ানো ছিল অদ্ভুত ভাবে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, তার পা-জামাটাও গিয়েছিল ভিজে। সেটা মেঝের পাটাতনের সঙ্গে লেগে ছিল। পাটাতনটা

বালি দিয়ে পালিশ করার ফলে আলোর মতো ঝক্ ঝক্ করছিল। রক্তের ধারা কয়টি, আলোকের রেখাটিকে ছেদন করে উজ্জ্বল হয়ে দরজার দিকে বয়ে যাচ্ছিল।



সিগানক অসাড় হয়ে পড়ে ছিল। তার হাত দুখানি পড়ে ছিল পাশে। কেবল তার আঙুলগুলো মেঝে আঁচড়াচ্ছিল আর রঙমাখা নখগুলো রোদে চক চক করছিল। এ ছাড়া আর কোন চঞ্চলতা ছিল না।

নার্স ইউজেনিয়া তার পাশে উবু হয়ে বসে তার হাতে একটা সরু মোমবাতি দিলে। বাতিটা সে ধরতে পারলো না, মেঝেয় পড়ে পলতেটা রক্তে ভিজে গেল। ইউজেনিয়া সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মুছে, সিগানকের চঞ্চল আঙুলগুলোর মাঝে আবার চেপে দেবার চেষ্টা করলে। রান্নাঘরটার মধ্যে শোনা গেল একটি অস্ফুট শব্দ; যেন সেটা আমাকে দরজা থেকে উড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু আমি খুব শক্ত করে চৌকাঠ চেপে ধরে রইলাম।

জাকফ-মামা কাঁপতে কাঁপতে, মাথা ঘোরাতে ঘোরাতে সরু গলায় বললেন, “ও হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল।” তাঁর মুখখানি হয়ে গিয়েছিল পাংশু ও শ্রীহীন, চোখ দুটি হয়ে গিয়েছিল ফ্যাকাসে আর মিটমিট করছিল। “ও পড়ে গেল আর ওটা পড়লো ওর ওপর…ওর পিঠে লেগেছিল। আমরা যদি সময় মত ছেড়ে না দিতাম, তাহলে আমাদেরও খোঁড়া হয়ে থাকতে হত।”

গ্রেগরি জড়ের মতো বললে, “এ তোমাদের কাজ।”

—“কি রকম…?”

—“তোমরাই এটা করেছ।”

রক্তের ধারাটি সমানে বয়ে যাচ্ছিল এবং দরজার পাশে একটি

পল্বলের সৃষ্টি করে ছিল। পল্বলটা ক্রমেই যেন হয়ে উঠছিল গাঢ় ও গভীর। আর একটি রক্তের লাল ফেনা মুখ থেকে বার হতেই সিগানক চীৎকার করে উঠলো যেন সে দুঃস্বপ্ন দেখছিল। তারপর নিস্তেজ হয়ে ক্রমে মেঝের সঙ্গে সমান হয়ে এঁটে বা বসে যেতে লাগলো।







য়াকফ-মামা ফিস্ ফিস্ করে বললেন, "মাইকেল ঘোড়ায় চড়ে গির্জ্জায় গেছে বাবার কাছে। আমি ওকে একখানা গাড়িতে করে এখানে এনেছি যত তাড়াতাড়ি পারি! ক্রশটার ডালটার নিচে যে আমি দাঁড়াইনি এটা খুব ভালই হয়েছে। নাহলে আমার দশাও হত এই রকম।"

ইউজেনিয়া আবার সিগানকের হাতে বাতিটা চেপে দিলে। সেই সঙ্গে তার হাতের তালুতে ফেললো কয়েক ফোঁটা মোম ও চোখের জল।

গ্রেগরি মোটা গলায় রুক্ষভাবে বলে উঠলো, "ঠিক হয়েছে! ওর মাথাটা মেঝেতে চেপে দিচ্ছ না কেন, এই অসাবধানী!"

—"তার মানে?"

—"ওর টুপিটা খুলে নিচ্ছ না কেন?"

ইউজেনিয়া আইভানের মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিতেই তার মাথাটা মেঝেয় ঢক্ করে লাগলো। তারপর একপাশে ঘুরে গেল এবং মুখের সেই পাশ দিয়ে রক্ত বার হতে লাগলো প্রচুর। বহুক্ষণ ধরে এই রকম চললো। প্রথমে আমি আশা করে ছিলাম, সিগানক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেঝেয় উঠে বসে বলবে, "ফূঃ! গরমে ভাজা হয়ে যাচ্ছি!" যেমন রবিবারে খাবার পর সে বল্‌তো।

কিন্তু সে উঠলো না, বরং যেন মাটিতে বসে যেতে লাগলো। ততক্ষণে তার ওপর থেকে রোদ গিয়েছিল সরে; রশ্মিটি হয়ে এসেছিল

ছোট, কেবল জানলার চৌকাঠের গায়ে লেগে ছিল। সিগানকের চেহারাটি হয়ে যেতে লাগলো আরও কালো! তার আঙুলগুলো আর নড়ছিল না, তার ঠোঁটের ফেনাও গিয়েছিল মিলিয়ে। তার মাথার তিন দিকে জলছিল তিনটি মোমবাতি। সেগুলির আলোয় তার নীলে কালোয় মেশানো চুলগুলি চকচকে করছিল, তার কালো মুখখানিতে সোনালি আলোক-তরঙ্গ নাচতে নাচতে তার নাকের আগাটি ও রক্তমাখা দাঁতগুলিকে করে দিয়েছিল উজ্জ্বল।



ইউজেনিয়া তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদছিল আর বলছিল "আমার ছোট পাখীটি! আমার সান্ত্বনার ধন।"

ভয়ানক ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল। আমি টেবিলের নিচে লুকিয়ে রইলাম। তারপর দাদামশায় পড়তে-পড়তে রান্না ঘরে ছুটে এলেন। তাঁর গায়ে ছিল রেকুনের লোমের কোট। তাঁর সঙ্গে এলেন দিদিমা, গায়ে ফার-কলার-দেওয়া একটা বড় ঢিলা জামা, এলেন মাইকেল মামা, এল ছেলেরা ও বাইরের অনেক লোক।

গায়ের কোটটা মেঝেয় ফেলে দিয়ে দাদামশায় বলে উঠলেন, "দেখ, তোমরা দুজনে মিলে আমার কি করলে, কেবল তোমাদের অসাবধানতার জন্যে! পাঁচ বছরের মধ্যে ওর দাম হ'ত ওর ওজনের সোনার সমান—এ একেবারে নিশ্চিত!"

মেঝেয় যে কোটগুলো খুলে ফেলা হয়েছিল সেগুলো বাধার সৃষ্টি করছিল বলে আমি আইভানকে দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম না, তাই টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে আসতেই দাদামশায়ের পায়ে ধাক্কা লাগলো। তিনি আমার মামাদের দিকে ঘুষি দেখিয়ে শাসাতে শাসাতে আমাকে এক ধারে ছুড়ে ফেললেন।

মামাদের বললেন, "নেকড়ের পাল!" এবং একখানি বেঞ্চিতে

বসে তার ওপর হাত দুখানি রেখে শুষ্ক চোখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সরু গলায় বললেন, "আমি ব্যাপারটা সব জানি···ও তোমাদের গলায় আটকে ছিল। তাই-ই। হায় বেচারী বানিউশকা! ওরা তোমার কি করলে, অ্যাঁ? মা! ভগবান আমাদের গত বছর থেকে ভালোবাসেন নি, বেসেছেন কি? মা!"



দিদিমা আইভানের পাশে মেঝেয় বসে তার হাত ও বুক পরীক্ষা করছিলেন, তার চোখে ফুঁ দিচ্ছিলেন। তার হাত দুখানি ধরে ঘষছিলেন। তারপর বাতিগুলো সব ফেলে দিয়ে কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। তার কালো ফ্রকে তাঁকে দেখাতে লাগলো খুব গম্ভীর। চোখ দুটি ভয়ঙ্কর বিস্ফারিত করে তিনি খাটো গলায় বললেন, "দূর হ' আপদের দল।"

দাদামশায় ছাড়া সকলেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিনা হট্টগোলে আমরা সিগানককে কবর দিলাম এবং শীঘ্রই তার কথা গেলাম ভুলে।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একটি প্রশস্ত শয্যায় একখানি পুরু কম্বলকে চারপাট করে গায়ে জড়িয়ে আমি শুয়ে শুয়ে দিদিমার প্রার্থনা শুনছিলাম। তিনি হাঁটু গেড়ে বসে বুকে হাত দুখানি যুক্ত করে থেকে থেকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করছিলেন। বাইরে আঙিনায় জমে ছিল কঠিন তুষার। জানলার সার্সির গায়ে তুষারের যে নক্সাগুলি ফুটে উঠেছিল তার মাঝ দিয়ে সবুজ জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল তাঁর করুণ মুখে ও বড় নাকটিতে। এবং কালো চোখ দুটিকে এক উজ্জ্বল শিখাহীন আলোয় তুলেছিল

জ্বালিয়ে। তাঁর রেশমের মতো চকচকে স্থূল বেণীটি যেন চুল্লির আগুনের আভায় চক্ চক্ করছিল তাঁর কালো পোশাকটি খস্ খস্ করছিল এবং তাঁর কাঁধ থেকে তরঙ্গাকারে নেমে মেঝের চারধারে ছড়িয়ে পড়েছিল।



প্রার্থনা শেষ করে দিদিমা নীরবে পোশাক ছাড়লেন। তারপর সেটি সাবধানে ভাঁজ করে কোণের ট্রাঙ্কের ওপর রাখলেন। তারপর বিছানায় এলেন। আমি ঘুমের ভান করে ছিলাম।

তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "তুমি ঘুমোও নি, এই শয়তান। কেবল ঘুমের ভান করে আছ? চাদরখানা গায়ে দেওয়া যাক্।"

তারপর কি হবে আমি আগে থাকতেই বুঝ্‌তে পেরে হাসি চাপতে পারলাম না। তিনি তাই দেখে বলে উঠলেন, "এম্নি করে তুমি বুড়ো দিদিমাকে ঠাট্টা কর?" বলেই কম্বলখানা চেপে ধরে তাঁর দিকে এত জোরে ও এমন কৌশলে টান দিলেন যে, আমি শূন্যে লাফিয়ে উঠলাম। এবং কয়েকবার ঘুরপাক দিয়ে নরম পালকের বিছানাটার ওপর ধপ্ করে পড়লাম। তিনি নিঃশব্দে হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন, "কি হল তোমার, বুড়ো আঙলা? মশা কামড়ালো না কি?"

কিন্তু কখন কখন তিনি এতক্ষণ ধরে প্রার্থনা করতেন যে, আমি বাস্তবিকই ঘুমিয়ে পড়তাম। তিনি যখন শুতে আস্‌তেন আমি জান্‌তেই পারতাম না।

লম্বা প্রার্থনাগুলো সাধারণত হ'ত সারাদিনের দুঃখ-কষ্টের বা ঝগড়া-মারামারির উপসংহার। তাঁর কথাগুলি শুনতে খুব মজা লাগ্‌তো। বাড়িতে যা-সব ঘটতো দিদিমা ভগবানকে সে-সবের একটা মোটামুটি ফিরিস্তি দিতেন। হাঁটু গেড়ে একটা প্রকাণ্ড ঢিপির মতো বসে তিনি প্রথমে তাড়াতাড়ি, অস্পষ্ট ভাবে বলতে আরম্ভ করতেন:

"হে ভগবান, তুমি তো জান আমরা সকলেই ভাল কাজ করবার চেষ্টা করি। বড় ছেলে মাইকেলের শহরে গিয়ে বসা উচিত ছিল। নদীর ধারে থাকলে ওর ক্ষতি হবে। আর ওটা একটা নতুন জায়গা। জানি না এর ফল হবে কি! তারপর বাবা আছেন। [illegible]কে তিনি বেশি ভালোবাসেন। একটা ছেলেকে অন্য সকলের চেয়ে বেশি ভলোবাসা কি ঠিক? উনি ভারী জেদি। বুড়ো হয়েছেন। হে ভগবান, ওঁকে শিক্ষা দাও।"

কালো বিগ্রহটার দিকে বড়, উজ্জ্বল চোখ দুটি তুলে তিনি ভগবানকে পরামর্শ দিতেন, "হে ভগবান, ওঁকে বেশ ভাল একটা স্বপ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দাও কি ভাবে তাঁর ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত!"

তারপর মেঝেয় সটান শুয়ে তক্তায় মাথা ঠুকে তিনি আবার সোজা হয়ে উঠে মিনতি ভরে বলতেন, "ভারবারাকে কিছু সুখ দাও। সে কেমন করে তোমাকে অসন্তুষ্ট করলে? ও কি আর সকলের চেয়ে বেশি পাপী? একটি স্বাস্থ্যবতী যুবতী কেন এমন কষ্ট পাবে? হে ভগবান, গ্রেগরির কথাও একটু মনে করো। ওর চোখ দুটো ক্রমেই বেশি খারাপ হচ্ছে। ও যদি কাণা হয়ে যায় তাহলে ওকে তাড়িয়ে দেবে। সেটা হবে ভয়ঙ্কর। দাদামশায়ের জন্যে ও শরীর পাত করেছে; কিন্তু তুমি কি মনে কর দাদামশায় ওকে সাহায্য করতে পারেন? হে ভগবান! হে জগদীশ্বর।"

তিনি নম্রভাবে মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ থাকতেন। তাঁর হাত দুখানি স্থিরভাবে ঝুল্‌তো তাঁর পাশে, যেন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন বা হঠাৎ হিমে জমে গেছেন।

তিনি ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করতেন, "আর কি?"

“হে ভগবান, যারা বিশ্বাসী তাদের সকলকে রক্ষা কর। আমাকে ক্ষমা কর—আমি অভিশপ্ত নির্ব্বোধ—তুমি তো জান আমি যে পাপ করি তা হিংসা থেকে নয় নির্ব্বুদ্ধিতা থেকে! ভগবান, তুমি তো সব জান! সব-কিছু দেখ!”



দিদিমার ভগবানকে আমি বড় ভালোসতাম। মনে হ'ত তিনি আছেন তাঁর খুব কাছে। আমি প্রায়ই বলতাম, “আমাকে ভগবানের বিষয় কিছু বল।”

তিনি ভগবানের সম্বন্ধে বলতেন, খুব শান্তভাবে, চোখ দুটি বন্ধ করে প্রত্যেকটি কথা টেনে টেনে। তাঁর বলবার ধরন ছিল বিচিত্র। তিনি যখনই ভগবানের কথা বলতেন, তখনই হাঁটু গেড়ে বসতেন এবং মাথায় রুমালখানি ঠিক করে নিতেন।

তিনি বলতেন, “ভগবান থাকেন স্বর্গের ঘাসে ছাওয়া খোলা মাঠে পাহাড়ের ওপরে। তাঁর বসবার বেদিটি হচ্ছে ইন্দ্রনীলমণির। সেটি আছে রুপালি লিনডেন গাছের তলায়। গাছটিতে ফুল ফোটে সারা বছর। কারণ স্বর্গে শীত বা শরৎকাল নেই। সেইজন্যে কখন ফুল শুকোয় না। সেখানে চির আনন্দ। আর ভগবানের চারধারে তুষারের স্তবকের মতো উড়ে বেড়ায় দেবদূতেরা। হয়তো সেখানে মৌমাছিরা গুন গুন করে, শাদা পায়রার ঝাঁক স্বর্গে-মর্ত্ত্যে উড়ে বেড়ায়। আর, ভগবানকে আমাদের সকলের কথা জানায়। এখানে এই পৃথিবীতে তোমার, আমার, দাদামশায়ের একটি করে দেবদূত আছে। ভগবান সকলের ওপর সমান ব্যবহার করেন। ধর, তোমার দেবদূত ভগবানের কাছে গিয়ে বললে, ‘লেক্সি তার দাদামশায়কে জিভ ভেঙচেছে।’ আর ভগবান বললেন, ‘বেশ; বুড়ো ওকে বেত মারুক।’ আমাদের সকলেরই এই রকম হয়।

যে যার উপযুক্ত ভগবান তাকে তাই দেন—কাউকে দেন দুঃখ, কাউকে দেন আনন্দ। তিনি যা করেন সবই ঠিক। দেবদূতেরা আনন্দে ডানা দুখানি মেলে উড়তে উড়তে তাঁর গুণগান করে, 'হে ভগবান, তোমারই মহিমা! তোমারই মহিমা।' আর তিনি একটু হাসেন—দেবদূতের পক্ষে এই যথেষ্ট—অনেক।" বলে তিনি মাথা দোলাতে দোলাতে নিজে হাসতেন।



—"তুমি তা দেখেছ?"

—"না আমি দেখিনি, তবে জানি।"

তিনি যখন ভগবান, স্বর্গ বা দেবদূতদের কথা বল্‌তেন, তখন মনে হ'ত তাঁর দেহটি যেন ছোট হয়ে গেছে। তাঁর মুখখানি হয়ে উঠত তারুণ্যমাখা, তরল চোখ দুটি থেকে বার হ'ত বিচিত্র ঔজ্জ্বল্য। আমি তাঁর ভারী সাটিনের মতো বেণীটি হাতে তুলে গলায় জড়িয়ে তাঁর পাশে স্থির হয়ে বসে অফুরন্ত গল্পটি শুনতাম।

"ভগবানকে দেখবার শক্তি মানুষকে দেওয়া হয়নি—মানুষের দৃষ্টি ক্ষীণ। কেবল সাধু-মহাত্মারাই ভগবানকে সামনা-সামনি দেখতে পান। আমি নিজে দেবদূত দেখেছি। তারা অন্তরে মহাক্ষণে প্রকাশিত হয়।···আমি যখন তাদের দেখেছিলাম তখন আনন্দে প্রায় মারা যেতে বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমার বুক ফেটে যাবে, চোখ দিয়ে তখন জল ঝরে পড়ছিল। আহা! কি চমৎকার! ও লেনকা, সোনার বাছা আমার, যেখানে ঈশ্বর আছেন—তা সে স্বর্গেই হোক বা মর্ত্যেই হোক—সব ভাল ভাবে চলে।"

—"কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বল্‌তে চাওনা এখানে আমাদের বাড়িতে সব ঠিক ভাবে চলে!"

দিদিমা বুকে ক্রুশের চিহ্ন এঁকে বলতেন, “ভগবানকে ধন্যবাদ—সব ভাল চলছে।”

এতে আমি বিরক্ত হতাম। আমাদের বাড়িতে যে সব ঠিক চলছে এ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারতাম না। আমার চোখে সব হয়ে আসছিল আরও অসহ্য।

একদিন মাইকেল-মামার ঘরের দরজার সামনে দিয়ে যেতে যেতে নাতালিয়া-মামীকে দেখলাম। তাঁর পরিধানে পোশাক ছিল অসম্বৃত, হাত দুখানি ছিল বুকের ওপর। তিনি বিহ্বলের মতো ঘরের মধ্যে এধার-ওধার করতে করতে ব্যথা-ক্লিষ্ট কণ্ঠে কাঁদছিলেন।

“ভগবান আমাকে রক্ষা কর। এখান থেকে আমাকে সরিয়ে নাও!”

তার প্রার্থনায় আমি সহানুভূতি দেখাতাম। কারণ গ্রেগরি বলতো, “আমি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেই ওরা আমাকে ভিক্ষে করতে তাড়িয়ে দেবে। সেটা এর চেয়ে হবে ভাল।”

তার কথাগুলো আমি বুঝতে পারতাম।

আমি কামনা করতাম সে যেন তাড়াতাড়ি অন্ধ হয়। তাহলে আমি সেই সুযোগে তার সঙ্গে সেখান থেকে চলে যাব এবং দুজনে এক সঙ্গে ভিক্ষা করে বেড়াব। কথাটা আমি গ্রেগরীকে বলেছিলাম। মুচকি হেসে সে উত্তর দিয়েছিল, “ঠিক! আমরা এক সঙ্গে যাব। কিন্তু আমি শহরে গিয়ে সকলকে আমার অবস্থা দেখাব, বলব, এই হচ্ছে বাসিলি কাশিরিনের নাতি—মেয়ের ছেলে। ও আমাকে কোন কাজ দিতে পারে।”

লক্ষ্য করেছিলাম নাতালিয়া-মামীর বসা চোখ দুটোর নিচে খানিকটা জায়গায় কালশিরে পড়ে ফুলে ঠেলে বেরিয়ে ছিল।

দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “মাইকেল-মামা কি ওঁকে মারেন!”



দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর দেন, “হাঁ, ওকে মারে! তবে সে রকম জোরে নয়, শয়তানটা! রাতের বেলা মারলে দাদামশায় আপত্তি করেন না! ওটা হল দুষ্টু। আর বউটা হচ্ছে—জেলির মতো। তবে আগে যেরকম মারতো এখন সে-রকম মারে না। ও ওর মুখে বা কানে ঘুষি মারে. মিনিট খানেক কি ঐ রকম চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে বেড়ায়। এক সময়ে ও মেয়েটাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যন্ত্রণা দিত। তোমার দাদামশায় একবার ঈসটারের উপোসে আমাকে খাবার-সময় থেকে শোবার-সময় অবধি সমানে মেরে ছিলেন। তিনি অনবরত মারছিলেন। কেবল দম নিতে মাঝে মাঝে থামছিলেন, তারপর আবার মারতে শুরু করছিলেন। চামড়ার ফিতে দিয়ে তিনিও মারতেন!”

—“কিন্তু কেন তিনি এ রকম করতেন!”

—“এখন সে কথা মনে নেই। আর একবার তিনি আমাকে এত মেরেছিলেন যে আমি মর মর হয়েছিলাম। তারপর পাঁচঘণ্টা আমাকে খেতে দেন নি। তিনি যখন আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন আমার দেহে প্রাণ প্রায় ছিলই না।”

আমি বজ্রাহত হলাম। দিদিমার শরীরটা ছিল দাদামশায়ের দ্বিগুণ। এটা বিশ্বাস হল না যে, দাদামশায় তাঁকে এইভাবে কাবু করতে পারেন।

জিজ্ঞেস করলাম, “তোমার চেয়ে কি দাদামশায়ের গায়ে জোর বেশি?”

—“জোর বেশি নয়, তাঁর বয়স বেশি। তা ছাড়া, তিনি আমার

স্বামী। আমার জন্যে তাঁকে ভগবানের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করা।”

তিনি বিগ্রহটা কাপড় দিয়ে ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করতেন। সেটা দেখ্‌তে বেশ লাগতো। বিগ্রহটার গায়ে মাথায় ছিল মুক্তো, রুপো ও রঙিন পাথর বসানো। তিনি সেটিতে চুমো দিয়ে বলতেন, “দেখ, এর মুখখানি কি মিষ্টি।”



কখন কখন মনে হত, আমার মামাতো বোন একতারিনা তার পুতুলটি নিয়ে যে-রকম খেলা করে তিনিও ইকনটা নিয়ে সে-রকম সারা মন-প্রাণ ঢেলে খেলা করেন।

তিনি প্রায়ই শয়তান দেখতেন, কখন কতকগুলিকে একসঙ্গে, কখন বা একটি। আমাকে তাদের গল্প বল্‌তেন।

“এক পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাতে ঈসটারের উপোসের মধ্যে আমি রুডল্‌ফোফস্‌দের বাড়ির কাছ দিয়ে যেতে যেতে ওপর দিকে তাকাতেই দেখি চিমনিটার একেবারে কাছে চালের ওপর বসে আছে একটা শয়তান। তার চেহারা আর পোশাক, সব কালো। সে চিমনির ওপর মাথা তুলে খুব জোরে জোরে গন্ধ শুঁকছিল। সে তো বসে গন্ধ শুঁকছে আর গোঁ গোঁ করছে। তার লেজটা রয়েছে চালের ওপর। চেহারাটা অতি বিশ্রী। সে চালের ওপর অনবরত পা ঘষছিল। আমি তাকে ক্রুশের চিহ্ন এঁকে দেখিয়ে বললাম, ‘খ্রীষ্টের পুনর্জন্ম হয়েছে। তাঁর শত্রুরা সব দূর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে।’ সেই কথা শুনে সে খাটো গলায় হুঙ্কার দিয়ে মাথা নিচের দিকে করে পা দুখানা ওপরে তুলে চাল থেকে পিছলে উঠনে এসে পড়লো। রুড্‌লফোফস্‌দের বাড়িতে সেদিন তারা নিশ্চয়ই মাংস রাঁধছিল। শয়তানটা আরাম ক’রে তার গন্ধ শুঁকছিল।”

চালের ওপর থেকে ডিগবাজী খেয়ে উঠোনে শয়তান পড়ছে এই ছবিখনা কল্পনা করে আমি খুব হাসতে লাগলাম। তিনিও হাসতে লাগলেন। তারপর আবার একটি গল্প বল্‌লেন। সে গল্পটি শেষ করে বল্‌লেন আর একটি। তিনি এমন সরলভাবে জোর দিয়ে গল্পগুলি বল্‌তেন যে, লোককে তা বিশ্বাস করতেই হ'ত।

কিন্তু তাঁর সব চেয়ে ভাল গল্প ছিল, খ্রীষ্ট জননী মেরীর। তিনি বল্‌তেন, এই দুঃখভরা ধরণীতে মেরী ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর নারী দস্যুসদ্দার এনগালিচেফকে আদেশ দিচ্ছেন রুষদের হত্যা করো না, বা তাদের কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিও না। তিনি যে কত রকমের গল্প জানতেন তার সংখ্যা নেই। রূপকথা, সেকেলে গল্প ও কবিতা জানতেন অফুরন্ত।

তিনি কাউকেই ভয় করতেন না—দাদামশায়, শয়তান বা কোন শক্তিকেই না; কিন্তু তেলাপোকাকে তাঁর ভয়ঙ্কর ভয় ছিল। তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকলেও তিনি বুঝতে পারতেন। কখন কখন রাতের বেলা তিনি আমাকে জাগিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বল্‌তেন, "ওলিয়েশা, একটা তেলাপোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে: দোহাই, ওটা তাড়িয়ে দাও।"

আধ-ঘুমের ঘোরে উঠে আমি মোমবাতিটা জ্বেলে, মেজেয় শত্রুটিকে খুঁজে বেড়াতাম। তাতে সকল সময় তৎক্ষণাৎ সফলকাম হতাম না। বলতাম, "না, কোথাও তার কোন চিহ্নই নেই।"

কিন্তু মাথায় বিছানার চাদর চাপা দিয়ে স্থির হয়ে শুয়ে তিনি ক্ষীণ-কাতর কণ্ঠে বল্‌তেন, "হ্যাঁ, আছে; ঐখানে আছে একটা। আবার খুঁজে দেখ ভাই! আমি নিশ্চিত যে ঐখানে কোথাও আছেই।"

এতে তাঁর কখনও ভুল হ'ত না। শীঘ্র হোক বা দেরিতে হোক আমি তেলাপোকটাকে বিছানা থেকে কিছুদূরে দেখতে পেতাম। তখন দিদিমা গায়ের কম্বলটা খুলে ফেলে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতেন, এবং সহাস্যে বলতেন, "তুমি ওটাকে মেরে ফেলেছ? ভগবানকে ধন্যবাদ! ধন্যবাদ তোমায়।"

যদি আমি পোকাটাকে খুঁজে না পেতাম, তিনি ঘুমোতে পারতেন না। বুঝতে পারতাম, তিনি রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে থর্ থর্ করে কাঁপছেন। শুনতাম, তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে ফিস্ ফিস করে বলছেন, "ওটা দরজার পাশে রয়েছে। এখন গেছে ট্রাংকের তলায়।"

—"তুমি তেলাপোকাকে এত ভয় কর কেন?"

তিনি উত্তর দিতেন, "আমি তা নিজেই জানি না। ঐ কালো কালো বিকট চেহারার পোকাগুলো কি রকম করে চলে! ভগবান সমস্ত পোকাকেই এক এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। কাঠের পোকাগুলো জানিয়ে দেয় যে ঘরটা স্যাঁৎস্যোঁতে; ছারপোকা হলে বুঝতে হবে, দেওয়ালগুলো নোংরা; সকলেই জানে উকুন হওয়া মানে অসুখের পূর্ব্বাভাষ। কিন্তু এই পোকাগুলো!—ওদের শক্তি যে কতখানি বা ওরা কি খেয়ে যে বাঁচে তা কে জানে?"

*　　　*　　　*　　　*

একদিন তিনি যখন হাঁটুগেড়ে বসে ভগবানের সঙ্গে অকপট চিত্তে কথাবার্তা বলছেন, দাদামশায় দরজাটা খুলে ফেলে ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করে উঠলেন: "মা, ভগবান আবার আমাদের শাস্তি দিয়েছেন! আমাদের বাড়িতে আগুন লেগেছে।"

দিদিমা মেঝে থেকে লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "কি বলছ?" এবং পায়ের শব্দ করতে করতে দুজনে বৈঠকখানায় ছুটে গেলেন।

কানে এল দিদিমা বললেন, "ইউজেনিয়া, বিগ্রহগুলো নামিয়ে নাও। নাতালিয়া ছেলেদের সকলকে পোশাক পরাও।"

দিদিমা কর্ত্রীর মতো কঠোর কণ্ঠে সকলকে আদেশ দিতে লাগলেন, আর দাদামশায় কেবল বলতে লাগলেন, "উফ্।"

আমি ছুটে গেলাম রান্নাঘরে। আঙিনার দিকে জানলাটা সোনার মতো ঝক্ ঝক্ করছিল; মেঝেয় পড়েছিল আলোর হল্‌দে ছাপ। জ্যাকব-মামা পোশাক পরছিলেন। তিনি খালি পা দিয়ে সেগুলো মাড়াতে মাড়াতে লাফিয়ে বেড়াতে লাগলেন আর সরু গলায় বলতে আরম্ভ করলেন। "এটা মাইকেলের কাজ। সে আগুন লাগিয়ে বেরিয়ে গেছে।"

"চুপ্-কর্, কুকুর!" বলে দিদিমা তাঁকে দরজার দিকে এমন রুক্ষ ভাবে ঠেলা দিলেন যে, তিনি পড়তে পডতে রয়ে গেলেন।

জানলার সার্শির গায়ে তুষারের মধ্য দিয়ে কারখানার জ্বলন্ত চালখানা চোখে পড়ছিল। তার খোলা দরজাটার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আস্‌ছিল আগুনের কুণ্ডলায়িত শিখাগুলি। শুক্লরাত্রি। শিখাগুলির রঙ ধোঁযার সঙ্গে মিশে নষ্ট হয় নি। সেগুলোর ঠিক ওপরে ভাসছিল একখানি কালো মেঘ। তাতে রাস্তার রুপালি ধারাটি চোখের সামনে থেকে ঢাকা পড়ে নি। চারধারের তুষার নীল ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল করছিল; বাড়ির দেওয়ালগুলো কাঁপছিল, টলমল করছিল। মনে হচ্ছিল সেগুলো যেন লুটিয়ে পড়তে উদ্যত। কারখানাটার দেওয়ালের চওড়া লাল ফাটলগুলো দিয়েও আগুনের শিখাগুলি বেরিয়ে এসে খেলা করছিল। ছাদের কালো কড়িগুলোর গায়ে লাল-সোনালি রিবন জড়িয়ে তাড়াতাড়ি সেগুলোকে একেবারে ঢেকে ফেল্‌তে লাগলো। কিন্তু এসবের মাঝে অপরিসর চিম্‌নিটি সোজা

দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল। রেশমের খস্ খস্ শব্দের মতো অস্ফুট ফুটফাট আওয়াজ জানলার গায়ে আঘাত করছিল। আগুনটা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছিল। অগ্নিবেষ্টিত কারখানাটি আমার কাছে ক্রমেই হয়ে উঠতে লাগলো মনোমুগ্ধকর।



মাথায় ওপর একটা ওভারকোট চাপিয়ে, প্রথমেই যে জুতো জোড়া :পেলাম, তার মধ্যে পা গলিয়ে বারান্দার পৈঠার ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। আলোকের চমৎকার খেলায় আমার চোখ দুটি বেঁধে গেল। দাদামশায়ের, মামাদের ও গ্রেগরির চীৎকারে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়লাম। দিদিমার আচরণে ভয় হতে লাগ্‌লো। তিনি মাথায় জড়িয়েছিলেন একখানা থলে, গায়ে জড়িয়েছিলেন একখানা বালামচির মোটা চাদর। তিনি আগুনের মধ্যে সোজা ছুটে যাচ্ছিলেন। তারপরই এই বল্‌তে বল্‌তে আগুনের মধ্যে অদৃশ্য হলেন, “এই বোকাগুলো, ভিট্রিওল রয়েছে। ওটা যে ফাটবে।”

দাদামহাশয় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, “ওকে ধর গ্রেগরি! ও মরবে।”

কিন্তু দিদিমা ঠিক তখনই আবার বেরিয়ে এলেন। ধোঁয়ায় তিনি হয়ে গিয়েছিলেন কালো, তাঁর দম প্রায় বন্ধ হয়ে আস্‌ছিল। হাত দুখানি লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে ভিট্রিওলের বোতলটা ধরে ছিলেন এবং বোতলটার ভারে পড়ে ছিলেন নুয়ে।

তিনি কাস্‌তে কাস্‌তে ভাঙা গলায় বললেন, “বাবা, ঘোড়াটাকে ার করে আন! আর এটা আমার আমাব কাঁধ থেকে তুলে নাও। :দখছ না এটা জ্বলছে?”

গ্রেগরি তাঁর কাঁধ থেকে জ্বলন্ত কাপড়খানা টেনে নিলে। তারপর প্রকাণ্ড চামচ দিয়ে বড়বড় বরফের চাপ তুলে কারখানার দরজায় ছুঁড়ে

দিতে লাগ্‌লো। কাজটা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য; দুটি লোকের উপযোগী। মামা কুড়ুল-হাতে চারধারে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলেন; আর দাদামশায় দিদিমার চারধারে ছুট্‌তে ছুট্‌তে তাঁর গায়ে বরফ ছুড়ে ফেলছিলেন। দিদিমা ভিটি ওলের বোতলটা একটা তুষারের গাদার মধ্যে পুঁতে রেখে ছুটে ফটকে গেলেন। সেখানে তখন অনেক লোক জড় হয়েছিল। তাদের সাদর সম্ভাষণ করে বললেন:

“পড়শীরা ঐ গোদাম-ঘরটা বাঁচাও। গোদাম-ঘরে আর বিচালির গাদাটায় যদি আগুন লাগে তাহলে আমাদের সব পুড়ে যাবে, তোমাদেরও বাড়ি-ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়বে। গোদামের চালাখানা টেনে ফেলে দাও। আর বিচালির গাদাটাকে বাগানে টেনে নিয়ে যাও। গ্রেগরি চালের ওপর বরফ না ফেলে মাটিতে ফেল্‌ছ কেন? জাকফ শুধু শুধু ঘুরে বেড়িও না। এদের খান কয়েক কুড়ুল আর কোদাল দাও। বাছারা, তোমরা সত্যিকারের বন্ধুর কাজ কর। ভগবান তোমাদের যেন এর পুরস্কার দেন।”

তিনি আমার কাছে লাগছিলেন আগুনটির মতোই মজার। যে আগুন তাঁকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল, তারই আভায় আলোকিত হয়ে তিনি আঙিনার চারধারে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে দেখাচ্ছিল একটি কালো মূর্ত্তির মতো। তিনি যাচ্ছিলেন সব জায়গায়; সকলকেই সাহায্য করছিলেন। কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াচ্ছিল না।

শারাপা শিষ্‌পা হয়ে দাঁড়িয়ে দাদামশায়কে মাটিতে প্রায় ফেলে দিয়ে আঙিনায় ছুটে এল। তার বড় বড় চোখ দুটোতে আলো পড়ে ঝক্‌ ঝক্‌ করছিল। সামনের পা দুখানা শূন্যে ছুড়তে ছুড়তে সে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগ্‌লো। দাদামশায় লাগাম জোড়া ফেলে

লাফ দিয়ে একপাশে সরে গিয়ে চীৎকার করে উঠলেন, "ঘোড়াটাকে ধর, মা।"

দিদিমা ঘোড়াটার সামনের পা-দুখানার প্রায় তলায় গিয়ে পড়লেন। এবং হাত দুখানা বাড়িয়ে তার সামনে দাঁড়ালেন। ঘোড়াটা করুণ স্বরে হ্রেষাধ্বনি করে উঠ্‌লো; আগুনের কাছ থেকে চট্ করে এক পাশে ঘুরে গেল। দিদিমা তাকে কাছে টেনে নিলেন। সে বাধা দিল না।



দিদিমা তার গলায় থাবা মেরে, লাগাম জোড়া ধরে, খাটো গলায় বললেন, "তোমার আর ভয় করছে না। তুমি কি মনে কর তোমাকে ঐ অবস্থায় ফেলে রাখবো? আহাম্মক নেংটি ইঁদুর।"

তাঁর চেয়ে দ্বিগুণ আকার সেই 'নেংটি-ইঁদুরটি' তাঁর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে শান্ত-শিষ্টের মতো তাঁর সঙ্গে ফটক অবধি গেল। ইউজেনিয়া কতকগুলো ছেলে-মেয়েকে বাড়ি থেকে টেনে বার করে এনেছিল। তারা সকলে তারস্বরে চীৎকার করছিল।

সে বলে উঠ্‌লো, "বাসিলি বাসিলিচ, আমরা আলেকসিকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।"

দাদামশায় হাত নেড়ে বললেন, "চলে যাও! চলে যাও!" ইউজেনিয়া যাতে আমাকে নিয়ে যেতে না পারে, সেজন্যে আমি সিঁড়ির তলায় লুকিয়ে রইলাম।

ততক্ষণে চালটা গিয়ে ছিল পড়ে। বাড়িটার মধ্যে হুড়মুড় শব্দ হল, হুঙ্কার উঠ্‌লো, লাল-নীল ঘূর্ণি ঘুরতে শুরু করলে। আঙিনায় নতুন উদ্যমে বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো আগুনের শিখা। সেগুলো ছুটে এল যারা সেই অগ্নি-লীলায় কোদাল কোদাল বরফের চাপ ফেল্‌ছিল তাদের দিকে।

আগুনের তাপে হাণ্ডাগুলো টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছিল। বাষ্প ও ধোঁয়ার ঘন কুণ্ডলি ও বিকট গন্ধ আঙিনায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। তাতে চোখ জ্বালা করছিল, চোখে জল আসছিল। সিঁড়ির তলা থেকে বেরিয়ে আমি দিদিমার পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

তিনি বলে উঠলেন, “সরে যাও! এখনি চাপা পড়বে। সরে যাও।”

সেই মুহূর্তে মাথায় পেতলের টুপি একটি লোক আঙিনায় ঘোড়া ছুটিয়ে এল। ঘোড়াটার গায়ের রঙ লালচে এবং তার গায়ে ছিল ফেনা। লোকটা মাথার ওপর চাবুক উঁচিয়ে শাসিয়ে বললে, “এই, সব সরে যাও!”

ঠং ঠং শব্দে ঘণ্টা বাজছিল, যেন উৎসব হচ্ছে।

দিদিমা আমাকে সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, “তোমাকে কি বললাম? সরে যাও!”

সে-সময়ে তাঁর কথার অবাধ্য হতে পারলাম না। কাজেই রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে আবার জানলায় দাঁড়ালাম। কিন্তু লোকের সেই ভিড়ের মাঝ দিয়ে আর আগুন দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম না, কেবল দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম পেতলের ও ফারের টুপি।

অল্পকালের মধ্যেই আগুনটাকে আয়ত্তে এনে একেবারে নিবিয়ে ফেলা হল। বাড়িখানা জলে একেবারে নেয়ে উঠ্‌লো। যারা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল, পুলিশ তাদের তাড়িয়ে দিল। দিদিমা রান্নাঘরে এলেন।

বললেন “এ কে? ও, তুমি! তুমি শোও নি কেন? ভয় পেয়েছ, অ্যাঁ? ভয় পাবার কিছু নেই। এখন সব শেষ হয়ে গেছে।”

তিনি আমার পাশে নীরবে বসে একটু কেঁপে উঠ্‌লেন। আবার রাত্রির অন্ধকার ও স্তব্ধতা ফিরে এল। তাতে স্বস্তি বোধ হতে লাগ্‌লো। একটু পরেই দাদামশায় এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন:

—"মা ?"

—"কি ?"

—"তুমি কি পুড়ে গেছ ?"

—"একটু—বলবার মতো কিছু নয়।"

দাদামশায় চকমকি ঠুকে দেশলাই জ্বাললেন। তার আলোয় তাঁর ঝুলমাখা মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। টেবিলের ওপর মোমবাতিটা পেলেন। সেটা জ্বেলে তাড়াতাড়ি দিদিমার কাছে এসে তাঁর পাশে বসলেন।

দিদিমা বল্‌লেন, "এখন আমাদের হাত-মুখ ধুয়ে ফেলা ভাল।" তারও হাতে-মুখে ঝুল-কালি লেগেছিল। তাঁর গা থেকে ধোঁয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ বার হচ্ছিল।

দাদামশায় গভীর নিশ্বাস টেনে বললেন, "কখন কখন ভগবান তোমাকে দয়া করে সুবুদ্ধি দেন।" তারপর তাঁর কাঁধে হাত বুলোতে বুলোতে সহাস্যে আবার বললেন, "কেবল মাঝে মাঝে, এক-আধ-ঘণ্টার জন্যে। তারপর আবার যে-কে-সেই।"

দিদিমাও হাসলেন ; এবং দু একটি কথা শুরু করতেই দাদামশায় তাকে থামিয়ে ভ্রূকুটি করে বললেন, "গ্রেগরিকে আমাদের ছাড়িয়ে দিতে হবে। ওরই অবহেলার জন্যে এই সব গণ্ডগোল হল। ওর কাজের দিন ফুরিয়ে এসেছে। ওর আর পদার্থ নেই। বোকা জাশকাটা সিঁড়িতে বসে কাঁদছে, তুমি বরং তার কাছে যাও।"

দিদিমা উঠে তাঁর আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন। দাদা-মশায় আমার দিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "আগুনটাকে গোড়া থেকেই তুমি সব দেখছিলে, দেখ নি ? তারপর দেখেছিলে দিদিমা কেমন করছিলেন, দেখ নি ? অথচ উনি হচ্ছেন বুড়ো

মানুষ! একেবারে ভেঙে পড়েছেন, ঝরে পড়ছেন! তবুও দেখ—উফ্!"

জড়সড় হয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে তিনি উঠে গিয়ে মোমবাতির পোড়া পলতেটা টিপে নিভিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ভয় পেয়েছিলে?"

—"না।"

—"ঠিক। ভয়ের কিছু ছিল না।"



তারপর কাঁধ থেকে শার্টটা টেনে তুলে তিনি গেলেন কোণে হাত-মুখ ধোবার পাত্রটির কাছে। আমি অন্ধকারে শুনতে পাচ্ছিলাম, তিনি পা ঠুকলেন এবং সেই সঙ্গে বলে উঠ্লেন, "আগুন-লাগানো হচ্ছে বেয়াকুবের কাজ। যে আগুন লাগায় তাকে হাটে-বাজারে মারা উচিত। হয় সে বোকা অথবা চোর। যদি তাই করা হত, তাহলে আর আগুন লাগতো না। এখন যাও, শোও গে! ওখানে বসে আছ কেন?"

তিনি যা বললেন আমি তাই করলাম, কিন্তু সে রাতে আমার চোখে ঘুম এল না। আমি শোবার সঙ্গে সঙ্গেই এক অপার্থিব আর্ত্তনাদ উঠ্লো। মনে হল সেটা বিছানা থেকে উঠছে। ছুটে গেলাম রান্নাঘরে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন দাদামশায়। তাঁর গায়ে শার্ট ছিল না, হাতে ছিল একটা মোমবাতি। তিনি মেঝেয় পা ঠুকছিলেন, আর বাতির শিখাটি ভয়ানক কাঁপছিল। তিনি বলে উঠলেন, "মা! জাকফ! ও কি?"

আমি ষ্টোভের ওপর লাফ দিয়ে উঠে এক কোণে লুকিয়ে রইলাম। সারা বাড়িতে আবার খুব ব্যস্ততা শুরু হ'ল। এক বুকভাঙা আর্ত্তনাদ ঘরের দেওয়ালে ও ছাদে প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রতিমুহূর্ত্তেই বৃদ্ধি পেতে লাগ্লো।

যেমন আগুনের সময় হয়েছিল এখনও হল তেম্নি। দাদামশায় ও মামা লক্ষ্যহীন ভাবে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। আর, দিদিমা তাঁদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে চীৎকার করতে লাগলেন। গ্রেগরি ষ্টোভে কাঠ দিয়ে প্রকাণ্ড লোহার কেটলিটায় জল ভরতে ভরতে চীৎকার শুরু করলে। এবং আষ্ট্রাখানী উটের মতো মাথা দুলিয়ে রান্নাঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো।

দিদিমা কর্ত্রীর মতো গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "প্রথমে ষ্টোভে আগুন দাও।"

গ্রেগরি তাঁর আদেশ পালন করতে ছুট্‌লো এবং আমার পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

তারপর বিহ্বলের মতো বলে উঠলেন, "কে? ফুঃ! তুমি আমাকে কি রকম ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলে! তোমার যেখানে থাকা উচিত নয় তুমি সব সময় সেখানে থাক!"

—"কি হয়েছে?"

মেঝেয় লাফ দিয়ে নেমে শান্ত ভাবে সে বল্‌লে, "নাতালিয়া-মামীর খোকা হয়েছে!"

মনে পড়লো আমার মায়ের ক্ষুদে খোকাটি যখন জন্মায় তিনি তখন এরকম চীৎকার করেন নি।

কেটলিটা আগুনে চাপিয়ে গ্রেগরি ষ্টোভের ওপর আমার কাছে লাফিয়ে উঠে এল এবং পকেট থেকে একটা লম্বা পাইপ টেনে বার করে আমাকে দেখালো।

সে বল্‌লে, "আমার চোখের ভালর জন্যে পাইপ ধরেছি। দিদিমা আমাকে নস্যি নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন; কিন্তু আমার মনে হয়, পাইপ খেলে উপকার হবে বেশি।"

সে ষ্টোভের ধারে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে মোমবাতির ম্লান আলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। তার দু কানে ও গালে ভুষো লেগে ছিল, এক পাশের শার্টটা ছিল ছেঁড়া। তার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তার পাঁজরাগুলো, পিপের পাজরার মতো চওড়া। তার একখানি চশমার কাচ ছিল ভাঙা। কাঁচখানার প্রায় অর্দ্ধেকটা ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসেছিল, আর ফাঁকটার মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটা লাল, ভিজে চোখ, ক্ষতের মতো দেখতে।



পাইপটা দা-কাটা তামাকে ভরে সে প্রসব-কাতর নারীটির আর্ত্তনাদ শুনতে শুনতে মাতালের মতো অসংলগ্ন ভাবে বললে, “তোমার দিদিমাটি এমন পুড়ে গেছেন যে, বুঝে উঠতে পারছি না উনি কি করে ঐ বেচারীর শুশ্রূষা করছেন। শোন, তোমার মামীমা কিরকম কাঁদছেন। ওরা তার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। যখন প্রথমে আগুন লাগে তখনই ওঁর অবস্থা খারাপ হয়ে ওঠে। ভয়ে ওঁকে ঐ রকম করে ফেলেছিল। দেখ, সন্তানের জন্ম দেবার সময় কি রকম যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়। তবুও মেয়েদের কথা একটুও লোকে ভাবে না! কিন্তু আমার কথা মনে রেখ, মেয়েদের কথা খুব ভাবতে হবে। কারণ ওরা হচ্ছে মা—”

এইখানে আমি ঢুলতে লাগলাম। কিন্তু গোলমালে, দরজা বন্ধের শব্দে আর মাইকেল-মামার মাতলামিতে তন্দ্রা গেল ছুটে। তখন আমার কানে এই অদ্ভুত কথাগুলো ভেসে এল, “রাজদ্বার খুলতেই হবে—” —“ওকে ‘রাম’ মিশিয়ে এক গেলাস পবিত্র তেল, আধ গেলাস ‘রাম’ আর এক চামচ ভুষো দাও—”

তারপর মামা না-ছোড়বান্দা ছোট ছেলের মতো বার বার বলতে লাগলেন, “ওকে আমায় একবার দেখতে দাও—!”

তিনি মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে মাটিতে চাপড় মারতে মারতে সামনের দিকে সোজা থুথু ফেলতে লাগলেন। দেখলাম, ষ্টোভটা অসহ্য গরম হয়ে উঠেছে। তাই ঝুলে নেমে পড়তে লাগলাম কিন্তু তাঁর সামনাসামনি হতেই তিনি আমার পা দুখানা চেপে ধরলেন আর আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম।

বল্লাম্ “বোকা!”

তিনি লাফ দিয়ে উঠে আমাকে চেপে ধরে হুঙ্কার দিলেন, “তোকে ষ্টোভের গায়ে আছড়ে মারবো—”

আমি বৈঠকখানায় পালিয়ে গেলাম। দাদামশায়ের পায়ে ধাক্কা লাগলো। সেখানে ছিল খ্রীষ্টের মূর্ত্তি। দাদামশায় আমাকে এক পাশে সরিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে খাটো গলায় বল্‌তে লাগলেন, “আমাদের কারো ক্ষমা নেই—”

ঘরের মাঝখানে টেবিলের ওপর জ্বলছিল একটি মোমবাতি, জানলা দিয়ে শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরের আলো আসছিল।

একটু পরেই তিনি আমার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কি হয়েছে?

আমার হয়েছিল সবই—মাথা টিপ্ টিপ্ করছিল, শরীর হয়ে পড়েছিল ক্লান্ত, অবসন্ন, কিন্তু সে কথা আমার বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কারণ আমার চারধারের সব লাগছিল এমন অদ্ভুত। ঘরের প্রায় প্রত্যেক চেয়ারেই ছিল লোক বসে, সকলেই অপরিচিত।···তারা সকলেই যেন কিসের প্রত্যাশা করছিল। কাছেই কোথায় যেন জল ছিটানো শব্দ হচ্ছিল। হাত দুখানা পিছনে দিয়ে খুব সোজা হয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন জাকফ-মামা। দিদিমা তাঁকে বললেন, “এই ছেলেটিকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও!”

তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য মামা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। আমি বিছানায় শুতেই তিনি অস্ফুষ্ট স্বরে বললেন, "তোমার নাতালিয়া-মামী মারা গেছেন!"



তাতে আমি বিস্মিত হলাম না। কারণ তাঁকে অনেকক্ষণ দেখা যায়নি।

জিজ্ঞেস করলাম, "দিদিমা কোথায়?"

—"নিচে।" বলে তিনি খালি পায়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি বিছানায় শুয়ে চারধারে তাকাতে লাগলাম। মনে হল জানলার সার্সির গায়ে রয়েছে শ্মশ্রুল পাংশু কতকগুলো মুখ। তাদের চোখ নেই, রয়েছে কেবল চক্ষুকোটর। আমি খুব ভালো করেই জানতাম সেগুলো দিদিমার পোশাক, কোণে বাক্সটার ওপর ঝুল্‌ছে। তবুও কল্পনা করতে লাগলাম সেগুলো হচ্ছে কতকগুলো জীবন্ত প্রাণী; সেখানে লুকিয়ে রয়েছে। আমি বালিশের তলায় মাথাটা ঢুকিয়ে একটা চোখ বার করে রাখলাম, যাতে দরজাটা দেখা যায়। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। খুব গরম বোধ করছিলাম; একটা ভারী উগ্র গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল। তাতে মনে পড়লো, যে-রাতে সিগানক মারা যায় সেই রাতখানি আর মেঝেয় যে-রক্তস্রোত বইছিল সেটিকে।

সে বাড়িতে আমি যা-কিছু দেখেছিলাম, সব আমার মনশ্চক্ষে যেন বিস্তৃত হয়ে পথ দিয়ে শীতের শ্লেজ-সারির মতো ভেসে উঠে আমাকে পিষ্ট করতে লাগলো।

আস্তে দরজাটা খুললো। দিদিমা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে কাঁধ দিয়ে পাল্লাটা বন্ধ করে বিগ্রহের নীল বাতিটির দিকে হাত দুখানি বাড়িয়ে

শিশুর মতো করুণ কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন, "আহা আমার হাতখানি! হাতখানিতে এত লাগছে!"



## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেশি দিনও গেল না আবার একটি গোলমাল শুরু হল। একদিন শেষবেলায় চা খাবার পর দাদামশায় আর আমি প্রার্থনা-পুস্তক নিয়ে বসেছি, দিদিমা পেয়ালা-পিরিচগুলো ধুচ্ছেন এমন সময় ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন জাকফ-মামা। তাঁর চেহারাটা ছিল আগের মতোই উস্কো-খস্কো, চুলগুলো দেখাচ্ছিল ঘর-ঝাঁট-দেওয়া ঝাঁটার মতো। তিনি আমাদের কোন রকম সম্ভাষণ না করে টুপিটা এক কোণে ছুড়ে ফেলে উত্তেজিত ভাবে খুব তাড়াতাড়ি বল্‌তে লাগলেন, "মিশকা শুধু শুধু ঝগড়া বাধাচ্ছে। সে আমার সঙ্গে খাবার সময় অনেকখানি মদ টেনে একেবারে মাতাল হয়ে পড়েছে। সে কাঁচের বাসন-পত্র সব ভেঙ্গেছে, একটা তৈরী অর্ডার—পশমের পোশাক—ছিঁড়ে ফেলেছে, জানলা ভেঙ্গেছে, আমাকে আর গ্রেগরিকে অপমান করেছে। এখন আসছে তোমাকে মারতে। সে চীৎকার করে বলছে, 'বাবার দাড়ি টেনে ছিঁড়বো, ওকে খুন করবো।' কাজেই তুমি সাবধান হও।"

দাদামশায় টেবিলের ওপর হাত দুখানা রেখে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করলেন। তাঁর মুখখানি শুকিয়ে সরু ও কঠোর হয়ে দেখাতে লাগলো একখানা টাঙির মতো।

তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "শুনছো মা! এ কথায় তুমি কি মনে কর, অ্যাঁ? আমাদেরই ছেলে তার বাবাকে মেরে ফেল্‌তে আস্‌ছে! ঠিক হয়েছে বাবারা!"

তিনি দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে কাঁধটা সোজা করে দরজার আংটাতে কট করে লোহার খিলটা পরিয়ে দিয়ে আবার জাকফ-মামাকে বললেন, "তোমরা ভারবারার যৌতুকটা হাতাতে চাও বলে এটা হচ্ছে। ব্যাপারটা তাইই!"

তিনি মামার মুখের সামনে ব্যঙ্গ ভরে হাসলেন। মামা তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি তা কিসের জন্যে চাইবো?"

—"তুমি? তোমাকে আমি চিনি!"

দিদিমা পেয়ালা-পিরিচগুলো কাবার্ডে তাড়াতাড়ি তুলে রাখছিলেন বলে চুপ করেছিলেন।

দাদামশায় তিক্ত হাসি হেসে বলে উঠলেন, "কি? বহুৎ আচ্ছা! মা, এই খেঁকশিয়ালটাকে একটা সড়কি কি একটা লোহার ডাণ্ডা দাও। শোন জাকফ বাসিলেফ, তোমার ভাই ঘরে ঢুকলেই তাকে আমার চোখের সামনে খুন করবে।"

মামা পকেটে হাত দুখানা পুরে কোণের দিকে সরে গেলেন।

—"নিশ্চয়ই! তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস না কর—"

দাদামশায় পা ঠুকে বললেন. "তোমাকে বিশ্বাস? না! আমি একটা পশুকে—একটা কুকুরকে, এমন কি একটা সজারুকেও—বিশ্বাস করবো, কিন্তু তোমার ওপর আমার বিশ্বাস নেই। আমি তোমাকে খুব ভাল জানি। তাকে মাতাল করে এই পরামর্শ দিয়েছ। বহুৎ আচ্ছা! দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমাকে এখনই মেরে ফেল—তাকে বা আমাকে বেছে নিতে পার।"

দিদিমা আমার কানে কানে বললেন, "দোতালায় যাও। সেখান থেকে জানলা দিয়ে দেখ। মাইকেল-মামাকে পথে আসতে দেখলেই এসে আমাদের খবর দিও। ছুট্ দাও! শিগগির!"

মামাটির আক্রমণাশঙ্কায় একটু ভয় পেলেও আমাকে যে-কাজের ভার দেওয়া হল তাতে আমি গর্ব্ব বোধ করতে লাগলাম। আমি দোতলায় উঠে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে লক্ষ্য রাখতে লাগলাম। জানলাটার সামনেই চওড়া রাস্তাটা। সেটা এখন ধুলোয় ভরা ছিল। তার মাঝ দিয়ে ঠেলে বেরিয়েছিল বড় বড় পাথরগুলো। রাস্তাটার এক জায়গায় ছিল একটা পার্ক। তার একপ্রান্তে ছিল একটা ঝোপ আর তার ডান দিকে ছিল একটা পুকুর। দিদিমা বলতেন, একবার শীতকালে মামারা বাবাকে ডুবিয়ে মারবার জন্য ঐ পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন।



পথ দিয়ে অলস গতিতে দুটি-চারটি লোক চলাচল করছিল। তাদের ভাব গরম উনুনের গায়ে চিন্তাচ্ছন্ন তেলা পোকার মতো। নিচে থেকে একটা তাপ উঠছিল। তাতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল; সেই সঙ্গে আমার নাকে এসে ঢুকছিল গাজর ও পিঁয়াজ দিয়ে একটা তরকারি রান্নার গন্ধ। এই গন্ধটা নাকে এলেই আমার মন বিষণ্ণ হয়ে পড়তো।

আমি বড় নিৎসাহ হয়ে পড়েছিলাম, ভাবটা সহ্য করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, আমি যেন একটা ব্লাডারের মতো ফুলে উঠছি। কফিনের মতো ছাদওয়ালা ছোট ঘরখানি যেন আমাকে চারধার থেকে চেপে ধরছে।

মাইকেল-মামা গলির ধূসর রঙের বাড়িগুলোর আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিলেন। মাথার টুপিটা কান অবধি টেনে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু টুপিটা তেমনই আটকে ছিল নামছিল না। তাঁর গায়ে ছিল একটা কোট, পায়ে ধুলোমাখা উঁচু বুট। তাঁর ডোরাকাটা পাজামার একটা পকেটে একখানি হাত ঢোকানো ছিল, আর একটা

হাতে দাড়িগুলো টানছিলেন। আমি তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু মনে হচ্ছিল তিনি যেন এক ছুটে রাস্তাটা পেরিয়ে এসে দাদামশায়ের বাড়িখানা তাঁর কর্কশ ও কালো হাত দিয়ে চেপে ধরতে প্রায় উদ্যত। আমার নিচে ছুটে গিয়ে বলা উচিত ছিল, তিনি আসছেন, কিন্তু জানালা থেকে নিজেকে টেনে আনতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, মামা পা ঠুকে বুট থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেললেন যেন ভয় পেয়েছেন। তারপর রাস্তাটা পার হলেন। শুনতে পেলাম, মদের দোকানের দরজায় ক্যাচ করে শব্দ হল। তিনি দোকানটার দরজা খুলতেই তার পাল্লার কাঁচখানা খড় খড় করে উঠলো। আমি ছুটে নেমে গিয়ে দাদামশায়ের ঘরের দরজায় ঘা দেবার আগেই মামা মদের দোকানে ঢুকে পড়লেন।

দাদামশায় দরজা না খুলেই মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কে? ও তুমি? ব্যাপার কি?"

—"সে মদের দোকানে ঢুকেছে।"

—"বেশ। ওপরে ছুটে যাও।"

—"কিন্তু ওপরে আমার ভয় করছে।"

—"আমি তার কি করবো?"

আবার ওপরে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, রাস্তায় তখন আরও ধুলো জমে কালো হয়ে উঠেছিল। পাশের জানলাগুলো থেকে আলো বেরিয়ে তার ওপর পড়েছিল হলদে ছাপের মতো। আর সামনের বাড়িখানি থেকে আসছিল কয়েকটি তারের যন্ত্রের করুণ মধুর ধ্বনি। মদের দোকানেও গান হচ্ছিল। তার দরজাটা খুলতেই ক্ষীণ, ভাঙা কণ্ঠ পথে ভেসে এল। চিনতে পারলাম স্বরটি খোঁড়া ভিখারী নিকিটোউশকার। লোকটা বুড়ো,

মুখে লম্বা দাড়ি। তার এক চোখে চষমা, আর একটি চোখ সর্ব্বদা চেপে বন্ধ করা থাকে। দরজাটা বন্ধ হতে মনে হল, কে যেন তার গানকে কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেললে।



এই ভিখারীটাকে দিদিমা বড় হিংসা করতেন। তার গান শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন, "লোকটা গুণী। কত কবিতা ওর মুখস্থ। এটা একটা শক্তি—তাই-ই।"

কখন কখন তিনি লোকটিকে বাড়িতে ডাকতেন। সে এসে পৈঠার ওপর বসে গান গাইতো বা গল্প বলতো। দিদিমা তার পাশে বসে শুনতে শুনতে বলে উঠতেন, "বলে যাও। তুমি কি আমাকে বল্‌তে চাও যে, আমাদের খ্রীষ্ট-জননী মেরী এই রিয়াজানে কখন এসেছিলেন?"

সে খাটো গলায় বলতো, "তিনি সব জায়গায় গিয়েছিলেন—সকল দেশে।" তার কথায় ছিল দৃঢ়তা।

নিচে পথ থেকে কেমন একটা মায়ময়, স্বপ্নালু অবসাদ আমার কাছে উঠে এল এবং তার বিষম ভার আমার হৃদয়ে ও দৃষ্টিতে চেপে বসিয়ে দিতে লাগলো। কামনা করতে লাগলাম দিদিমা অথবা দাদামশায় তখন আমার কাছে আসুন। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগলাম, আমার বাবা কি রকম লোক ছিলেন যে, দাদামশায় আর মামারা তাঁকে এত অপছন্দ করতেন, এবং দিদিমা, গ্রেগরি ও ইউজেনিয়া তার এত সুখ্যাতি করেন? আমার মা কোথায়? প্রত্যহই আমি তাঁর কথা বেশি করে ভাবতাম। দিদিমা আমাকে যে-সব রূপকথা ও প্রাচীন কাহিনীগুলি বলেছিলেন, মাকে করেছিলাম সেগুলির কেন্দ্র। তাঁর নিজের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তিনি থাকেন নি বলে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কল্পনা

করতাম, তিনি যেন রাজপথের ধারে একটি সরাইয়ে দস্যুদের সঙ্গে বাস করছেন। সেই দস্যুরা পথিকদের যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে ভিখারীদের সঙ্গে সেই লুণ্ঠিত সামগ্রী ভাগ করে নেয়। অথবা তিনি বাস করছেন কোন গহন বনে—নিশ্চয়ই কোন গুহায়—সৎপ্রকৃতি দস্যুদের সঙ্গে। তাদের ঘর-সংসার দেখছেন আর লুণ্ঠীত দ্রব্যাদি আগলাচ্ছেন।…



দিদিমা আমাকে যে-গল্পটি বলেছিলেন, আমি সেটির কথা ভাবতাম সেটির মাঝেই আমার দিনগুলি কাটতো। গল্পটি যেন ছিল একটি স্বপ্ন। নিচে ছাপ্পড় ও আঙিনা থেকে পায়ের শব্দে, গোলমালে, চীৎকারে আমার চমক ভাঙলো। জানলা দিয়ে দেখলাম, দাদামশায়, জাকব-মামা ও সরাই-ওয়ালার একটা লোক মাইকেল-মামাকে ফটকে ঠেলে নিয়ে রাস্তায় বার করে দিচ্ছে। তিনি ঘুষি চালাচ্ছেন; তাঁরাও তাঁর হাতে, পিঠে ও ঘাড়ে মারছেন ও লাথি লাগাচ্ছেন। পরিশেষে তিনি ফটক দিয়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে গিয়ে ধুলোভরা রাস্তার ওপর পড়ে গেলেন। ফটকটাও ধপ করে বন্ধ হ'ল; চাবি ও খিল খড় খড় করে উঠ্‌লো। তারপর সেই দাঙ্গার অবশিষ্ট ফটকে পড়ে রইলো একটা তোবড়ানো টুপি। শেষে সব চুপচাপ।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে থেকে মামা কষ্টে শরীরটাকে টেনে তুল্‌লেন। তাঁর কোট ও পাজামা ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। তিনি রাস্তা থেকে একখানা পাথর তুলে ফটকে ছুড়ে মারলেন। তাতে এত জোর শব্দ হল যে, পিপের তলায় ঘা দিলে সেই রকমের শব্দ হয়। মদের দোকানটা থেকে বেরিয়ে আস্‌তে লাগলো ছায়ার মতো মূর্ত্তি। তারা বেরিয়ে এসে হাত-পা ছুড়ে চীৎকার করতে লাগলো। চারধারের বাড়িগুলোর জানলা থেকে মাথা বেরিয়ে

এল ; রাস্তার লোকে সরগরম হয়ে উঠলো। তারা হাসতে ও কথা বলতে লাগলো। সমস্তটাই লাগছিল একটা গল্পের মতোই মজার কিন্তু সেই সঙ্গে অপ্রীতিকর ও ভয়ঙ্কর। হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটা গেল মুছে, কণ্ঠস্বর গেল থেমে, প্রত্যেকেই আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে গেল অদৃশ্য হয়ে।

* * *

দরজার পাশে একটি বাক্সের ওপর দিদিমা পা দুখানি তুলে স্থির হয়ে বসেছিলেন। তাঁর নিশ্বাস প্রায় পড়ছিলই না। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর তপ্ত, সিক্ত গালে হাত বুলোতে লাগলাম. কিন্তু বোধ হল তিনি আমার স্পর্শ অনুভব করছেন না. ভাঙা গলায় বার বার বল্‌ছেন, "হে ভগবান, আমার আর আমার ছেলেদের জন্যে তোমার কি একটুও দয়া নেই ? ভগবান দয়া কর --"

মনে হয়, দাদামশায় সেই বাড়িতে মাত্র এক বছর—একটি বসন্তকাল থেকে আর একটি বসন্ত কাল অবধি—বাস করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই বাড়িখানি অপ্রীতিকর কুখ্যাতি লাভ করেছিল। প্রায় প্রত্যেক রবিবারেই ছেলেরা আমাদের দরজার কাছ দিয়ে ছুটে যেতে যেতে আমাদের উদ্দেশ করে বলতো "কাশিরিনদের বাড়িতে আবার ঝগড়া হচ্ছে।"

মাইকেল-মামা সাধারণত দেখা দিতেন সন্ধ্যায় এবং সারারাত বাড়িখানিকে এমন করে রাখতেন যে, বাড়ির সকলে ভয়ে কাঠ হয়ে থাকতো। কখন কখন তাঁর সঙ্গে আসতো দু-তিনটি বিশ্রী চেহারার লোক। তারা ছিল সব চেয়ে নিচের স্তরের ভবঘুরে। তারা আস্‌তো অলক্ষ্যে। একবার তারা বাগানের গাছ-পালা মুচ্‌ড়ে, ধোবিখানাটার সব কিছু—কাপড় কাচবার যন্ত্রপাতি, বেঞ্চি, কেটলি—ভেঙে, স্টোভটাকে

গুঁড়িয়ে, মেঝের তক্তা তুলে, দরজার চৌকাঠ খুলে ফেলে মাতলামির চূড়ান্ত করেছিল।

দাদামশায় জানলায় কঠোর মূর্তিতে নীরবে দাঁড়িয়ে এই সব—তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ভাঙবার—শব্দ শুন্‌ছিলেন, আর দিদিমা আঙিনায় অন্ধকারে ছুটে বেড়াতে বেড়াতে মিনতিভরা কণ্ঠে বলছিলেন. "মিশকা! তোমার মতলব কি? মিশকা!"

উত্তরে সেই পশুটা, পাগলের বিশ্রী প্রলাপের মতো, বাগান থেকে রুষভাষার যত গালাগাল সব তাঁকে দিতে লাগলো। এটা নিশ্চয় যে সে জান্‌তো না সে-সব শব্দের অর্থ কি। সে যা উদ্গিরণ করছিল, তার ফল কি হচ্ছিল সে সম্বন্ধেও তার সম্বিৎ ছিল না।

আমি জানতাম সেরকম সময়ে দিদিমার কাছে আমার যাওয়া ঠিক নয়। এদিকে আমার একা থাকতে ভয় করছিল। তাই নিচে দাদামশায়ের ঘরে ছুটে গেলাম। তিনি আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, "বেরিয়ে যাও! আপদ!"

আমি ছুটে ওপরে উঠে গিয়ে জানলা থেকে আঙিনা ও বাগানের দিকে তাকিয়ে দিদিমাকে চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ভয় হচ্ছিল তারা দিদিমাকে খুন করবে। আমি চীৎকার করে উঠলাম; কিন্তু তিনি আমার কাছে এলেন না। কেবল মামা, আমার গলার স্বর শুনে আমার মাকে ভয়ঙ্কর অশ্লীল ভাষায় গাল দিতে লাগলেন।

এই সময়ে দাদামশায়ের একবার অসুখ করেছিল। তোয়ালে জড়ানো মাথাটা বালিশের ওপর অস্থির ভাবে নাড়তে নাড়তে তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আক্ষেপ করতে লাগলেন, "এই জন্যে আমি বেঁচে আছি। নানা পাপ করেছি। টাকা-পয়সা জমিয়েছি। লজ্জা আর

অপমানের না হলে পুলিশ ডেকে ওদের ধরিয়ে দিতাম। তারা ওদের গভর্নরের কাছে নিয়ে যেত। কিন্তু কথাটা একবার ভেবে দেখ! নিজের ছেলেদের যারা পুলিশে ধরিয়ে দেয়, তারা কি রকমের বাপ-মা! এখন চুপচাপ সহ্য করা ছাড়া আর কিছু বলবার নেই।”



তিনি বিছানা থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠলেন এবং টল্‌তে টল্‌তে জানলার কাছে গেলেন।

দিদিমা তাঁর হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস্ করলেন, “কোথায় যাচ্ছ?”

জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে তিনি বললেন, “আলো জ্বালো।”

দিদিমা মোমবাত্তিটা জাল্‌লে তিনি তাঁর হাত থেকে সেটা নিয়ে সৈনিক যেমন করে বন্দুক ধরে তেম্নি ভাবে গায়ের একেবারে কাছে ধরে জানলা থেকে বিদ্রূপকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, “এই মিশ্‌কা! এই ডাকাত! এই ঘেয়ো খেঁকী কুকুর।”

তৎক্ষণাৎ ওপরের সার্সিখানা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল; আর দিদিমার পাশে টেবিলটার ওপর এসে পড়লো আধখানা ইট।

দাদামশায় পাগলের মতো বলে উঠলেন, “তুমি সোজা তাক্ করছো না কেন?”

দিদিমা যেমন ভাবে আমাকে নিতেন তেম্নিভাবে তাঁকে কোলে নিয়ে বিছানায় নিয়ে গেলেন, আর ভয়-জড়িত কণ্ঠে বার বার বল্‌তে লাগ্‌লেন, “তুমি কি ভাবছো? তুমি কি ভাবছো? ভগবান তোমাকে ক্ষমা করুন। আমি দেখতে পাচ্ছি, ওর পরিণাম হচ্ছে সাইবিরিয়া। কিন্তু ও এখন পাগল, তাই বুঝ্‌তে পারছে না, সাইবেরিয়া মানে কি।”

দাদামশায় রাগের সঙ্গে পা দুখানা নেড়ে শুষ্কভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে রুদ্ধস্বরে বল্‌লেন, “ও আমাকে মেরে ফেলুক—”

বাইরে থেকে শোনা গেল চীৎকার, পায়ের শব্দ, দেওয়াল

আঁচড়ানোর আওয়াজ। আমি টেবিলের ওপর থেকে ইটখানা তুলে নিয়ে ছুটে জানলায় গেলাম। দিদিমা আমাকে ঠিক সময়ে ধরে ইটখানা কেড়ে নিয়ে ঘরের কোণে ছুড়ে ফেলে বললেন, “ওরে ক্ষুদে শয়তান!”

আর একদিন মামা এসেছিলেন একখানা মোটা লাঠি নিয়ে। সেদিন তিনি দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে অন্ধকার সিঁড়িগুলোর মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। দাদামশায়ও লাঠি হাতে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল দুজন ভাড়াটে, আর ছিল শুঁড়িখানাওয়ালার স্ত্রী। তার শরীরটা ছিল লম্বা। ভাড়াটে দুজনের হাতে ছিল দুখানা লম্বা লাঠি, আর স্ত্রীলোকটির হাতে ছিল বেলন। সকলেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। দাদামশায় একখানা পা সামনের দিকে বাড়িয়ে, “ভালুক শিকার” নামে ছবিখানার সড়কিহাতে শিকারীটির মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। দিদিমা নিঃশব্দে তাঁদের পিছনে এসে মিনতি ভরে বললেন, “আমাকে ওর কাছে যেতে দাও! ওকে একটি কথা বল্‌তে দাও!”

দিদিমা তাঁর কাছে যেতেই তিনি কোন কথা না বলে তাঁকে কনুই ও পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। চার জনেই দুর্দ্ধর্ষ শক্তিতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মাথার ওপর দেওয়ালে ঝুলছিল একটি লণ্ঠন। সেটা থেকে তাঁদের মুখে মাঝে মাঝে এসে পড়ছিল ম্লান আলো। সকলের ওপরের সিঁড়িটা থেকে আমি সে-সব দেখছিলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল দিদিমাকে আমার কাছে টেনে আন্‌তে।

মামা দরজা ভাঙ্গার কাজটি বেশ সাফল্যের সঙ্গেই করছিলেন। পাল্লাখানা ওপরে তার জায়গাটি থেকে সরে এসে জোড় থেকে খুলে পড়বার মতো হয়ে ছিল। তলাটা ভেঙে খড় খড় করছিল।

দাদামশায় তাঁর অস্ত্র-সঙ্গীদের তেম্নি খড় খড়ে স্বরে বলে উঠলেন, "তোমরা ওর হাত-পা ভেঙ্গে দিও, কিন্তু মাথাটাকে বাঁচিও।"



দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে একটি ছোট জানলা ছিল। তার ভেতর দিয়ে মাথা গলানো যেত। মামা তার সার্সিখানা ভেঙ্গে ফেলে ছিলেন। কাঁচের ভাঙা টুকরোগুলো চারধারে খোঁচার মতো বেরিয়ে ছিল। জানলাটাকে দেখ্‌তে হয়েছিল একটা কালো চোখের মতো। দিদিমা জানলাটায় ছুটে গেলেন এবং তার ভেতর দিয়ে আঙিনায় হাত বাড়িয়ে দিয়ে নাড়তে নাড়তে মামাকে সাবধান করে দিতে লাগ্‌লেন, "মিশকা! খ্রীষ্টের দিব্যি পালাও। ওরা তোমার হাত-পা সব এক এক করে টেনে ছিঁড়বে। চলে যাও।"

মামার হাতে যে মোটা লাঠিখানা ছিল তিনি তা দিয়ে দিদিমার হাতে মারলেন এক ঘা। পরিষ্কার দেখা গেল একটা মোটা কালো জিনিষ তাঁর হাতে পড়লো। তারপরই দিদিমা পড়ে গেলেন; কিন্তু তিনি চিৎ হয়ে পড়েও চীৎকার করতে লাগলেন, "মিশ্‌কা! মি—ই—শ্‌কা! পালাও!"

দাদামশায় ভীষণকণ্ঠে হুঙ্কার দিলেন, "মা, কোথায় তুমি?"

পাল্লাখানা খুলে পড়লো। দেখা গেল, চারধারে কালো চৌকাঠ, যেন একখানা ফ্রেম, তার মাঝে মামা দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই কোদাল থেকে যেমন কাদার তাল ছিটকে পড়ে, তিনিও তেম্নি ভাবে সিঁড়ির নিচে ছিট্‌কে গেলেন।

শুঁড়িখানাওয়ালার স্ত্রী দিদিমাকে দাদামশায়ের ঘরে নিয়ে গেল। দাদামশায় অবিলম্বে তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে বিষণ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন হাড় ভেঙেছে?"

দিদিমা চোখ দুটি বন্ধ করে জবাব দিলেন, "মনে হচ্ছে প্রত্যেকখানা হাড় ভেঙে গেছে। তোমরা তার কি করেছো? কি করেছো তার?"

দাদামশায় বললেন, "স্থির হও! তুমি কি মনে করো আমি একটা বুনো জানোয়ার? সে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় নিচের কুঠুরিতে পড়ে আছে। আমি তাকে জলে একেবারে নাইয়ে দিয়েছি। স্বীকার করি কাজটা করা খারাপ হয়েছে; কিন্তু সমস্ত গোলমালটা বাধালে কে?"

দিদিমা কাতরাতে লাগলেন। দাদামশায় বললেন, "আমি একজন হাড়-বসানো বদ্যিকে ডেকে পাঠিয়েছি।" এবং তাঁর পাশে বিছানায় বসে আবার বললেন, "তার আসা অবধি সয়ে থাক। ওরা আমাদের সর্ব্বনাশ করছে মা—।"

—"ওরা যা চায় তাই দাও।"

—"ভারবারার কি হবে?"

দুজনে অনেকক্ষণ বিষয়টি আলোচনা করলেন। দিদিমা কথা বললেন শান্ত, কাতরভাবে। আর দাদামশায় বললেন, জোরে রাগের সঙ্গে।

তারপর একটি ছোটখাট কুঁজো স্ত্রীলোক ঘরে এসে ঢুকলো। তার মুখখানা প্রকাণ্ড—একান থেকে ও-কান অবধি এবং মাছের মুখের মতো হাঁ হয়েছিল। নিচের চোয়ালটা কাঁপছিল। তার তীক্ষ্ণ নাকটি ওপরের ঠোঁটটার ওপর থেকে উঁকি দিচ্ছিল; চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল না। সে হাঁটছিল ক্লাচেসে ভর দিয়ে। তার পা দুখানা প্রায় নড়ছিলই না। তার হাতে ছিল একটা পোঁটলা। সেটা খট্ খট্ করছিল।

আমার বোধ হতে লাগ্‌লো, সে সঙ্গে এনেছে দিদিমার মৃত্যু। তার কাছে ছুটে গিয়ে আমি প্রাণপণে চীৎকার করে বল্‌লাম, "চলে যাও।"

দাদামশায় আমাকে চেপে ধরলেন, খুব আস্তে নয় এবং রুক্ষ মূর্তিতে টেনে নিয়ে গেলেন চিলে কোঠায়।



## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ



বসন্ত সমাগমে আমার মামারা পৃথক হয়ে গেলেন—জাকফ-মামা রইলেন শহরে, মাইকেল-মামা স্থায়ী হলেন নদীর ধারে। আর দাদামশায় পলিভই ষ্ট্রীটে একখানি মজার বাড়ি কিনলেন। তার নিচের তলায় ছিল একটা রেস্তোরাঁ। বাড়ির ঘরগুলো ছিল ছোট কিন্তু বেশ আরামের। সামনে ছিল একখানি ছোট বাগান। বাগানখানা ছিল নিষ্পত্র উইলো গাছে ভরা। তার ডালগুলো ছিল কাঁটার মতো খাড়া হয়ে।

দাদামশায় আমার দিকে সকৌতুকে চোখ ঠেরে বললেন, “তোমার জন্যে বেত।” আমি তাঁর সঙ্গে বাগানের নরম, কাদাভরা পথ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বাগানখানা দেখে বেড়াচ্ছিলাম। তিনি আবার বললেন, “আমি তোমাকে লিখতে-পড়তে শিখাবো। তাতে সুবিধা হবে।”

ওপর তলাটি ছাড়া বাড়িখানা ভাড়াটেয় ছিল ঠাসাঠাসি। ওপর তলায় লোকজনকে বসাবার জন্যে দাদামশায়ের নিজের একখানি ঘর ছিল; আর চিলেকোঠাটায় থাকতাম দিদিমা আর আমি। তার জানলাটা ছিল রাস্তার ওপর। জানলা দিয়ে ঝুঁকলে সন্ধ্যাবেলায় ও ছুটির দিনে দেখা যেত শুঁড়িখানা থেকে মাতালেরা বেরিয়ে এসে পথ দিয়ে টলতে টলতে আর চীৎকার করতে করতে চলেছে। দোকান থেকে কখন কখন তাদের রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিত

যেন তারা বস্তা। তারা উঠে আবার শুঁড়িখানাটার ভেতরে যাবার চেষ্টা করতো। তখন দরজায় ধুম-ধাম, ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ হত; কব্জাগুলো করে উঠতো কট্ কট্। তারপর শুরু হত মারামারি। এ-সব দেখ্‌তে ভারী মজা লাগতো।



প্রত্যহ সকালে দাদামশায় তাঁর ছেলেদের কারখানায় যেতেন তাদের সাহায্য করতে, আর প্রত্যহ সন্ধ্যায় ফিরতেন ক্লান্ত, নিরুৎসাহ ও রুষ্ট হয়ে।

দিদিমা রাঁধতেন, সেলাই করতেন আর কোন না কোন কাজে রান্নাঘরে ও ফুলবাগানে ঘুরে বেড়াতেন, প্রকাণ্ড একটা লাটিমের মতো। অনবরত নস্য টানতে টানতে হাঁচতে হাঁচতে ও ঘামে ভেজা মুখখানি মুছ্‌তে মুছ্‌তে তিনি বলতেন, “জগৎ-সংসার, তোমার ভাল হোক। ওলিয়েশা, মানিক আমার, এখন জীবনটা বেশ শান্ত, চমৎকার নয়? হে স্বর্গের রাণি, এ তোমারই কাজ—সব হয়েছে বেশ সুন্দর।”

কিন্তু তাঁর শান্ত জীবনের ধারণার সঙ্গে আমার শান্ত জীবনের ধারণার মিল ছিল না। সকাল থেকে রাত অবধি বাড়ির আর সব বাসিন্দারা হট্টগোলের সঙ্গে আসা-যাওয়া ও ওপর-নিচ করে তারা যে সৎ-প্রতিবেশী তার প্রমাণ দিতো। তাদের সব সময়ই তাড়া ছিল, অথচ সব সময় করতো দেরি; সব সময় অনুযোগ করতো, আবার সব সময়ই ডাকতো, “আকুলিনা আইভানোভ্‌না!”

আর অমায়িক আকুলিনা আইভানোভনা পক্ষপাতশূন্য হয়ে সকলের প্রতিই ছিলেন মনোযোগী। তাদের কথার উত্তর দেবার আগে নস্য নিয়ে তাঁর চেকদার রুমালে সাবধানে নাক ও আঙুল মুছতেন। তিনি বলতেন, “উকুনের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে, বাছা, তোমাকে প্রায়ই গা-হাত-পা ধুতে হবে, মিনটের বাষ্পে নাইতে হবে।

আর চামড়ার তলায় যদি উকুন হয়, তাহলে এক চামচ খুব খাঁটি হাঁসের চর্ব্বি, এক চামচ গন্ধক, আর তিন ফোঁটা পারা নিয়ে একটা মাটির সরাতে সাতবার নেড়ে গায়ে মাখবে। মনে রেখ, জিনিষটা যদি কাঠের বা হাড়ের চামচ দিয়ে নাড় তাহলে পারাটুকু নষ্ট হয়ে যাবে, আবার যদি পেতলের বা রুপোর চামচ ব্যবহার কর তাহলে তোমার ক্ষতি হবে।”

কখনো কখনো তিনি একটু ভেবে বল্‌তেন, “তুমি বরং ওষুধ-ওয়ালার কাছে যাও বাছা। আমি ঠিক করে কিছু বল্‌তে পারছি না।”

পারিবারিক কলহ ও তর্ক-বিতর্কে তিনি শান্তি স্থাপনা করতেন; বাড়িতে সন্তান-প্রসব-কালে হতেন ধাত্রী; বাল-রোগের চিকিৎসা করতেন; 'আমাদের দেবীর স্বপ্ন' নামে কবিতাটি আবৃত্তি করতেন, যাতে অন্য স্ত্রীলোকেরা শিখতে পারে এবং গৃহস্থালী গোছগাছ ও চালানোর উপদেশ দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।...

সারাদিন বাগানে ও আঙিনায় আমি তাঁর সঙ্গে লেগে থাকতাম। তাঁর সঙ্গে যেতাম পড়সীদের বাড়ি। সেখানে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে চা খেতেন আর নানা রকমের গল্প বল্‌তেন। আমি যেন তাঁর অংশ হয়ে উঠেছিলাম। আমার জীবনের এই অংশে সেই উৎসাহী মহিলাটির মতো আর কিছু তত স্পষ্ট মনে পড়ে না। লোকের ভালো করতে তাঁর ক্লান্তি ছিল না।

এই দৃশ্যপটের মাঝখানে কোথা থেকে যেন স্বল্প কালের জন্যে আমার মা উপস্থিত হতেন। তিনি ছিলেন উন্নত, কঠোর। শীতের সূর্য্যের মতো তাঁর শীতল, ধূসর, চোখ দুটি দিয়ে আমাদের সব কিছু লক্ষ্য করতেন। এবং তাঁকে মনে করে রাখবার মতো কিছু না রেখে অল্পকালের মধ্যেই অদৃশ্য হতেন।

একবার আমি দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুমি কি ডাইনী?"

তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "তোমার মাথায় কি ঢুকেছে?" তারপরই গম্ভীর কণ্ঠে আবার বলেন, "কি করে ডাইনী হব? ডাইনী-বিদ্যা কঠিন। আমি পড়তে-লিখতেও জানিনা; অক্ষরও চিনি না। দাদামশায়—উনি খুব লেখা-পড়া জানেন। কিন্তু মা মেরী আমাকে শিক্ষিতা করে তোলেন নি।"

তারপর তাঁর জীবনের আর একটি মূর্ত্তি তিনি আমার সামনে সামনে উপস্থাপিত করেন:

"তোমার মতোই আমি ছিলাম অনাথা। আমার মা ছিলেন সামান্য এক চাষী-মেয়ে—আর পঙ্গু। তখনও তাকে বালিকাই বলা চলে সেই সময়ে একটি ভদ্রলোক তাকে ভোগ করেন। তার ফলে যা হবে সেই ভয়ে একদিন রাতের বেলা তিনি জানলা থেকে নিচে লাফিয়ে পড়েন। তাতে তার পাঁজরা আর কাঁধ এমন ভাবে ভেঙে যায় যে, তার ডান হাতখানা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। ডান হাতখানা কাজে-কর্ম্মে খুবই দরকার···তাছাড়া তিনি ছিলেন নামকরা লেশ-কারিগর। অবশ্য এরপর তাঁর মনিবদের আর তাঁকে দরকার হয় না, তাঁরা তাঁকে ছাড়িয়ে দেন। যেমন করে পারতেন তিনি রোজগার করে নিজের দিন চালাতে থাকেন। কিন্তু হাত দুখানা না থাকলে লোকে রোজগার করবে কি দিয়ে? সেই জন্যে তাকে ভিক্ষে করতে হত, পরের দয়ায় বেঁচে থাকতে হত! কিন্তু সেকালে লোকে ছিল এখনকার চেয়ে ধনী আর দয়ালু···সে-সময়ে বালাখানার ছুতোর আর লেশ-কারিগরেরা ছিল বিখ্যাত। লোকে তাদের দেখতে আসতো!

"কখন কখন মা আর আমি শরৎ আর শীতকালটা কাটাতাম

শহরে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ দেবদূত গ্যাব্রিয়েল তলোয়ার ঘুরিয়ে শীতটাকে তাড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীকে বসন্তের কচি-পাতায়, কুঁড়িতে, ফুলে সাজিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনে আবার বেরিয়ে পড়তাম পথে যেদিকে দু'চোখ যায়। আমরা গিয়েছিলাম মুরোমি, গিয়েছিলাম উরিয়েনিংকে, গিয়েছি ভলগার তীর ধরে সেই উজানে, আর গিয়েছি শান্ত ওকার তীরে তীরে। বসন্ত আর গ্রীষ্মকালে পথে পথে বেড়াতে ভাল লাগতো; তখন পৃথিবী হাসতো, ঝলমল করতো, আর ঘাসগুলোকে দেখাতো মখমলের মতো। খ্রীষ্ট-জননী তখন মাঠে মাঠে ছড়িয়ে দিতেন ফুল; সব কিছুই যেন মনে জাগিয়ে তুলতো আনন্দ আর অন্তরে অন্তরে কথা কইতো। কখন কখন আমরা যখন পাহাড়ের ওপর থাকতাম মা তার নীল চোখ দুটি বন্ধ করে গান গাইতেন। তাঁর গলার জোর ছিল না, কিন্তু সুর ছিল ঘণ্টাধ্বনির মতোই স্পষ্ট। মনে হত তার গান শুনতে শুনতে আমাদের চারধারের সবকিছু যেন ঘুমিয়ে পড়ছে। আহা! ভগবান জানেন সে-সময়ে জীবন ছিল কত সুন্দর!

"কিন্তু আমার বয়স ন' বছর হলে, মা বুঝতে শুরু করলেন, তিনি যদি আমাকে তাঁর সঙ্গে আর ভিক্ষে করতে নিয়ে যান তাহলে লোকে তারই দোষ দেবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা যে-জীবন যাপন করছিলাম তিনি তার জন্যে লজ্জিত হয়ে উঠতে লাগলেন। তাই আমরা বালাখানায় বাস শুরু করলাম। সেখানে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়াতাম—রবিবার আর ছুটির দিনে মা গিয়ে বসতেন গির্জ্জার বারান্দায় আর আমি বাড়িতে থেকে লেশ বুনতে শিখতাম। আমি চালাক ছাত্রী ছিলাম। কারণ মাকে সাহায্য করতে ছিলাম ব্যগ্র। কিন্তু কখন কখন কাজে এগোতেই পারতাম না, তাই বসে বসে

কাঁদতাম। কিন্তু দেখ, দু'বছরের মধ্যে, তখনও আমি ছোট্টটি, এমন কাজ শিখলাম যে সারা শহরে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। লোকের সত্যিকারের ভালো লেশের দরকার হলেই তারা তৎক্ষণাৎ আমাদের কাছে আস্‌তো।



"বলতো 'আকুলিনা, তোমার সুতোর নলটা এবার জোরে চালাও।'"



"আমি খুব সুখী ছিলাম···সেগুলো ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। কিন্তু সে-সব ছিল মায়েরই কাজ আমার নয়। তাঁর একখানি মাত্র হাত, আর সেখানি অকর্ম্মণ্য হলেও তিনিই আমাকে শিখিয়ে ছিলেন কি করে কাজ করতে হয়। একজন সু-শিক্ষক দশজন কারিগরের চেয়েও বেশি।

"আমার মনে অহঙ্কার হল। বললাম, 'মা এবার তোমাকে ভিক্ষে করা ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের দুজনের চলবার মতো যথেষ্ট রোজগার আমি করতে পারি।' "

"তিনি বললেন, 'সে-সব কিছুই হবে না। তুমি যা রোজগার করবে, তা তোলা থাকবে তোমার বিয়ের যৌতুকের জন্যে।' "

"এরপর বেশি দিনও গেল না, দাদামশায় দেখা দিলেন। চমৎকার যুবক—বয়স মাত্র বাইশ বছর, পাকা নেয়ে। কিছুদিন থেকে ওঁর মায়ের নজর ছিল আমার ওপর। তিনি দেখ্‌লেন, আমি নিপুণ কারিগর; ভিখারীর মেয়ে বলে আমাকে সহজেই চালাতে পারবেন। কিন্তু—! তিনি ছিলেন চতুর, দুষ্ট-প্রকৃতির মানুষ। তবে সে-সব ঘেঁটে আর দরকার নেই···তাছাড়া, খারাপ লোককে আমরা মনে করে রাখবো কেন? ভগবান তাদের ওপর লক্ষ্য রাখেন; তারা যা করে তিনি সব দেখেন। শয়তানেরা ওদের ভালোবাসে।"

তিনি নাকটা এমনভাবে কুঁচকে প্রাণখুলে হাসতে লাগলেন যে, তা দেখে আমার হাসি পেল। তাঁর চোখ দুটি চক্ চক্ করতে লাগলো। তিনি চোখ দিয়ে আমাকে সোহাগ করতে লাগলেন। কথার চেয়ে তাঁর চোখ দুটি যেন এ বিষয়ে ছিল বেশি মুখর।



* * * *

মনে পড়ে এক শান্ত সন্ধ্যার কথা। দাদামশায়ের ঘরে দিদিমার সঙ্গে চা খেলাম। দাদামশায়ের শরীর ভাল ছিল না; তিনি পোশাক খুলে কাঁধে প্রকাণ্ড তোয়ালে জড়িয়ে বসেছিলেন। তাঁর ঘাম হচ্ছিল প্রচুর, সেই সঙ্গে হাঁফাচ্ছিলেন। তাঁর সবুজ চোখ দুটো হয়ে গিয়েছিল ম্লান, মুখখানি ফুলো ও নীল। তীক্ষ্ণ কান দুটোও হয়েছিল লাল। চায়ের পেয়ালা নেবার জন্যে হাত বাড়াতে তাঁর হাতখানা কাঁপছিল। তাঁর স্বভাবটাও হয়ে গিয়েছিল নম্র। তাঁকে লাগছিল তাঁর মতো নয়।

আদুরে ছেলের মতো ঘ্যান ঘ্যান করে তিনি বললেন, "আমাকে একটুও চিনি দাওনি কেন?"

দিদিমা কোমল অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "ওতে মধু দিয়েছি। তোমার পক্ষে তা ভালো।"

গভীর নিশ্বাস টেনে, গলায় হাঁসের ডাকের মতো শব্দ করতে করতে তিনি চা গিলতে লাগলেন।

তিনি বললেন, "এবার মরবো। দেখ যদি না মরি তো কি বলেছি।"

দিদিমা বললেন, "ভেব না; আমি তোমায় দেখবো।"

—"বেশ ভালই, কিন্তু আমি মরলে সব ভেঙ্গে পড়বে।"

—"কথা বলো না। চুপ করে শুয়ে থাক।"

তাঁর পাতলা দাড়িগুলো আঙুলে জড়িয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে

মিনিট খানেক চুপচাপ শুয়ে রইলেন এবং পাংশু ঠোঁট দুখানি দিয়ে শব্দ করতে লাগ্‌লেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি এমন ভাবে নড়ে উঠ্‌লেন যেন কে তাঁকে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়েছে। তাঁর মনে যা হচ্ছিল, তিনি তা বল্‌তে লাগলেন—

“যত শিগগির সম্ভব জাসকা আর মিশকার বিয়ে করা উচিত। নতুন সম্পর্কে ওদের জীবনের উপর আবার নতুন করে টান হবে। তুমি কি মনে কর?” তারপর তিনি শহরের যোগ্য পাত্রীদের নাম মনে মনে হাঁতড়াতে লাগলেন।

কিন্তু দিদিমা পেয়ালার পর পেয়ালা চা খাচ্ছিলেন। তিনি চুপ করে রইলেন। আর আমি জানলায় বসে শেষবেলার আকাশ-খানার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আকাশখানা ক্রমে আরও লাল হয়ে সামনের বাড়গুলোর জানলায় রক্তিম প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করছিল। কোন দুষ্টামির শাস্তিস্বরূপ দাদামশায় আমাকে বাগানে ও আঙিনায় যেতে বারণ করেছিলেন। বাগানের বারচগাছগুলোর চারধারে গুবরে পোকাগুলো উড়তে উড়তে তাদের ডানা দিয়ে টুংটাং শব্দ করছিল। কাছেই একজনদেব আঙিনায় একটা মিস্ত্রি পিপে তৈরি করছিল, আর অনতিদূরে কে যেন ছুরিতে শান দিচ্ছিল। বাগান আর বাঁধানো পথটা থেকে ছেলে-মেয়েদের কলরব শোনা যাচ্ছিল; কিন্তু তারা ছিল ঝোপের আড়ালে। এ সবই আমাকে আকর্ষণ করছিল, অভিভূত করে ফেলছিল আর সেই সঙ্গে আমার অন্তরে বয়ে আসছিল সন্ধ্যার বিষাদ।

দাদামশায় কোথা থেকে একখানি করকরে নতুন বই হঠাৎ বার করে, সেটা দিয়ে তাঁব হাতের তালুতে চটাৎ করে শব্দ করলেন। তারপর আমাকে স্ফূর্তিভরা স্বরে ডাকলেন।

"এই বদমায়েশ এখানে এস। বস! এই অক্ষরগুলো দেখছো? এটা হচ্ছে 'এZ'। আমার সঙ্গে সঙ্গে বল, 'এZ', 'বুকি', 'বিয়েদি'। এটা কি?"



—" 'বুকি।' "

—"ঠিক। এটা কি?"

—" 'বিয়েদি।' "

—" 'ভুল হল। এটা এZ।' "

—"এগুলো দেখ—'গ্নাগোল'. 'দোব্রো', ইয়েসট্', এটা কি?"

—"দোব্রো।"

—"ঠিক! আর এটা?"

—" 'গ্লাগোল।' "

—"খাসা! এটা?"

—" 'এZ।' "

দিদিমা বললেন, "তোমার এখনও শুয়ে থাকা উচিত, বাবা।"

—"ব্যস্ত হয়ো না! আমার পক্ষে এই-ই ঠিক। এতে মনে দুর্ভাবনা থাকে না। বল লেকৃসি।"

তাঁর গরম ভিজে হাতখানি দিয়ে তিনি আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন এবং প্রত্যেকটি অক্ষরকে আমার কাঁধে আঙুলের টোকা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর গা থেকে ভিনিগারের উগ্র গন্ধ বার হচ্ছিল; সেই সঙ্গে ছিল ভাজা-পিঁয়াজের গন্ধ। আমার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আস্‌ছিল। কিন্তু তিনি উত্তেজিত হয়ে আমার কানের কাছে গর্জ্জন করতে লাগলেন:

" 'Zম্‌লিয়া।' 'লুদি।' "

অক্ষরগুলো আমি চিনতাম, কিন্তু সেগুলোর শ্রাভরূপের সঙ্গে মিল ছিল না।

'জেম্লিয়া' (Z) অক্ষরটিকে দেখাচ্ছিল কেন্নোর মতো ; 'গ্নাগোল' (G) গোল কাঁধ গ্রেগরির মতো ; 'ইয়া' অক্ষরটিকে লাগছিল যেন দিদিমা আর আমি একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি ; আর দাদামশায়ের সঙ্গে যেন সমস্ত বর্ণমালাটির কিছু মিল ছিল।

তিনি আমাকে সেগুলো বার বার পড়ালেন ; কখন সেগুলোর নাম জিজ্ঞেস করলেন, কখন সেগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ধরলেন। তাঁর গরম মেজাজটা নিশ্চয়ই ছিল সংক্রামক। কেননা আমিও ঘামতে ও চীৎকার করতে লাগলাম। তিনি তাতে খুব আমোদ উপভোগ করতে লাগলেন। তিনি হাত দিয়ে বুকখানা চেপে ধরে খুব কাস্‌তে আরম্ভ করলেন এবং বইখানা পাশে ফেলে দিয়ে বল্‌লেন, "মা, শুনছো কি রকম চেঁচাচ্ছে ওটা? এই আস্ট্রাখানী পাগলা, কিসের জন্যে চেঁচাচ্ছিস? অ্যাঁ?"

বললাম, "তুমিই চেঁচাচ্ছিলে?

তখন তাঁকে ও দিদিমাকে দেখে আমার আনন্দ হচ্ছিল। দিদিমা টেবিলে কুনুইয়ের ভর দিয়ে এবং হাতের ওপর গাল রেখে আমাদের দুজনকে দেখছিলেন আর নিঃশব্দে হাসছিলেন। বললেন, "সাবধান না হলে তুমি হাস্‌তে হাসতে ফেটে মরে যাবে।"

দাদামশায় বন্ধুভাবে বল্‌লেন, "অসুখ করেছে বলে মেজাজ খিট-খিটে হয়েছে। কিন্তু তোমার কি হয়েছে বাপু?"

ভিজে মাথাটা দুলিয়ে তিনি দিদিমাকে আবার বললেন, "বেচারী নাতালিয়া যখন বলেছিল ওর স্মৃতিশক্তি নেই তখন ভুল করেছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ, ওর স্মরণশক্তি আছে। বলে যাও, খাঁদা।"

অবশেষে তিনি পরিহাসচ্ছলে আমাকে বিছানা থেকে ঠেলে ফেলে দিলেন। এবং বললেন, "এতেই হবে। তুমি বইখানা নিয়ে যেতে পার। কাল তোমাকে সমস্ত বর্ণমালাটা আমার কাছে নির্ভুল ভাবে বলতে হবে। আমি তোমাকে পাঁচ কোপেক দেব।"



বইখানা নেবার জন্যে আমি হাত বাড়াতেই তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, "তোমার কি হবে তোমার ঐ মা-টা একটুও ভাবে না, বাপু।"

দিদিমা চমকে উঠলেন, "বাবা, তুমি এমন কথা কেন বলছো?"

—"কথাটা আমার বলা উচিত ছিল না—কিন্তু আবেগে বলেছি। মেয়েটা কি বিপথে যাবার মতো!"

তাঁর কাছ থেকে আমাকে রূঢ় ভাবে ঠেলে দিয়ে বললেন, "এখন পালাও! তুমি বেরুতে পার, কিন্তু রাস্তায় নয়, খবরদার নয়। আঙিনায় কি বাগানে যাও।"

বাগানটিতে আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তার মধ্যে যে টিলাটি ছিল তার ওপর আমি উঠতেই পথের ছেলেগুলো আমাকে ঢিল মারতে লাগলো। আমিও সোৎসাহে তাদের আঘাত ফিরিয়ে দিতে লাগলাম।

তারা আমাকে দেখলেই বলতো, "ঐ বোকা ছোঁড়াটা আসছে। ওটাকে উত্তম-মধ্যম দেওয়া যাক্!"

তারা আমাকে যে-নামটি দিয়েছিল সেটির অর্থ জানতাম না বলে আমি রাগ করতাম না; কিন্তু আমি যে এতগুলোর সঙ্গে একা লড়ছি, সেইটে ভাবতে লাগতো ভাল। বিশেষ করে শত্রুরা মধ্যে মধ্যে যখন আমার ঢিলের চোটে ঝোপের মধ্যে পালাতো তখন বড় খুশি হতাম।

আমরা বিদ্বেষশূন্য অন্তরে এই সব যুদ্ধ শুরু করতাম। সাধারণত এ-সবের পরিণামে কেউই আহত হত না।

আমি স্বচ্ছন্দে পড়তে-লিখ্‌তে শিখলাম। আমার ওপর দিদিমার মনোযোগ ক্রমেই বাড়তে লাগলো, বেত্রাঘাতও ক্রমেই হয়ে আস্‌তে লাগলো বিরল। তবে আমার মতে আগের চেয়ে আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল। কারণ আমি যত বড় আর শক্তিমান হয়ে উঠ্‌তে লাগলাম, দাদামশায়ের বিধি-নিষেধও ভাঙতে লাগলাম ততই বেশি, তাঁর আদেশও অমান্য করতে লাগলাম বেশি করে। কিন্তু তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করার বা ঘুষি দেখিয়ে শাসানোর বেশি আর কিছু করতেন না। আমি ভাবতে লাগলাম, তিনি অতীতে আমাকে মেরেছেন অকারণে। আমি তাঁকে সে কথা বললাম।

তিনি আমার চিবুকে আস্তে ঠেলা দিয়ে মুখখানা তাঁর দিকে তুলে চোখ মিট মিট করে টেনে টেনে বললেন,

"কি—ই—ই—?"

এবং আধ হাসির সঙ্গে আবার বললেন, "এই অবিশ্বাসী! তুমি কি করে জানবে তোমার কত বেত খাওয়া দরকার? আমি যদি না জানি, তবে কে জানবে? যাও!"

কিন্তু তিনি কথাটি বলবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর শীর্ণ হাখানি দিয়ে আমার কাঁধ চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি ভাবি তুমি এখন কি—চতুর না সরল?"

—"জানি না।"

—"জান না? আমি তোমাকে এইটুকু বলব—চতুর হও, ওতে লাভ আছে। সরলতা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। মনে রেখ, ভেড়া হচ্ছে সরল। আচ্ছা। পালাও!"

* * * *

অল্প কালের মধ্যেই আমি বানান করে স্তোত্রগুলি পড়তে শিখলাম।...সাধারণত চা খাবার পরই আমার পড়া আরম্ভ হত।

একদিন পড়তে পড়তে বললাম, “দাদামশায়!”

—“অ্যাঁ?”

—“একটা গল্প বল।”

তিনি চোখ দুটো রগড়ে, যেন সবে ঘুম থেকে উঠেছেন, খিন্নকণ্ঠে বললেন, “এই আলসে, পড়াশুনা কর। তুমি গল্প ভালোবাস, অথচ স্তোত্রগুলোয় মন লাগে না।”

আমার সন্দেহ হ'ত স্তোত্রের চেয়ে তিনিও গল্প বেশি ভালোবাসতেন। স্তোত্রগুলো তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। প্রত্যেক রাতে শুতে যাবার আগে তিনি সেগুলো আওড়াতেন।

বৃদ্ধ প্রতিদিনই কোমল হয়ে উঠছিলেন। আমার কাতর মিনতিতে আমার কাছে হার মানলেন। বললেন, “আচ্ছা, বেশ! স্তবের বইখানা সব সময় তোমার কাছে থাকবে, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে শিগ্গিরই বিচারের জন্যে তাঁর কাছে ডাকবেন।”

তা, চামড়া-দেওয়া পুরোনো আরাম-চেয়ারখানার পিছনে হেলান দিয়ে, ছাদের দিকে তাকিয়ে তিনি চিন্তাভরে সেকালের আর তাঁর বাবার কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন। একবার ব্যবসায়ী জায়েবের সব লুটে নেবার জন্যে বালাখানায় ডাকাতরা এসেছিল। দাদামশায়ের বাবা ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে সতর্ক করে দিতে ঘণ্টা-ঘরে ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু ডাকাতরা তাঁর পিছনে পিছনে এসে তাঁকে তলোয়ার দিয়ে কেটে টাওয়ারটার ওপর থেকে নিচে ফেলে দেয়।

“সে সময়ে আমি ছিলাম ছোট। তাই ঘটনাটার কথা আমার

কিছুই মনে নেই। যার কথা প্রথমে মনে পড়ে, সে ছিল একজন ফরাসী। তখন আমি বারো বছরের—ঠিক বারো বছরের। তিন দল বন্দীকে তো বালাখানায় আনা হ'ল। তাদের সকলেরই শরীর ছিল ছোট, শুকনো। তাদের মধ্যে কারো কারো গায়ে ছিল ভিখারীর চেয়েও নোংরা ছেঁড়া পোশাক, অন্য সকলে শীতে এমন কাতর হয়ে পড়েছিল যে দাঁড়াতেই পারছিল না। চাষীরা তাদের মার দিয়ে মেরেই ফেলতো। কিন্তু পুলিশ-রক্ষীরা তা আর হতে দিল না; চাষীদের তাড়িয়ে দিল। তারপর আর কোন গোলমাল হ'ল না। ফরাসীগুলোকে আমাদের সয়ে গেল! কাজে-কর্ম্মে তারা নৈপুণ্য আর বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগলো। লোকগুলো আমুদেও ছিল··· কখন কখন তারা গান গাইতো। নিজ্নি থেকে ট্রইকা চড়ে ভদ্রলোকেরা আসতেন বন্দীদের পরীক্ষা করতে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ফরাসীদের অপমান করতেন, ঘুষি দেখাতেন, এমন কি মারতেও যেতেন। আবার কেউ কেউ তাদের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে তাদের ভাষায় কথা বলতেন, তাদের টাকা দিতেন, বন্ধুত্ব দেখাতেন। এক বুড়ো ভদ্রলোক দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, নেপোলিয়ান ফরাসীদের সর্ব্বনাশ করেছেন। দেখ! তিনি ছিলেন রুষ আর ভদ্রলোক; তাঁর অন্তর ছিল ভাল। সেই বিদেশীদেরও দয়া দেখাতেন!"

তিনি চোখদুটি বন্ধ করে' দুহাতে চুলগুলো সমান করতে করতে একটু চুপ করে রইলেন। তারপর অতীতের স্মৃতিখানি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে মনে জাগিয়ে তুলে বলে যেতে লাগলেন:

"শীত পথে পথে তার মায়া বিছিয়ে দিয়েছে, চাষীদের কুঁড়েগুলি তুষারে গেছে ছেয়ে। তখন ফরাসীরা কখন কখন আমাদের মায়ের

বাড়িতে এসে জানলার নিচে দাঁড়িয়ে সার্সিতে টোকা দিত, চীৎকার করতো, লাফাতো আর গরম গরম পাউরুটি চাইতো। মা বেচবার জন্যে ছোট ছোট পাউরুটি তৈরি করতেন। মা তাদের আমাদের কুঁড়েতে আসতে দিতেন না, জানলা দিয়ে তাদের রুটি দিতেন। একেবারে গরম রুটি; তারা তাঁর হাত থেকে সেগুলো ছিনিয়ে নিয়ে বুকের ভেতর পুরতো। রুটিগুলো ঠেকতো তাদের গায়ের চামড়ায়। কি করে যে তারা সেই তাত সহ্য করতো, আমি কল্পনায়ও আনতে পারি না। তাদের মধ্যে অনেকেই শীতে মারা গিয়েছিল। কারণ তারা ছিল গরম দেশের লোক; এ-রকম ঠাণ্ডায় অভ্যস্ত ছিল না। তাদের মধ্যে দুজন আমাদের ধোবি-খানার বাগানে থাকতো। একজন ছিল পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী, অপর জন ছিল তার আর্দ্দালী। আর্দ্দালীটার নাম ছিল ম্যারো।

“কর্ম্মচারীটি ছিল লম্বা, রোগা। তার শরীরের হাড়গুলো চামড়া-ফুটে বেরিয়ে থাকতো। সে মেয়েদের একটা ক্লোক গায়ে জড়িয়ে ঘুরে বেড়াতো। ক্লোকটার ঝুল ছিল তার হাঁটু অবধি। লোকটা ছিল খুব অমায়িক কিন্তু মাতাল। আমার মা গোপনে বীয়ার চোলাই করে তার কাছে বেচতেন। সে যখন মদ খেত তখন গান গাইতো। সে যখন আমাদের ভাষা শিখলো, তখন তার মত প্রকাশ করতে লাগলো। বলতো, তোমাদের দেশ শাদা নয়, কালো—খারাপ! তার ভাষায় ত্রুটি ছিল, কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারতাম; আর সে যা বলতো তা ঠিক। ভল্‌গার উজানে দুপাশের তীরভূমি দেখতে ভাল নয়, কিন্তু দক্ষিণ দিকের দেশগুলো অনেকটা গরম, আর কাস্যপীয় সমুদ্রের তীরে তুষার এক রকম দেখাই যায় না। একথা বিশ্বাস করা চলে। কেননা খ্রীষ্ট-সমাচারে, স্তবের বইয়ে আমার যতদূর মনে পড়ে

তুষার বা শীতের কথা নেই; আর যেখানে যীশুখ্রীষ্ট বাস করতেন সেখানেও এসব নেই···দেখ, স্তবের বই শেষ হলেই আমরা খ্রীষ্ট-সমাচার পড়বো।”

তিনি আবার নীরব হলেন, যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। এবং অন্যমনে তাকিয়ে রইলেন জানলার বাইরে। তাঁর মন চলে গেল বহুদূরে; চোখ দুটিকে দেখাতে লাগলো ছোট ও প্রখর।

“আরও গল্প বল।” কথাগুলো আমি বললাম, যেন আমি যে আছি তাঁকে তা নম্রভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে।

তিনি চমকে উঠে আবার শুরু করলেন: “আমরা ফরাসীদের গল্প বলছিলাম। যাই হোক, তারা আমাদেরই মতো মানুষ, আমাদের চেয়ে বেশি খারাপও নয় বা পাপীও নয়। কখন কখন তারা মাকে ‘ম্যাডাম! ম্যাডাম!’ বলে ডাকতো। কথাটা মেয়েদের সম্মান দেখাতে ফরাসীরা ব্যবহার করে। মা তাদের বস্তায় ময়দা দিতেন প্রায় দু’মণ করে। তাঁর গায়ে জোর ছিল অসাধারণ। মেয়েদের গায়ে তত জোর দেখা যায় না। আমার কুড়ি-বছর বয়সের আগে পর্য্যন্ত তিনি আমার চুলের মুঠি ধরে স্বচ্ছন্দে শূন্যে তুলতে পারতেন; সে বয়সেও আমার শরীরের ভার কম ছিল না। তা, এই আর্দ্দালি, ম্যারোঁটা, ঘোড়া ভালবাসতো। সে আস্তাবলে গিয়ে ইসারায় সহিসদের তাকে একটা ঘোড়া দিতে বলতো। প্রথমে এতে বড় গোলমাল হ’ত—ঝগড়া-বিবাদ বাধতো—শেষে চাষীরা তাকে ডাকতো ‘এই ম্যারোঁ।’ আর সেও হেসে, মাথা নেড়ে তাদের কাছে ছুটে যেত। তার মাথার চুলগুলো ছিল কটা, নাকটা বড়, ঠোঁট দুখানা পুরু। সে ঘোড়ার সম্বন্ধে যা-কিছু সবই জানতো; ভারী আশ্চর্য্য রকমে তাদের রোগ সারাতো। শেষে সে নিজ্‌নিতে হয়েছিল

ঘোড়ার ডাক্তার। কিন্তু লোকটা পাগল হয়ে যায়; একবার আগুন লাগলে তাতে মারা পড়ে। বসন্তকালের কাছাকাছি সেই কর্ম্মচারীটিরও শরীর একেবারে ভেঙে গেল। এবং বসন্তের গোড়ার দিকে একদিন, বাইরের দিক্‌কার ঘরের জান্‌লায় বসে মাথা নিচু করে ভাব্‌তে ভাব্‌তে সকলের অজানিতে মারা যায়।

"এই ভাবে তার জীবনের অবসান হয়। আমি তাতে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। এমন কি, গোপনে একটু কেঁদেছিলামও। লোকটা ছিল এমন শান্ত, নম্র। সে আমার কান টান্‌তে টান্‌তে তার মাতৃ-ভাষায় কথা বল্‌তো। আমি তার কথা বুঝতাম না, কিন্তু তার কথাগুলো শুনতে ভালোবাসতাম—মানুষের দয়া-ভালোবাসা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। সে আমাকে তার ভাষা শিখাতে আরম্ভ করেছিল; কিন্তু মা তাতে বারণ করেন। এমন কি তিনি আমাকে পাদ্রির কাছে পাঠিয়ে দেন। পাদ্রি আমাকে বেত্রাঘাতের বিধান দেন, আর নিজে কর্ম্মচারীটির কাছে যান নালিশ করতে। বাবা, সেকালে আমাদের ওপর খুব রূঢ় ব্যবহার করা হ'ত। তুমি তো এখনও সে-রকমের কিছুই ভোগ কর নি।...আমাকে যা ভোগ করতে হয়েছে তার কাছে কিছুই না, একথা ভুলো না!...আমার নিজের কথাই ধর...আমাকে এত সইতে হত—"

অন্ধকার হয়ে আস্‌তে লাগলো। গোধূলি-আলোকে দাদামশায় যেন বড় হয়ে উঠ্‌তে লাগলেন। তাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো বিড়ালের চোখের মতো। অন্যান্য বিষয়ে তিনি কথা বলতেন শান্ত ভাবে, সতর্ক হয়ে এবং চিন্তা করে, কিন্তু যখন নিজের সম্বন্ধে বলতেন তখন তাঁর কথাগুলো বার হত তাড়াতাড়ি; তাঁর গলার স্বর হত গাঢ় ও গর্ব্বভরা। তাঁর কথা শুন্‌তে আমার ভাল লাগ্‌তো না; আর

তিনি যে আমাকে ঘন ঘন আদেশ করতেন সেটাও আমার পছন্দ হ'ত না। বলতেন :

"এখন তোমাকে যা বল্‌ছি মনে রেখ! খবরদার! ভুলো না!"



তিনি আমাকে অনেক কিছুর কথাই বলতেন। সেগুলো মনে রাখবার ইচ্ছে আমার হতই না। কিন্তু যেগুলো তাঁর আদেশ ছাড়াই আমি আপনা হতেই মনে রাখতাম, সেগুলো আমার মনকে বিষণ্ণ করে তুলতো।

তিনি কখন অলীক গল্প বলতেন না; যে-ঘটনা সত্য ঘটেছিল তাই বল্‌তেন। লক্ষ্য করে ছিলাম, তাঁকে প্রশ্ন করা তিনি পছন্দ করতেন না। তাতে আমার জেদ বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করতাম :

"কারা ভাল—ফরাসীরা না রুযদেশের লোকেরা?"

তিনি রাগের সঙ্গে গর্জ্জন করে উঠতেন, "কেমন করে বল্‌বো? আমি তো কোন ফরাসীকে তাদের বাড়িতে দেখি নি।"

—"কিন্তু রুষরা কি ভাল?"

—"অনেক বিষয়ে ভাল; কিন্তু যে-সময়ে জমিদারী-শাসন ছিল সে-সময়ে আরও ভাল ছিল। এখন আমরা আছি গোলমালের মধ্যে। এখন লোকে খেতেই পায় না। এর জন্যে, অবশ্য, ভদ্র-লোকেরাই দায়ী। কারণ অন্যের চেয়ে ওদের বুদ্ধি বেশি। তারই জোরে ওরা চলে। কিন্তু ও কথা সকলের সম্বন্ধে বলা যায় না, মাত্র কয়েকজনের সম্বন্ধে বলা চলে। আর সকলে—তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ইঁদুরের মতো বোকা। ওদের তুমি যা কিছু দিতে চাও ওরা তাই নেবে। আমাদের মধ্যে খোসা আছে অনেক কিন্তু শাস নেই। কেবল খোসা, শাস ক্ষয় হয়ে গেছে। এই থেকে তুমি শিক্ষা পেতে

পার! আমাদের আগেই শিক্ষা পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা এখনও যথেষ্ট তীক্ষ্ণ হই নি।"

—"রুশদের গায়ে কি আর সকলের চেয়ে জোর বেশি?"

—"গায়ে জোর বেশি এমন লোক আমাদের মধ্যে কিছু আছে। কিন্তু গায়ের জোরই বড় কথা নয়, প্রধান হচ্ছে কৌশল। কেবল গায়ের জোরের কথাই যদি হয়, তাহলে ঘোড়া হচ্ছে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"



—"কিন্তু ফরাসীরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল কেন?"

—"দেখ, যুদ্ধ হচ্ছে সম্রাটের ব্যাপার। আমাদের তা বোঝার কথা নয়।"

—"বোনাপার্টি কেমন ধরনের লোক ছিলেন?" আমার এই প্রশ্নে দাদামশায় যেন অতীতের হিসাব করছেন এম্নি সুরে বললেন, "সে লোকটি ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে চেয়েছিল। তারপর চেয়েছিল আমাদের সকলকে সমান করতে—এমন অবস্থায় আন্‌তে যাতে শাসক বা প্রভু থাকবে না। প্রত্যেকেই হবে সমান। কোন শ্রেণী-বৈষম্য থাক্‌বে না, সকলে একই শাসনাধীনে থাক্‌বে, একই ধর্ম্ম পালন করবে, যার ফলে লোকের মধ্যে পার্থক্য হবে কেবল তাদের নামে। এ-সবের কোনো মানে হয় না। জগতে কেবল গল্‌দা চিংড়িগুলোকেই একটা থেকে আর একটাকে চেনা যায় না···কিন্তু মাছেদের মধ্যেও শ্রেণী-বৈষম্য আছে। এক জাতির মাছ আর এক জাতির মাছের সঙ্গে কখন মেশে না। আমাদের মধ্যেও বোনাপার্টি ছিল; কিন্তু তাদের কথা আর এক সময়ে বল্‌বো।"

কখন কখন তিনি বহুক্ষণ ধরে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তাঁর চোখ দুটো ঘুরতো, যেন তিনি আমাকে আগে কখন দেখেন নি।

এই ভাবটা আমার ভাল লাগতো না। কিন্তু তিনি কখন আমার কাছে আমার বাবা বা মায়ের কথা বলতেন না। এই সব কথা-বার্তার সময় দিদিমা মাঝে মাঝে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে কোণে গিয়ে বহুক্ষণ নীরবে, অলক্ষ্যে বসে থাকতেন। তারপর হঠাৎ সোহাগ-ভরা সুরে জিজ্ঞেস করতেন, "তোমার মনে পড়ে, বাবা, আমরা যখন মুরোনে তার্থে গিয়েছিলাম তখন কি চমৎকার লেগেছিল? সেটা যেন কোন্ সালে?"



চিন্তার পর দাদামশায় উত্তর দিতেন, "ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু কলেরা-মড়কের আগে। যে-বছর আমরা সেই জেল-পালানো কয়েদীদের বনের মধ্যে ধরি।"

—"ঠিক, ঠিক! তখনও আমরা তাদের ভয়ে সারা হচ্ছিলাম—"

—"ঠিক!"

জিজ্ঞেস করলাম, জেল-পালানো কয়েদী কি, আর তারা বনের মধ্যেই বা ঘুরে বেড়াচ্ছিল কেন? দাদামশায় যেন কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন,

"তারা হচ্ছে মানুষ। তাদের যে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল তা ফেলে, জেল থেকে পালিয়ে এসেছিল।"

—"তোমরা কি করে তাদের ধরেছিলে?"

—"কি করে ধরে ছিলাম? যেমন ছেলেরা লুকোচুরি খেলা করে! জন কতক পালায়, বাকি সকলে তাদের খুঁজতে খুঁজতে ধরে ফেলে। ধরার পর তাদের বেদম মার দেওয়া হয়েছিল; তাদের নাক গিয়েছিল থেঁৎলে। তারা যে কয়েদী এটি জানাবার জন্যে তাদের কপালে ছাপ দেওয়া হয়েছিল!"

—"কেন?"

—"আহা, প্রশ্নই তো ওই—যার উত্তর আমি দিতে পারি না।

কে অন্যায় করে—যে পালিয়ে যায় অথবা যে তার পিছনে ধাওয়া করে তাও একটি রহস্য!"

দিদিমা বললেন, "তোমার মনে পড়ে বাবা, সেই যে খুব বড় আগুন লেগেছিল, তারপর আমরা কি রকম করে—?"



সব কিছুর আগে দাদামশায় আলোচ্য বিষয়টিকে যথাযথ জান্‌তে চাইতেন, তাই কঠোর ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ বড় আগুন?"

এইভাবে দুজনে যখন অতীতের কথা বলতেন, তখন আমার কথা একেবারে ভুলে যেতেন। তাঁদের গলার স্বর, তাঁদের ভাষা এমন কোমল ও এমন সুসমঞ্জ হয়ে মিশে যেত যে মনে হত তাঁরা রোগ ও আগুনের, যাদের হত্যা করা হয়েছিল তাদের ও হঠাৎ মৃত্যুর, চতুর বদমায়েশ, ধর্ম্মোন্মাদ ও রূঢ় প্রকৃতির জমিদারদের বিষয় বিষাদ সঙ্গীত গাইছেন।

দাদামশায় অস্ফুট স্বরে বল্‌লেন, "কিসের মাঝ দিয়ে আমাদের জীবনের পথে চল্‌তে হয়েছে! আমরা কত দেখেছি!"

দিদিমা বললেন. "আমাদের সে রকম দুঃখের জীবন ছিল না, ছিল কি? মনে পড়ে, ভারিয়া জন্মাবার পর সেই বসন্তকালটা কি চমৎকার শুরু হয়েছিল?"

—"সেটা হল সেই হাঙ্গেরী অভিযানের বছরে. '৪৮ সালে। ভারিয়াকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা দেবার পরদিনই তারা ভারিয়ার ধর্ম্মপিতা টিখনকে তাড়িয়ে দেয়—"

—"তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না।" বলে দিদিমা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন।

—"হাঁ, আর সেই সময় থেকে হাঁসের পিঠে জলের মতো আমাদের

বাড়ি থেকে ভগবানের আশীর্ব্বাদও যেন সরে গেছে। এই ধর যেমন ভাববারা—”

—“আচ্ছা, বাবা, হয়েছে।”

দাদামশায় ভ্রূকুটি করে রুষ্টভাবে জিজ্ঞেস করলেন, “তার মানে কি —‘আচ্ছা হয়েছে?’ তুমি যে-ভাবেই ওদের দিকে দেখ, আমাদের ছেলেমেয়েরা খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের যৌবনের তেজ-শক্তির কি হল! আমরা মনে করেছিলাম, আমাদের সন্তানের মধ্যে তা সঞ্চয় করছি, যেমন লোকে ঝুড়িতে করে কোন কিছু তুলে রাখে। এখন দেখ, ভগবান সেটাকে ধাধাঁয় রূপান্তরিত করেছেন। ওটার কোন উত্তর নেই!”

যেন আগুনে পুড়ে তাঁর অসুখ করেছে এমনি ভাব দেখিয়ে আর্ত্তনাদ করতে করতে দাদামশায় সারা ঘরে ছুটে বেড়াতে লাগলেন · তারপর দিদিমার দিকে ফিরে তাঁর ছোট, শুকনো ঘুষিটি ঝাঁকিয়ে ছেলে-মেয়েকে গাল দিতে লাগলেন।

“এ সব তোরই দোষ বুড়ী। তাদের কথায় সায় দিস্, তাদের পক্ষ নিস্।”

কিন্তু তাঁর দুঃখ ও উত্তেজনার পরিসমাপ্তি হল কান্নায়। তিনি ইকনটার সামনে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে তাঁর শূন্য বুকখানা জোরে চাপড়াতে চাপড়াতে বল্‌তে লাগলেন, “ভগবান, আমি কি আর সকলের চেয়ে বেশি পাপ করেছি? কেন তবে—?”

তাঁর আপাদ মস্তক কাঁপতে লাগলো, অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি ক্রোধে ও বিদ্বেষে ঝক্ ঝক্ করে উঠ্‌লো।

দিদিমা কোণে অন্ধকারে চুপ করে বসে ছিলেন; খুব সাবধানে তাঁর কাছে উঠে গিয়ে বললেন, “তুমি এমন দুঃখ করছো কেন?

ভগবানই জানেন তিনি কি করছেন। তুমি বল, অন্যের ছেলেরা আমাদের ছেলেদের চেয়ে ভাল, কিন্তু আমি তোমাকে বল্‌ছি, বাবা, এ রকম তুমি সব জায়গায় দেখ্‌তে পাবে—ঝগড়া, গোলমাল, মারামারি। সব বাপ-মাই চোখের জলে তাদের পাপ ধুয়ে ফেলে। এ বিষয়ে কেবল একা তুমিই নও।"

কখন কখন এই সব কথা তাঁকে শান্ত করতো। তিনি শোবার বন্দোবস্ত করতেন। তখন দিদিমা আর আমি চুপি চুপি উঠে যেতাম চিলে কোঠায়।

কিন্তু একবার দিদিমা সান্ত্বনা দেবার জন্যে তাঁর কাছে যেতেই তিনি চট্‌ করে রুখে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখে জোরে মারলেন এক ঘুষি।

দিদিমা ঘুরে গিয়ে প্রায় টলে পড়বার মতো হলেন। কিন্তু কোন রকমে টাল সাম্‌লে, ঠোঁটে হাত দিয়ে শান্তভাবে বললেন, "বোকা!"

তারপর দাদামশায়ের পায়ের কাছে রক্তভরা থুথু ফেল্‌লেন। কিন্তু দাদামশায় দুটি দীর্ঘ হুঙ্কার ছেড়ে দুহাত তুলে তাঁকে মারতে গেলেন, "চলে যাও। নাহলে খুন করে ফেলবো।"

দিদিমা ঘর থেকে যেতে যেতে আবার বললেন, "বোকা।"

দাদামশায় তাকে তাড়া করে গেলেন, কিন্তু দিদিমা তাড়াতাড়ি দরজা পার হয়ে তাঁর মুখের সামনে ধম করে, দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

দাদামশায় বলে উঠ্‌লেন, "মরকট বুড়ী!"

তাঁর মুখখানি হয়ে গেল নীল। তিনি চৌকাঠ ধরে রাগে সেটা আঁচড়াতে লাগ্‌লেন।

আমি মরার মতো কাউচের ওপর বসে রইলাম; নিজের চোখ দুটোকে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমার সামনে সেই প্রথম

তিনি দিদিমাকে মারলেন। তাঁর চরিত্রের এই নতুন দিকটির পরিচয় পেয়ে আমি বিরক্তি ও ঘৃণায় অভিভূত হয়ে গেলাম। সেটা আমার কাছে বোধ হল অমার্জ্জনীয়। বোধ হতে লাগ্‌লো যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তিনি যেখানে ছিলেন সেইখানেই, চৌকাঠের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখখানি পাংশু ও কুঞ্চিত হয়ে আসতে লাগলো যেন ছাইয়ে ঢেকে যাচ্ছে।



হঠাৎ তিনি ঘরের মাঝখানে সরে এসে হাঁটু গেড়ে বসে, সামনের দিকে ঝুঁকে মেঝেয় হাত দুখানা রাখলেন। কিন্তু তারপরই খাড়া হয়ে বুক চাপড়ে বললেন, "হে ভগবান—"

আমি ষ্টোভ-কাউচের তপ্ত টালিগুলোর ওপর থেকে নিঃশব্দে নেমে যেন বরফের ওপর দিয়ে ছাটছি এম্নি ভাবে যত সাবধানে পারি ঘর থেকে চুপে চুপে বেরিয়ে গেলাম। ওপর তলায় দিদিমাকে দেখতে পেলাম। তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে মাঝে মাঝে কুলকুচো করছেন!

—"তোমার কি লেগেছে?"

তিনি ঘরের কোণে গিয়ে মুখ-ধোবার পাত্রে খানিকটা জল মুখ থেকে ফেলে শান্ত ভাবে বললেন, "ব্যস্ত হবার মতো কিছু নয়। দাঁতগুলো ঠিক আছে; আমার ঠোঁট দুখানা ছড়ে গেছে।"

—"উনি কেন এমন করলেন?"

জানলার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "ওঁর মেজাজ বিগড়ে যায়। বুড়ো বয়সে এসব ওঁর পক্ষে সওয়া কঠিন। সব যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তুমি এখন শুয়ে ভগবানের স্তব করো। ঐ সম্বন্ধে আর ভেব না।"

আমি তাঁকে আরও প্রশ্ন শুরু করলাম, কিন্তু তিনি কঠোরতার

সঙ্গে, যা তাঁর চরিত্রে সচরাচর দেখা যেত না, বলে উঠ্‌লেন, "তোমাকে কি বল্‌লাম? এখনই শোও গে! এরকম অবাধ্যতার কথা আমি কখন শুনিও নি!"



তিনি জান্‌লায় বসে ঠোঁট চুষতে চুষতে রুমালে ঘন ঘন থুথ্‌ ফেল্‌তে লাগলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে পোশাক ছাড়তে লাগলাম। নীল, চৌকো জানলাটার ভেতর দিয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম, তার মাথার ওপর তারাগুলো ঝলমল করছে। পথে কোন সাড়া-শব্দ নেই; ঘর অন্ধকার। আমি বিছানায় শুলে তিনি নিঃশব্দে আমার কাছে এসে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "ঘুমোও! আমি নিচে ওঁর কাছে যাবো। আমার জন্যে ভেব না, মানিক। আমারই দোষ, বুঝলে। এখন ঘুমোও!"

তিনি আমাকে চুম্বন করে চলে গেলেন। কিন্তু এক গভীর বিষাদ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌লো। আমি সেই প্রশস্ত, কোমল, উষ্ণ শয্যা থেকে এক লাফে নেমে জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে শূন্য পথটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। দুঃখে আমাকে অসাড় কোরে ফেল্‌লো।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

দাদামশায়ের ভগবান একজন এবং দিদিমার ভগবান যে আর একজন এ সত্যটা ধরতে আমার বেশি দিন লাগ্‌লো না। এই পার্থক্যটিকে এমন ঘন ঘন আমার চোখের সামনে উপস্থিত করা হ'ত যে, তা না দেখে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দিদিমা কখন কখন ভোরে উঠে, অনেকক্ষণ বিছানায় বসে তাঁর আশ্চর্য্য চুলগুলি আঁচড়াতেন। তিনি চুলগুলো আঁচড়াতেন আর

যাতে আমার ঘুম না ভাঙে এম্নি ভাবে ফিস্ ফিস্ করে বল্‌তেন, "আঃ ! সব জড়িয়ে যাচ্ছে !"

চুলগুলো আঁচড়ানো হলে তা দিয়ে একটি মোটা বেণী রচনা করতেন। এবং তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে ফেলতেন। তাঁর প্রকাণ্ড মুখখানি থেকে ঘুমের কুঞ্চিত রেখাগুলিও মিলাতো না। তারপর ইকনের সামনে গিয়ে বসতেন। তখন তাঁর সত্যকারের প্রাতঃশুচি-স্নান শুরু হ'ত। তার ফলে তাঁর সারা অন্তর স্নিগ্ধ, নির্মল হয়ে উঠ্‌তো।

তাঁর কুব্জ পৃষ্ঠটিকে সবল করে, মাথাটি তুলে. 'আমাদের কাজানের দেবীর' গোলাকার মুখখানির দিকে তাকিয়ে ভক্তিভরে অনুচ্চ-কণ্ঠে বলে উঠতেন, "মহিময়ি দেবি ! মা, আজ আমাকে বরাভয় দাও !"

তারপর মনের আবেগে স্তব গান করতেন। প্রত্যহ প্রত্যূষে তিনি নতুন শব্দে দেবীকে ভক্তি জানাতেন। তাঁর বন্দনা গান তাঁর প্রার্থনাগুলো আমি অসাধারণ মনোযোগে শুনতাম।

তিনি বলতেন··· "ও আমার আশ্রয়, আমার শক্তি। সোনার আলো ! ···আমাকে লোভ থেকে রক্ষা কর ; আমাকে এমন কর যেন আমি কারো কোন ক্ষতি করতে না পারি। লোকে না ভেবেই আমার প্রতি যে-আচরণ করবে তাতে যেন অসন্তুষ্ট না হই।"

তাঁর প্রার্থনায় কোন বাঁধাবুলি ছিল না। তাঁর প্রার্থনা ছিল আন্তরিক স্তুতিবাক্য ভরা, সরল।

সকালে তিনি বেশিক্ষণ প্রার্থনা করতেন না। কারণ তাঁকে স্তামোভারে আগুন দিতে হত। দাদামশায় কোন পরিচারিকা রাখতেন না। যদি ঠিক সময়ে চা তৈরী না হ'ত তাহলে তিনি দিদিমাকে অনেকক্ষণ ধরে ভয়ানক গাল দিতেন।

কখন কখন তিনি দিদিমার আগে ঘুম থেকে উঠে চিলেকোঠায় আসতেন। তাঁকে প্রার্থনা নিরতা দেখে কালো ঠোঁট দুখানা অবজ্ঞায় পাকিয়ে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে শুনতেন। তারপর চা খেতে খেতে গজ্জন করে উঠতেন, "এই বোকা, কি করে প্রার্থনা করতে হয় কতবার তোকে শিখিয়েছি। কিন্তু তুই যা-তা বলিস্, বিধর্মী কোথাকার! আমি বুঝতে পারি না ভগবান তোর কাছে থাকেন কি করে।"



দিদিমা স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিতেন, "আমরা যা না বলি তিনি তা বুঝতে পারেন। তিনি প্রত্যেকের অন্তর দেখেন।"

—"এই নিরেট পাপী! হুঃ!"

দিদিমার ভগবান দিদিমার সঙ্গে সারাদিন থাকতেন। দিদিমা জন্তু-জানোয়ারদের কাছেও তাঁর কথা বলতেন। এই ভগবান স্বেচ্ছায় নিজেকে সকল প্রাণীর বশ করে ছিলেন—মানুষের, কুকুরের, মৌমাছির, এমন কি প্রান্তরের তৃণদলেরও তিনি বশ ছিলেন। পক্ষপাতহীন হয়ে সকলের প্রতি ছিলেন সদয়; পৃথিবীর প্রত্যেকেই তাঁর কাছে যেতে পারতো।

একবার শুঁড়িখানার মালিকের স্ত্রীর পোষা বিড়ালটি বাগানে একটি ষ্টারলিং পাখী ধরে ছিল। বিড়ালটা ছিল চালাক, সুন্দর, আর লোকের গা-ঘেঁষা। তার গায়ের রঙ ছিল ধূসর, চোখ দুটো সোনালি। দিদিমা অবসন্নপ্রায় পাখীটিকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বিড়ালটাকে শাস্তি দিলেন; আর সেই সঙ্গে বললেন, "এই হিংসুটে হতভাগা, তোর ভগবানের ভয় নেই?"

শুঁড়িখানাওয়ালার স্ত্রী ও দ্বারোয়ানটা তাঁর কথা শুনে হাসতে লাগ্‌লো, কিন্তু তিনি রাগের সঙ্গে তাদের বললেন, "তোমরা কি মনে

করো, জন্তু-জানোয়ার ভগবানের কথা কিছু বোঝে না ? ওরে নিষ্ঠুরের দল, সমস্ত প্রাণী ভগবানের বিষয় তোদের চেয়ে বোঝে বেশি।”



শারাপোটা মোটা ও স্ফূর্তিহীন হয়ে পড়েছিল। তিনি তার গায়ে সাজ পরাবার সময় বলতেন, “আরে ভগবানের দাস, তোকে এমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন ? কেন বল্ তো ? ব্যাপারটা হচ্ছে, তুমি বাছা বুড়ো হয়ে যাচ্ছ।”

ঘোড়াটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌তো আর মাথা দোলাতো।

অথচ দাদামশায় যত ঘন ঘন ভগবানের নাম করতেন তিনি তা করতেন না। তাঁর ভগবানকে আমি বেশ বুঝতে পারতাম। আমি জানতাম, সেই ভগবানের সামনে আমি কখন মিথ্যা কথা বলবো না। তাতে আমার লজ্জিত হওয়া উচিত। তাঁর চিন্তায় আমার মনে এমন এক দুর্জ্জয় লজ্জার ভাব জাগ্‌তো যে, দিদিমার কাছে আমি কখন মিথ্যা কথা বলি নি। এই সদগুণময় ভগবানের কাছ থেকে কিছু গোপন রাখা ছিল একেবারে অসম্ভব ; প্রকৃতপক্ষে আমার তা করবার ইচ্ছাও ছিল না।

একদিন শুঁড়িখানাওয়ালার স্ত্রী দাদামশায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে, তাঁকে ও দিদিমাকেও গাল দেয়। দিদিমা কিন্তু ঝগড়ার মধ্যে ছিলেন না। তা সত্ত্বেও সে তাঁকে কটু ভাষায় গাল দেয় ; এমন কি, তাঁকে একটা গাজর ছুড়েও মারে।

দিদিমা খুব শান্তভাবে বলেন, “দেখ বাপু ভাল মানুষটি, তুমি বোকা।” কিন্তু অপমানটা আমি খুব তীক্ষ্ণ ভাবে অনুভব করি এবং সেই হিংসুটে মানুষটার ওপর প্রতিশোধ নিতে মনস্থ করি।

স্ত্রীলোকটির মাথার চুলগুলো ছিল কাটা, শরীরটা ছিল মোটা, চিবুক ছিল দুটো, চোখ বলতে কিছুই ছিল না। সব চেয়ে ভাল কোন্

উপায়ে তাকে শাস্তি দেওয়া যায়, সে বিষয়ে মন স্থির করতে আমার অনেক সময় লাগলো। যে-সব পরিবার এক সঙ্গে বাস করে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের আমার এই অভিজ্ঞতা হয়ে ছিল যে, তারা পরস্পরের বিড়ালের লেজ কেটে দিয়ে, তার কুকুরকে তাড়া করে, তার মোরগ-মুরগীকে মেরে ফেলে, রাতের বেলা গোপনে তার চোরা-কুঠরিতে ঢুকে টবে যে-সব বাঁধাকপি ও শসা থাকে সেগুলোর ওপর কেরোসিন ঢেলে, তার পিপে ছেঁদা করে সব ঘোল বার করে দিয়ে প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। কিন্তু এ ধরনেব কিছুই আমার মনোমত হল না। আমি চাইলাম এসবের চেয়ে স্বল্প অমার্জ্জিত ও আরও ভয়ঙ্কর কিছু।

অবশেষে আমার মাথায় এক মতলব এল। আমি শুঁড়িখানাওয়ালার স্ত্রীব অপেক্ষায় ওৎ পেতে রইলাম। সে যেমি মাটির নিচে চোরা-কুঠরিতে নেমে গেল, আমি অম্নি তার ছোট দরজাটা বন্ধ করে তাতে চাবি দিয়ে, দরজাটার ওপর বার কয়েক নেচে, চাবিটা ছাদের ওপর ছুড়ে ফেলে রান্না-ঘরে যেখানে দিদিমা রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন ছুটে গেলাম সেখানে। আমার এমন খুশি হবার কারণ কি, তিনি প্রথমে বুঝতে পারলেন না; কিন্তু যখন ব্যাপারটা বুঝলেন, তখন আমার পিছনে মারলেন এক চড় এবং আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন আঙিনায়। তারপর আমাকে ছাদে পাঠিয়ে দিলেন চাবিটা খুঁজে আনতে। আমি কুণ্ঠার সঙ্গে চাবিটা তাঁকে দিলাম। তাঁর সেটা চাওয়াতে আশ্চর্য্যও হয়ে গেলাম। শেষে ছুটে পালিয়ে গেলাম আঙিনার এক কোণে। সেখান থেকে দেখতে লাগলাম, তিনি কেমন করে বন্দিনীকে মুক্তি দিলেন এবং কেমন করে দুজনে বন্ধুর মতো হাসতে হাসতে আঙিনা পার হয়ে চললেন।

শুঁড়িখানাওয়ালার স্ত্রী তার মোটা ঘুষিটা ঝাঁকিয়ে আমাকে শাসিয়ে বললে, “এর ফল তোমাকে দেব!” কিন্তু সেই সঙ্গে ফুটে উঠলো তার চক্ষুহীন মুখে স্নিগ্ধ হাসি।

দিদিমা আমার কলার ধরে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন রান্না-ঘরে; জিজ্ঞেস করলেন, “এমন কাজ কেন করলে?”

—“ও তোমাকে গাজর ছুঁড়ে মেরেছিল বলে।”

—“তার মানে তুমি কাজটা করেছিলে আমার জন্যে? বেশ! তোমার জন্যে আমি এই করবো—তোমাকে চাবুক-পেটা করে উনুনের তলায় ইঁদুরগুলোর সঙ্গে রেখে দেব। দাদামশায়কে যদি বলি, তাহলে তোমার চামড়া তুলে দেবেন। ওপরে গিয়ে পড়া তৈরি কর।”

তার পর থেকে সমস্ত দিন আমার সঙ্গে তিনি আর কথা বললেন না। কিন্তু সেই রাতেই উপাসনা করবার আগে বিছানায় বসে এই স্মরণীয় কথাগুলি এমন সুরে বললেন যে, মনে গেঁথে গেল:

“লেংকা, মানিক আমার, বড়দের কাজকর্ম থেকে তুমি দূরে থাকবে। বড়দের মাথায় দায়িত্ব আছে। তার জন্যে তাদের ভগবানের কাছে জবাবদিহি করতে হবে; কিন্তু তোমার এখন তা নেই। তুমি শিশুর মন নিয়ে থাক। যে-অবধি না ভগবান তোমার হৃদয়-মন অধিকার করেন, কি কাজ তোমাকে করতে হবে, কোন্ পথে চল্‌তে হবে এ-সব না জান সে-অবধি অপেক্ষা কর। বুঝলে? কোন্ ব্যাপারে কার দোষ সেটা ঠিক করা তোমার কাজ নয়। ভগবান বিচার করেন, শাস্তি দেন। সেটা তাঁরই কাজ আম'দের নয়।”

তিনি যতক্ষণ নস্য নিলেন ততক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ডান চোখটা বন্ধ করে আবার বল্‌লেন, “স্বয়ং ভগবানই সব সময়ে জানেন না কার দোষ।”

আমি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তিনি কি সব-কিছু জানেন না?"



—"তিনি যদি সবই জানতেন, তাহলে যা ঘটছে তার অনেক কিছুই হ'ত না। ব্যাপারটা এই রকম। যেন তিনি, সকলের পিতা, পৃথিবীর সব কিছু স্বর্গ থেকে দেখছেন। দেখছেন আমরা কিরকম কাঁদছি, দুঃখে গুমরে মরছি। তা দেখে বলছেন, 'আহা আমার বাছারা, আমার সোনার বাছারা, তোমাদের জন্যে আমি দুঃখিত!' "



কথাগুলি বল্‌তে বল্‌তে তিনি নিজেও কাঁদছিলেন। এবং গাল দুখানি মুছে ঘরের কোণে গেলেন প্রার্থনা করতে।

সেই সময় থেকে তাঁর ভগবান এলেন আমার কাছে আরও সরে এবং হয়ে উঠ্‌লেন আরও সহজবোধ্য।

দাদামশায়ও আমাকে শিক্ষা দেবার সময় বলেছিলেন, ভগবান হচ্ছেন—সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, লোকের সকল কাজে সহায়। কিন্তু তিনি দিদিমার মতো প্রার্থনা করতেন না। প্রত্যহ সকালে, বিগ্রহের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার আগে, তিনি অনেকক্ষণ ধরে গাত্রমার্জ্জনাদি করতেন। তারপর রীতিমতো পোশাক পরে, তাঁর কটা চুলগুলো আঁচড়াতেন, দাড়িগুলো বুরুষ দিয়ে সমান করতেন। এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতেন, গায়ের শার্ট ইত্যাদি ঠিক মতো বসেছে কি না। তারপর সাবধানে, পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়াতেন বিগ্রহটির সামনে। ঘরখানার মেঝেটা ছিল কাঠের তক্তা দিয়ে নক্সার মতো তৈরী। তিনি প্রত্যহ একখানি তক্তার ওপরেই গিয়ে দাঁড়াতেন। তাঁর চোখে তখন এমন ভাব ফুটে উঠ্‌তো যে, চোখ দুটোকে ঘোড়ার চোখের মতো দেখাতো। তিনি মাথা নিচু

করে, হাত দুখানি সৈনিকের মতো দুপাশে সোজা ঝুলিয়ে মিনিট খানেক নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর খাড়া ও পেরেকের মতো সরু হয়ে গম্ভীর স্বরে আরম্ভ করতেন।

তাঁর প্রথম কথাগুলির পরই আমার মনে হ'ত ঘরখানা যেন অসম্ভব নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। মাছিগুলো অবধি খুব সাবধানে গুন্ গুন্ করছে।...

তিনি প্রার্থনা করতেন, যেন পড়া মুখস্থ করছেন, এমন ভাবে। তখন তাঁর গলার স্বর হয়ে উঠতো স্পষ্ট ও উদাত্ত। তিনি কেবল বাঁধা বুলি আওড়াতেন। তাঁর ডান পাখানা দুল্‌তো যেন প্রার্থনার সঙ্গে তিনি তাল রাখছেন। তাঁর সারা দেহ, বিগ্রহটির দিকে এগিয়ে যেত। মনে হত তিনি যেন আরও লম্বা, আরও রোগা ও আরও শুষ্ক হয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন এমন পরিষ্কার, এমন পরিপাটি আর এমন জেদী।

প্রার্থনা করতে করতে তাঁর চোখে জল আসতো। গলার স্বর তখন হ'ত সরু ও চেরা। পরে আমি যখন য়িহুদিদের একটি ভজনালয়ে একবার ঢুকি, তখন বুঝতে পারি দাদামশায় প্রার্থনা করেন য়িহুদিদের মতো।

ততক্ষণে স্যামোভারটা টেবিলের ওপর সোঁ সোঁ করতো। ঘরে ভেসে বেড়াতো কেকের টাটকা গন্ধ। দিদিমা মেঝের দিকে তাকিয়ে ঘরে পায়চারি করতেন। জানলা দিয়ে ঘরে বাগান থেকে আনন্দে রোদ এসে পড়তো, গাছের পাতায় মুক্তোর মতো শিশির ঝল্‌মল্ করতো; প্রভাত-সমীর কোথাকার কুরানট্ ঝোপের ও গাছের ডালে পাকা আপেলের গন্ধে চমৎকার সুরভিত হয়ে উঠ্‌তো কিন্তু দাদামশায় সমানে প্রার্থনা করতেন—কাঁপতেন, চীৎকার করতেন।

"আমার মাঝে কামনার শিখা নিবিয়ে দাও। কারণ আমি ক্লিষ্ট, অভিশপ্ত।"



সমস্ত প্রভাত-বন্দনাটি আমার মুখস্থ ছিল; এমন কি আমি স্বপ্নেও বলতে পারতাম কার পর কি। আমি প্রগাঢ় কৌতুকে তাঁর প্রার্থনা শুনতাম, যদি তিনি কোন ভুল করেন বা কোন কথা ছেড়ে যান। এমনটা অতি কদাচিৎ ঘটতো। ঘটলে আমার মনে বিদ্বেষভরা খুশি জেগে উঠতো। তখন তাঁকে বলতাম, "আজ সকালে তুমি একটা কথা বাদ দিয়েছিলে।"



দাদামশায় বিশ্বাস করতেন না, অস্থিরভাবে বলতেন, "বাস্তবিকই নয়?"

—"হাঁ। তোমার বলা উচিত ছিল 'আমার এই বিশ্বাসই হয়ে আছে প্রধান'। তুমি 'হয়ে আছে' বল নি।"

তিনি বিচলিত হয়ে চোখ দুটো মিটমিট করে বল্‌তেন, "দেখ!"

তাকে ভুলটা দেখিয়ে দেবার জন্যে পরে তিনি আমার ওপর নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিতেন। কিন্তু তিনি কতটা বিচলিত হয়েছেন তা দেখে জয়ের আনন্দ উপভোগ করতাম।

একদিন দিদিমা তাঁকে পরিহাস করে বললেন, "তোমার প্রার্থনা শুন্‌তে শুন্‌তে ভগবান নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তুমি একই কথা বার বার বলা ছাড়া আর কিছুই তো কর না।"

তিনি টেনে টেনে বললেন, "কি? কিসের দোষ ধরছো?"

—"তুমি ভগবানকে তোমার অন্তরের একটি কথাও বল না, যতদূর আমি শুন্‌তে পাই।"

দাদামশায়ের মুখখানা নীল হয়ে গেল। তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে করাত দিয়ে কাঠ চেরার মতো

ঘস্ ঘস্ শব্দ করতে করতে তাঁর মাথায় একখানি ডিশ ছুড়ে মারলেন।

—"এই মড়াখেকো বুড়ী।"



তিনি যখন ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তার কথা বলতেন তখন তাঁর নিষ্ঠুরতার ওপরেই জোর দিতেন বেশি। "মানুষ পাপ করলে, প্লাবনে সব ভেসে গেল। আবার পাপ করলে, তার নগরগুলো সব আগুনে গেল ধ্বংস হয়ে। তারপর ভগবান মানুষকে শাস্তি দিলেন দুর্ভিক্ষ ও রোগে। এখনও তিনি সারা পৃথিবীর ওপর খড়্গ তুলে আছেন—তিনি হচ্ছেন পাপীর দণ্ডদাতা। যারা স্বেচ্ছায় ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করেছে দুঃখ আর সর্ব্বনাশে ভগবান তাদের শাস্তি দেবেন।" টেবিলের ওপর ঘা দিয়ে কথাগুলোর ওপর তিনি জোর দিতেন।

ভগবানের নিষ্ঠুরতা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা ছিল কঠিন। আমার সন্দেহ হত, দাদামশায় উদ্দেশ্য নিয়ে এ-সব করতেন। বলতেন ভগবানের ওপর আমার ভক্তি জাগাবার জন্যে নয়, ভয় জাগাবার জন্যে। তাই আমি তাঁকে সরল ভাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "যাতে তোমার বাধ্য হই সেজন্য কি এ-সব বলছো?"

তিনিও সমান সরলতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, "হয়তো তাই। তুমি কি আবার আমার অবাধ্য হতে চাও?"

—"তাহলে দিদিমা যা বলেন তার কি হবে?"

তিনি আমাকে কঠোর ভৎর্সনা করলেন। "ঐ বোকা বুড়ীটার কথা বিশ্বাস করো না। ওর সেই যৌবনকাল থেকেই ও হচ্ছে বোকা, মূর্খ, অবিবেচক। ওকে বলবো ও যেন তোমার সঙ্গে এই গুরুতর বিষয়ে কথা বলতে স্পর্দ্ধা না করে। এখন বল দেখি—দেবদূতের কতগুলি দল আছে?"

তাঁর কথার আবশ্যক উত্তরটি দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তারা কি সব যৌথ-কারবারী ?"

তিনি হেসে চোখ দুটো ঢেকে ঠোঁট কামড়ে বলেন, "এই বোকা ভগবানের সঙ্গে যৌথ-কারবারীর কি সম্পর্ক?...ও গুলো হচ্ছে এই পৃথিবীর...এগুলোর প্রতিষ্ঠা হয় আইনকে ফাঁকি দেবার জন্যে।"

—"আইন কি ?"

—"আইন?" বৃদ্ধ খুশীমনে সাবধানে আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর বুদ্ধিমাখা চোখ দুটি চক্ চক্ করতে লাগলো। "আইন প্রথা থেকে নেওয়া হয়। লোকে একত্র বাস করতে করতে তাদের মধ্যে ঠিক করে নেয়, এইসব হচ্ছে আমাদের কাজের সব চেয়ে ভাল পথ। আমরা এ গুলোকে প্রথা—আইন তৈরি করে নেব। পরিশেষে তা আইন হয়ে দাঁড়ায়। যেমন খেলবার আগে ছেলেরা তাদের মধ্যে ঠিক করে নেয় কেমন করে খেলাটা খেলতে হবে, কোন্ কোন্ নিয়ম মানতে হবে। ঠিক এই রকম করেই আইন গড়ে ওঠে।"

—"যৌথ-কারবারীর সঙ্গে আইনের কি সম্পর্ক ?"

—"ওরা সব হচ্ছে বেহায়া ধরনের লোক ; আইন ভাঙে।"

—"কেন ?"

তিনি ভ্রূ কুঁচকে উত্তর দিলেন, "তুমি তা বুঝ্বে না।" কিন্তু পরে যেন বুঝিয়ে দিচ্ছেন এম্নিভাবে বলেন, "মানুষের সকল কাজই ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে। মানুষ চায় এক, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন আর। মানুষের প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হয় না। ভগবান মানুষের ওপর ফুঁ দেন, আর তারা ধুলো আর ছাইয়ের মতো উড়ে যায়।"...

কিন্তু দাদামশায় ভগবানকে সকল কিছুর ওপর স্থান দিলেও

তাঁকে ভয় করা আবশ্যক হলেও সকল ব্যাপারেই তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতেন।

দিদিমার সাধু-মহাত্মাগণের স্বভাব ছিল মানুষের মতো, করুণা ও সমবেদনায় ভরা। তাঁরা গ্রামে, নগরে ঘুরে বেড়াতেন। লোকের জীবনের ভাগ নিতেন, তাদের কাজ-কর্ম পরিচালিত করতেন। কিন্তু দাদামশায়ের সাধু-মহাত্মাগণ ছিলেন সকলেই পুরুষ। তাঁরা বিগ্রহ বা যে-সব রোমক-সম্রাটকে দেবতাজ্ঞানে লোকে পূজো করতো তাদের মূর্তি ফেলে দিতেন। মূর্তি পূজো করবার জন্যে তাঁদের যন্ত্রণা দিয়ে বা জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত অথবা তাঁদের গা থেকে চামড়া তুলে নেওয়া হত।



কখন কখন দাদামশায় নিজের মনেই বল্‌তেন, “ভগবান যদি আমাকে সামান্য লাভেও বাড়িখানা বেচ্‌তে সাহায্য করেন। তাহলে আমি ঘটা করে সেণ্ট নিকোলাসের পূজো দেব।”

কিন্তু দিদিমা আমাকে সহাস্যে বল্‌তেন, “ঠিক ঐ বোকা বুড়োটার মতোই কথা! ওকি মনে করে, সেণ্ট নিকোলাস ওর বাড়িখানা বিক্রির জন্যে মাথা ঘামাবেন? আমাদের পিতা নিকোলাসের ওর চেয়ে ভাল কিছু করবার নেই কি?”

আমার কাছে বহু বৎসর একখানি গির্জ্জা-ক্যালেণ্ডার রেখে ছিলাম। ক্যালেনডারখানা দাদামশায়ের। তিনি স্বহস্তে তাতে কতকগুলি কথা লিখে রেখেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে খুব খাড়া অক্ষরে লাল কালিতে লেখা ছিল—“আমার রক্ষাকর্ত্তা যাঁরা বিপদ বারণ করেছেন।”

কথাগুলো তিনি লিখেছিলেন, যে-তারিখে জোয়াকিম ও অ্যানির উৎসব ঠিক তার তলায়।

দাদামশায়ের ছেলেদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যেত না। তাদের প্রতিপালনের জন্যে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। সংসার চালাবার উদ্দেশ্যে তিনি তেজারতি আরম্ভ করেন এবং গোপনে লোকের জিনিষপত্র বাঁধা রাখতেন। একজন তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশে খবর দেয়। এক রাত্রে পুলিশ তাঁর বাড়ি তল্লাস করতে আসে। খুব গোলমাল হয়; কিন্তু পরিশেষে ভাল ভাবেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে। দাদামশায় প্রতিদিন সূর্যোদয় অবধি প্রার্থনা করেন। এবং জলযোগের আগে আমার সামনে ঐ কথাগুলি লিখে রাখেন।

সন্ধ্যায় খাবার আগে তিনি আমার সঙ্গে স্তোত্র ও প্রাত্যহিক বন্দনার বই পড়তেন। কিন্তু খাবার পরই আবার প্রার্থনা আরম্ভ করতেন।

কিন্তু দিদিমা প্রায়ই বলতেন, "আমি ভীষণ ক্লান্ত! প্রার্থনা না করেই শুতে যাব।"

দাদামশায় আমাকে সঙ্গে করে গির্জায় নিয়ে যেতেন। কিন্তু সেখানেও আমি পার্থক্য ধরতে পারতাম, কোন্ ভগবানকে আবাহন করা হচ্ছে। পাদ্রি বা ডিকন যা আবৃত্তি করতেন—তা দাদামশায়ের ভগবানের উদ্দেশ্যে, আর প্রার্থনা-সঙ্গীত হ'ত দিদিমার ভগবানকে লক্ষ্য করে।

সে-সময়ে আমার মনের প্রধান খাদ্য ছিল ভগবৎ চিন্তা ও ভাব। আর সেগুলিই ছিল আমার জীবনের সব চেয়ে সুন্দর। সেগুলি ছাড়া আর সমস্ত কিছুর ছাপই নিষ্ঠুরতায় ও মালিন্যে আমার অন্তরকে বিরক্তিতে ভরে তুলে আমার মধ্যে বিতৃষ্ণার ও হিংস্রতার ভাব জাগিয়ে তুলতো। আমার চারধারে যারা বাস করতো তাদের মধ্যে ভগবানই ছিলেন সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সব চেয়ে উজ্জ্বল। তিনি ছিলেন দিদিমার

ভগবান, সকল সৃষ্ট জীবের বন্ধু। সেই জন্যে "দাদামশায় কেন মঙ্গলময় ভগবানকে দেখতে পান না" এই প্রশ্নে স্বভাবতই আমি বিচলিত হতাম।

আমাকে রাস্তায় ছুটোছুটি করতে দেওয়া হত না। কারণ তাতে উত্তেজিত হয়ে উঠতাম। যা-কিছু দেখতাম তাতে যেন মেতে যেতাম। তারপর প্রায়শই একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সৃষ্টি হত।

আমার কোন সঙ্গী ছিল না। প্রতিবেশীদের ছেলেরা আমার সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করতো। তারা আমাকে দেখলেই নিজেদের পরস্পরকে ডেকে বলতো, "দেখ্, সেই ছোঁড়াটা, কাশিরিনের নাতিটা আস্‌ছে। মার ওটাকে।" তারপরই যুদ্ধ শুরু হত। বয়সের অনুপাতে আমাব গায়ে জোর ছিল যথেষ্ট; ঘুষিও চালাতে পারতাম চট্‌পট্‌। আমার শত্রুবা তা জানতো। তাই আমাকে আক্রমণ করতো সদলে। কিন্তু রাস্তায় আমি পরাস্ত হতামই; তাই ছিন্নভিন্ন ও ধূলিধূসরিত পোশাকে কাটা নাক, চেরা ঠোঁট ও সারা মুখে আঁচড়ানোব দাগ নিয়ে বাড়ি ফিরতাম।

দিদিমা আমাকে দেখেই ভয়ে ও করুণায় বলে উঠতেন, "কি? তুমি আবার মারামারি করছিলে, ক্ষুদে শয়তান কোথাকার? এ-সবের মানে কি?"

তিনি আমার মুখ ধুয়ে দিতেন; কাটা ও থেঁৎলানো জায়গাগুলোর ওপর তাম্রমুদ্রা বা সীসে গরম করে তাপ দিতেন আর বলতেন, "এসব মারামারির মানে কি? বাড়িতে তুমি একেবারে শান্ত আর বাড়ির বার হলেই কি রকম যে হয়ে ওঠ জানি না। নিজের জন্যে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তোমাকে রাস্তায় যেতে দিতে বারণ করবো।"

দাদামশায় আমার কাটা থেঁৎলানো দাগগুলো দেখতেন, কিন্তু কখনও ভৎর্সনা করতেন না। তিনি কেবল বলে উঠতেন, "আরও বাহার! দেখ বাপু ক্ষুদে বীর, তুমি যতদিন আমার বাড়িতে থাকবে, পথে বেরিও না। শুনলে আমার কথা?"

শান্ত নির্জন পথে আমি কখন আকৃষ্ট হতাম না, কিন্তু ছেলেদের কোলাহল শুনতে পেলেই, দাদামশায়ের সকল নিষেধ ভুলে গিয়ে আঙিনা থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়তাম। আঘাত ও বিদ্রূপ আমাকে পীড়া দিত না, আঘাত পেতাম পথের খেলার নিষ্ঠুরতায়। সে যে কি রকম নিষ্ঠুর, ক্লান্তিকর ও পীড়াদায়ক তা আমি খুব ভাল করেই জানতাম। তাতে লোককে পাগল করে ফেলে। আমাকে তা ভয়ঙ্কর বিচলিত করতো। ছেলেরা যখন কুকুর আর মুরগীগুলোকে বিরক্ত করতো, বিড়ালগুলোকে যন্ত্রণা দিত, য়িহুদিদের ছাগল তাড়া করতো, ছন্নছাড়া মাতালগুলোকে আর স্ফূর্তিবাজ ইগোশাকে ক্ষেপাতো আমি স্থির থাকতে পারতাম না। তারা বলতো "ইগোশার পকেটে যম।"

এই লোকটা ছিল লম্বা, রোগা, শুকনো। তার গায়ে ছিল ভারী ভেড়ার চামড়ার পোশাক; শুকনো, ময়লা মুখে ছিল খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সে সামনের দিকে ঝুঁকে অদ্ভুত ভাবে কাঁপতে কাঁপতে পথে ঘুরে বেড়াতো। কারো সঙ্গে কথা বলতো না; সব সময়ে তাকিয়ে থাকতো মাটির দিকে। তার মুখখানির রঙ ছিল লোহার মতো, চোখ দুটো ছিল ছোট ও ম্লান। তাতে তার প্রতি আমার একটা সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলে ছিল। মনে করতাম, এই একটি লোক গুরুতর ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত আছে। সে যেন কি খুঁজে বেড়াতো; তাকে বাধা দেওয়া অন্যায়। ছেলেরা তার পিছু নিয়ে তার পিঠে ঢিল

মারতো। তার পিঠখানা ছিল চওড়া। যেন তাদের দেখে নি এম্নি ভাবে কিছুক্ষণ গিয়ে, যেন তাদের আঘাতে সচেতনও নয় এম্নি ভাব দেখিয়ে সে মাথা খাড়া করে কম্পিত হাত দুখানি দিয়ে ছেঁড়া টুপিটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে তুলে, চারধারে তাকাতো যেন সবে জেগে উঠেছে।



"ইগশার পকেটে যম! ইগশা কোথায় যাচ্ছ? দেখ, তোমার পকেটে যমদূত!" বলে ছেলেরা চীৎকার করতো।

ইগশা পকেটে হাত দুখানি পূরতো। তারপব তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে মাটি থেকে একটা ঢিল কি শুকনো কাদার ডেলা কুড়িয়ে নিয়ে লম্বা হাতখানা দুলিয়ে গাল দিত। তার গাল কয়েকটি অশ্লীল শব্দে সীমাবদ্ধ ছিল। এ বিষয়ে ছেলেদের শব্দ ভাণ্ডার ছিল অপরিমেয় সম্পদশালী। কখন কখন সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাদের তাড়া করতো; কিন্তু তার গায়ের লম্বা ভেড়ার চামড়ার পোশাকটা বাধা ঘটাতো, সে ছুটতে পারতো না। মাটিতে হাতের ভর দিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তো। তখন তাকে দেখাতো একটা শুকনো গাছের ডালের মতো। আর ছেলেরা তার পাঁজরা ও পিঠ লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তো এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটি ছিল সে সাহস করে এগিয়ে যেত তার একেবারে কাছে; এবং লাফাতে লাফাতে তার মাথায় মুঠো মুঠো ধুলো দিত।

কিন্তু পথে আমি সবচেয়ে বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখেছিলাম, আমাদের প্রাক্তন ফোরম্যান গ্রেগরি আইভানোভিচের। সে হয়ে গিয়েছিল একেবারে অন্ধ। সে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতো। তাকে দেখাতো অতি দীর্ঘাকার, সুন্দর। সে একটি কথাও বলতো না। একটি ক্ষুদ্রকায়া পলিতকেশা বৃদ্ধা তার হাত ধরে থাকতো। প্রত্যেক জানলার

নিচে তারা ছুটিতে দাঁড়াতো এবং কখনও সেদিকে চোখ তুলে তাকাতো না, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কাতরভাবে বলতো, "খ্রীষ্টের নামে, অন্ধটিকে দয়া করুন।"



গ্রেগরি আইভানোভিচ কিন্তু একটি কথাও বলতো না তার কালো চশমা জোড়া সোজা তাকিয়ে থাকতো বাড়িগুলোর দেওয়াল, জানলা বা পথিকদের মুখের দিকে। তার চওড়া দাড়ি, তার দাগেভরা হাত দুখানার ওপর আলগোচে লুটোতো; তার ঠোঁট দুখানা এক সঙ্গে চেপে লেগে থাকতো। আমি তাকে প্রায়ই দেখতাম; কিন্তু মুখ থেকে একটি শব্দও বার হতে শুনি নি। সেই মৌন বৃদ্ধের চিন্তা আমার মনের ওপর চেপে বসে আমাকে পীড়া দিত। আমি তার কাছে যেতে পারতাম না—কখন তার কাছে যেতামও না। বরং তাকে পথ দিয়ে হাত ধরে নিয়ে যেতে দেখ্‌লেই ছুটে বাড়িতে ঢুকে দিদিমাকে বলতাম, "বাইরে গ্রেগরি এসেছে।"

দিদিমা অশান্ত করুণ কণ্ঠে বল্‌তেন, "এসেছে। ছুটে গিয়ে ওকে এটা দাও।"

আমি রাগের সঙ্গে রুক্ষভাবে অস্বীকার করতাম। তখন তিনিই ফটকে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বল্‌তেন। গ্রেগরি হাসতো, দাড়ি টানতো কিন্তু কথা বলতো কমই; আর যেটুকু বলতো তাও একটি মাত্র ক্ষুদ্র শব্দে। দিদিমা তাকে কখন কখন রান্নাঘরে এনে চা ও কিছু খেতে দিতেন। তিনি যখনই তাকে রান্নাঘরে আন্‌তেন সে তখনই জিজ্ঞেস করতো, আমি কোথায়? দিদিমা আমাকে ডাকতেন; কিন্তু আমি ছুটে গিয়ে উঠোনে লুকোতাম। আমি তার কাছে যেতে পারতাম না। তার সামনে

আমার মনে এক অসহনীয় লজ্জার উদয় হ'ত। আমি তা বুঝ্‌তে পারতাম। জানতাম দিদিমাও লজ্জিত হচ্ছেন। মাত্র একবার আমাদের দুজনের মধ্যে তার বিষয় আলোচনা হয়েছিল। আর সেই একটি দিন তিনি তার হাত ধরে ফটকে নিয়ে গিয়ে সেখানে রেখে মাথা নিচু করে কাঁদতে কাঁদতে এসেছিলেন। আমি গিয়ে তাঁর হাত ধরে ছিল্লাম।

তিনি কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি ওর কাছ থেকে পালিয়ে যাও কেন? ও ভাল লোক; তোমাকে খুব ভালোবাসে, বুঝলে?"

জিজ্ঞেস করেছিলাম, "দাদামশায় ওকে রাখেন না কেন?"

"দাদামশায়?" বলে তিনি থেমে ছিলেন। তারপর নিম্ন স্বরে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "তোমাকে আমি এখন যা বল্‌ছি, মনে রেখ —এর জন্যে ভগবান আমাদের সাংঘাতিক শাস্তি দেবেন। তিনি আমাদের শাস্তি দেবেন—"

তাঁর কথার ভুল হয় নি। কারণ দশ বছর পরে, দিদিমাকে তখন সমাহিত করা হয়েছে, দাদামশায়ও নিজে ভিখারী হন এবং পাগল হয়ে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন, আর লোকের জানলার নিচে কাতর ভাবে আর্ত্তনাদ করতেন, "ওগো রাঁধুনীরা, আমাকে দয়া করে এক টুকরো খাবার দাও—মোটে এক টুকরো—উফ্‌!"

ইগোশা আর গ্রেগরি আইভানোভিচ ছাড়াও ভোরোনকাটির জন্যেও আমার মনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ছিল। সে ছিল দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক। তাকে ছেলেরা পথে পথে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো। সে আস্‌তো ছুটির দিনে। তার শরীরটা ছিল বিশাল, আলুথালু বেশ। সে ছিল মাতাল। সে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে অশ্লীল গান গাইতে

গাইতে চল্‌তো, যেন তার পা নড়ছে না বা মাটিস্পর্শ করছে না, সে মেঘের মতো ভেসে যাচ্ছে। রাস্তার লোকে তাকে দেখলেই ফটকে, কোন বাড়ির আড়ালে বা দোকানে গিয়ে লুকোতো। সে পথ একেবারে জনশূন্য করে ফেল্‌তো। তার মুখখানা ছিল প্রায় নীল, ব্লাডারের মতো ফোলা। তার ধূসর প্রকাণ্ড চোখ দুটো বিকট ও বিচিত্র ভাবে বিস্ফারিত হয়ে থাক্‌তো। সে কখন কখন আর্ত্তনাদ করে বলে উঠতো, "আমার বাছারা, তোমরা কোথায়?"



দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কে?

তিনি উত্তর দিয়ে ছিলেন, "তোমার জানবার দরকার নেই।" তা সত্ত্বেও আমার কাছে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছিলেন, "স্ত্রীলোকটির স্বামী ছিল। ভাল সরকারী চাকরি করতো। তার নাম ছিল বোরোনফ্‌। সে চেয়ে ছিল, তার চেয়েও আরও উন্নতি করতে। তাই তাদের কর্ত্তার কাছে তার স্ত্রীকে বেচে ছিল। কর্ত্তা স্ত্রীলোকটিকে কোথায় যেন নিয়ে যায়। স্ত্রীলোকটি দু' বছর বাড়ি আসে না। যখন ফিরে আসে, তখন তার ছেলে আর মেয়ে দুটিতেই মারা গেছে; আর তার স্বামী সরকারী টাকা নিয়ে জুয়া খেলবার অপরাধে ছিল জেলে। স্ত্রীলোকটি দুঃখে মদ ধরে; এখন পথে পথে গোলমাল করে বেড়ায়। এমন একটা ছুটি বাদ যায় না যেদিন না পুলিশ ওকে ধরে।"

পথের চেয়ে বাড়ি নিশ্চয়ই ভাল। প্রশস্ত সময় ছিল খাবার পর। দাদামশায় যেতেন জাকফ-মামার কারখানায়, দিদিমা জানলার ধারে বসে আমাকে মজার রূপকথা, আরও কত গল্প ও আমার বাবার কথা বল্‌তেন।

যে-ষ্টারলিং পাখীটিকে বিড়ালের মুখ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, তার ভাঙা ডানাগুলি দেওয়া হয়েছিল ছেঁটে। আর তার যে-পাখানি

বিড়ালে খেয়ে ফেলে ছিল, দিদিমা তার জায়গায় তৈরি করে দিয়ে ছিলেন একখানি কাঠের পা। তারপর তিনি তাকে কথা বল্‌তে শিখিয়ে ছিলেন। কখন কখন তিনি পূরো একটি ঘণ্টা খাঁচাটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। খাঁচাটি ঝুল্‌তো জানলার চৌকাঠ থেকে। তখন দিদিমাকে দেখাতো একটি প্রকাণ্ড নিরীহ প্রাণীর মতো। তিনি ভাঙা গলায় বার বার বলতেন, "বাছা কিছু খেতে চাও তো।"



পাখীটার রঙ ছিল কয়লার মতো কালো।

ষ্টারলিংটি তার ছোট, চঞ্চল, কৌতুকেভরা চোখটি তাঁর দিকে নিবদ্ধ করে খাঁচাটার পাতলা তলাটিতে কাঠের পাখানি দিয়ে ঘা দিত, তারপর গলা লম্বা করে গোল্ডফিনচের মতো শিষ দিত বা কোকিলের বিদ্রূপমাখা স্বর নকল করতো। সে বিড়ালের মতো মিউ মিউ ও কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে ডাকবার চেষ্টা করতো। কিন্তু মানুষের ভাষা তার কণ্ঠে তো দেওয়া হয় নি।

দিদিমা খুব গম্ভীর ভাবে বল্‌তেন, "ও-সব বাজে চলবে না! বল, 'ষ্টারলিংকে কিছু খেতে দাও।' "

সেই ক্ষুদে কালো-বাঁদরটা একটা শব্দ করে উঠতো। সেটা হতে পারতো, "বাবুশকা (দিদিমা)।" বৃদ্ধা অম্নি আনন্দে হেসে তাকে স্বহস্তে খাওয়াতেন আর বলতেন, "এই শয়তান, আমি তোমাকে চিনি। তুমি ভান কর। এমন কিছু নেই যা তুমি করতে পার না— সব কিছু করবার মতো বুদ্ধি তোমার আছে।"

তিনি ষ্টারলিংটিকে কথা বলতে শিখাতে পেরেছিলেনও। অল্পকালের মধ্যেই তার যা দরকার তা সে স্পষ্ট করে চাইতো; আর দিদিমার সঙ্গে সঙ্গে টেনে টেনে বলতো; "গু-উ-উ-উড্‌ ম-র্‌-র্নিং, মাই-গুড্‌ ওয়্যান!"

প্রথমে তার খাঁচাটি ঝুল্‌তো দাদামশায়ের ঘরে। কিন্তু সে দাদামশায়কে ভেঙচাতে শিখেছিল বলে, তাকে কিছুদিনের মধ্যেই ঘর থেকে বার করে দিয়ে চিলে-কোঠায় রাখা হয়েছিল। দাদামশায় যখন স্পষ্ট করে উচ্চ কণ্ঠে প্রার্থনা করতেন, সে খাঁচার কাঠিগুলোর ভেতর দিয়ে তার হল্‌দে ঠোঁট বার করে বলতো, "তুমি! তুমি! তুমি! তু—মি! তুমি!"

দাদামশায় তাতে অসন্তুষ্ট হতেন এবং একবার প্রার্থনা বন্ধ করে পা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে রাগে বলে উঠেছিলেন, "শয়তানটাকে বার করে নিয়ে যাও, নাহলে ওটাকে মেরে ফেলবো!"

বাড়িতে মজার ও আনন্দের অনেক কিছুই ঘটতো; কিন্তু সময়ে সময়ে আমি এক অব্যক্ত বেদনায় পীড়িত হতাম। তাতে যেন আমার সমস্ত শক্তি হত দগ্ধ। এবং দীর্ঘকাল ধরে আমি যেন একটা অন্ধকার গর্ত্তে চক্ষু, কর্ণ ও অনুভূতিহীন হয়ে অন্ধ ও অর্দ্ধমৃতের মতো বাস করেছিলাম।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

দাদামশায় শুঁড়িখানার ওপরে বাড়িটা হঠাৎ বিক্রি করে কানা-তোরোই ষ্ট্রীটে আর একখানা বাড়ি কিনলেন। নতুন বাড়িখানা ছিল জীর্ণ, ঘাসে ছাওয়া কিন্তু পরিষ্কার ও নির্জ্জন, যেন মাঠের ভেতর থেকে হঠাৎ উঠেছে। এক সার ছোট ছোট লালরঙের বাড়ির সব শেষের ছিল সেটা।

বাড়িখানা চমৎকার সাজানো-গোছানও ছিল। তার সামনেটা ছিল গাঢ় রাসপ্‌বেরি রঙে রঙ করা। তার নিচের জানলা

তিনটির এবং চিলেকোঠার একটি মাত্র জানলার খড়খড়ির আশমানি রঙ খুব উজ্জ্বল দেখাতো। ছাদের বাঁ দিকটা ঘন সবুজ এল্ম ও লাইম গাছে ছিল চমৎকার ভাবে ঢাকা। আঙিনায় ও বাগানে ছিল অনেকগুলো ঘোরানো-ফিরানো পথ যেন লুকোচুরি খেলার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই সেগুলি তেমন সুবিধার করে রাখা হয়েছিল।

বাগানখানি ছিল বিশেষ করে ভাল। বড় না হলেও, গাছ-পালায় ছিল ঢাকা ও সুন্দর জটিল। এক কোণে ছিল একটি ছোট ধোবিখানা, ঠিক একটি খেলা-ঘরের মতো। আর এক কোণে ছিল বেশ বড় একটা খাদ। তার মুখে গজিয়ে ছিল লম্বা ঘাস। তার মাঝ থেকে বেরিয়ে ছিল একটা চিমনির অংশ, আগেকার ধোবিখানার জল গরমের যন্ত্রের অবশিষ্টটুকু। বাগানটির বাঁ দিকে ছিল কর্ণেল ওবসিয়ানিক্কফের আস্তাবলের দেওয়াল আর ডান দিকে বেংলেংগা হাউস; শেষ দিকটা শেষ হয়েছিল পেৎরোবনা গোয়ালিনীর বাড়ির গায়ে। পেৎরোবনা ছিল মোটা-সোটা। তার মুখখানা ছিল লাল আর সে মানুষটি ছিল বাচাল। তাকে দেখলে আমার মনে হ'ত যেন একটা ঘণ্টা। তার ছোট বাড়িখানি ছিল একটা নাবাল জমিতে, কালো রঙের, ভাঙা-চোরা ও শেওলায় বেশ ঢাকা। বাড়ির জানলা দুটি ছিল মাঠ, গভীর খাদ ও বনের দিকে। বনটাকে দেখাতো দূর নীল মেঘ-ভারের মতো। সারাদিন সৈন্যেরা সেই মাঠে চলা-ফেরা বা ছুটোছুটি করতো। শরৎ-রবির বাঁকা রশ্মিতে তাদের সঙিনগুলো সাদা বিদ্যুতের মতো চমক দিত।

আমাদের বাড়িখানা ছিল লোকে ভরা। তাদের সকলকে আমার কাছে লাগতো আশ্চর্য্যের। দোতালায় ছিল তাতারির এক সৈনিক

তার নশ্বর, সুশ্রী স্ত্রীটিকে নিয়ে। স্ত্রীটি সকাল থেকে রাত অবধি চীৎকার করতো, হাসতো, খুব কারুকার্য্য করা একটা গিটার বাজাতো আর বাঁশির চড়া সুরে গান গাইতো।



সৈনিকটি ছিল বলের মতো গোল। সে জানলায় বসে তার নীল মুখখানা ফোলাতো এবং লাল্‌চে চোখ দুটো শয়তানের মতো এধার-ওধার ঘেরোতে ঘোরাতে অফুরন্ত পাইপটি টানতো, মাঝে মাঝে কাসতো আর কুকুরের ডাকের মতো শব্দ করে হাসতো: “ভুক্‌! ভু—ক্‌!”

মাটির নিচে কুঠুরি আর আস্তাবলের ওপর যে আবামদায়ক ঘরখানা তৈরি হয়েছিল তাতে বাস করতো দুজন গাড়িওয়ালা। তাদের একজন ছিলেন, পিটার খুড়ো। তিনি মানুষটি ছিলেন ছোট খাটো; মাথায় পাকা চুল। আর একজন ছিল স্টেপান; তাঁর বোবা ভাইপোটি। সে ছিল সহজ ও অল্পে তুষ্ট মানুষ। তার মুখখানা দেখলে মনে পড়তো একখানা তামার ট্রের কথা। আর থাকতো লম্বা হাত-পা বিষণ্ণ মূর্ত্তি ভালেই নামে একজন তাতার। সে ছিল এক পদস্থ কর্ম্মচারীর চাকর। এই সব লোক ছিল আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতনত্বের মতো, মহান্ “অজ্ঞেয় সামগ্রী।” কিন্তু যিনি আমার মনো-যোগ আকর্ষণ করে তা এক বিশেষ পর্য্যায়ে ধরে রেখেছিলেন, তিনি এক বোর্ডার। লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল “ভালো কাজ।”

তিনি বাড়ির পিছন দিকে রান্নাঘরের পাশেই একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। তাঁর ঘরখানাতে ছিল দুটো জানলা। সে দুটির একটি ছিল বাগানের দিকে, আর একটি ছিল উঠোনের দিকে। তিনি ছিলেন রোগা কোলকুঁজো মানুষ। তাঁর মুখখানি ছিল সাদা। মুখে ছিল কালো দাড়ি দুভাগে বিভক্ত; চোখ দুটি ছিল কোমল। তিনি চষমা পরতেন।

চুপ-চাপ থাকতেন; আদৌ গায়ে-পড়া ছিলেন না। তাঁকে খেতে বা চা খেতে ডাকলে তাঁর এক উত্তর ছিল, "ভাল-কাজ!" তাই দিদিমা সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে তাঁকে ঐ নামে ডাকতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি বলতেন, "মেনকা, ভাল-কাজকে চা খেতে ডাক" কিম্বা "ভাল-কাজ, তুমি কিছুই খাচ্ছ না।"



তাঁর ঘরখানি ছিল নানা রকমের বাক্স ও নানা রকমের বইয়ে একেবারে ঠাসা। সেগুলো দেখাতো অদ্ভুত। সেখানে ছিল নানা রঙের জলীয় পদার্থে ভরা বোতল, তামা আর লোহার তাল, সিসের বার। সকাল থেকে রাত অবধি লালচে রঙের কোট ও নানারকমের রঙের দাগে ভরা ধূসর চেক-পাজামা পরে তিনি গলাতেন সিসে, ঝালাই করতেন এক ধরনের পেতলের পাত্র, ছোট নিক্তিতে ওজন করতেন জিনিষ-পত্র। তাঁর আঙুল পুড়ে গেলে হুঙ্কার দিয়ে উঠে আস্তে আস্তে তাতে ফুঁ দিতেন। তাঁর চেহারা ও পোশাক ছিল বিশৃঙ্খল ও মলিন। তাঁর গা থেকে বার হ'ত উৎকট গন্ধ। দেওয়ালের গায়ে কোন নক্সা দেখতে তিনি সেটার কাছে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে যেতেন এবং চষমা-জোড়া পরিষ্কার করে খাড়া, বিবর্ণ নাকটা তাতে প্রায় ঠেকিয়ে সেটার গন্ধ শুঁকতেন; অথবা ঘরের মাঝখানে বা জানলায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে মাথা তুলে থাকতেন, যেন অসাড় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

আমি ছাপ্পড়টার চালে উঠতাম। সেখান থেকে আঙিনাটির ওধারেও দেখতে পেতাম। খোলা জানলা-পথে দেখতে পেতাম, টেবিলের ওপর নীল স্পিরিট ল্যাম্পটার আলোয় একখানা ছিন্নভিন্ন নোট বইয়ে তিনি কি লিখছেন। তাঁর চষমা-জোড়া নীলাভ আলোয় বরফের মতো ঝক্ ঝক্ করছে। এই লোকটির গুণীনের

মতো কাজ-কর্ম্ম আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালের ওপর বসিয়ে রাখতো। আমার কৌতূহল এত বেড়ে যেত যে, আমি ফেটে পড়বার মতো হতাম। কখন কখন তিনি পিছনে হাত দিয়ে চালটার দিকে সোজা তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন যেন ফ্রেমে আঁটা মূর্ত্তি, কিন্তু বোঝা যেত তিনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। তাতে অমি অসন্তুষ্ট হতাম। তারপরই হঠাৎ তিনি টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে নিচু হয়ে কি যেন হাতড়াতে শুরু করতেন।



মনে হয় তিনি যদি পয়সাওয়ালা হতেন আর ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ পরতেন তাহলে তাঁকে আমার ভয় হত; কিন্তু তিনি ছিলেন দরিদ্র। তাঁর কোটের কলারের ওপর দিয়ে ময়লা শার্টটার কলার দেখা যেত। তাঁর পাজামাটি ছিল নোংরা ও তালি দেওয়া; মোজাহীন পায়ে ছিল চটি। চটিজোড়া গিয়ে ছিল ক্ষয়ে। যারা দরিদ্র তারা দুর্দ্ধর্ষও নয়, বিপজ্জনকও নয়। এটা আমি অজানিতে শিখে ছিলাম, তাদের প্রতি দিদিমার করুণা মিশ্রিত সম্ভ্রম, আর দাদামশায়ের অবজ্ঞা থেকে।

বাড়িতে কেউ "ভাল কাজকে" পছন্দ করতো না। তারা তাকে নিয়ে হাস্য-পরিহাস করতো। সৈনিকের স্ফূর্ত্তিবাজ স্ত্রীটি তার নাম দিয়েছিল, "খড়ি-নেকো।" পিটার-খুড়ো তাকে ডাকতেন "ওষুধ-ওলা" বা "গুণীন" বলে; আর দাদামশায় তাকে বলতেন "যাদুকর"।

আমি দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "উনি কি করেন?"

—"তোমার জানবার দরকার নেই। চুপ করে থাকো!"

কিন্তু একদিন আমি সাহস করে তাঁর জানলার কাছে গেলাম এবং কষ্টে ভয় দমন করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি করছেন?"

তিনি চমকে উঠে আমাকে চষমার ওপর দিয়ে অনেকক্ষণ দেখ্‌লেন; তারপর পোড়া দাগে ভরা হাতখানা বাড়িয়ে বললেন, "উঠে এস।"



আমাকে তাঁর দরজার বদলে জান্‌লা দিয়ে ঢুকবার প্রস্তাবে, তাঁকে আমার চোখে আরও বড় করলে। একটি কাঠের বাক্সর ওপর বসে তিনি আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। তারপর সরে গিয়ে আবার আমার খুব কাছে ফিরে এসে খাটো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথা থেকে আসছো?"



আমি দিনের মধ্যে চারবার রান্নাঘরে তাঁর পাশে টেবিলে বসতাম। একথা মনে করে তাঁর কথাগুলো অদ্ভুত লাগলো।

উত্তর দিলাম, "আমি বাড়িওলার নাতি।"

তাঁর আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "হাঁ।"

তারপর আর কিছু বললেন না। মনে হল তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। বললাম, "আমি কাশিরিন নয়—পিয়েশকফ্‌।"

তিনি সন্দেহ ভরে কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন, "পিয়েশকফ? ভালকাজ।"

এবং আমাকে এক পাশে সরিয়ে উঠে টেবিলের কাছে যেতে যেতে বললেন, "এখন স্থির হয়ে বস।"

আমি বহুক্ষণ বসে দেখতে লাগলাম, তিনি উকো দিয়ে ঘষা এক টুকরো তামা চাঁছলেন। সেটা একটা প্রেসের ভেতর গলিয়ে দিলেন। একখানা কার্ডবোর্ডের ওপর চাঁছগুলো পড়তে লাগলো সোনার তুষের মতো। সেগুলো তিনি হাতের তালুতে ঢেলে নিয়ে একটি পেটমোটা পাত্রে দিয়ে নাড়লেন। তারপর একটি ছোট বোতল থেকে তাতে দিলেন নুনের মতো সাদা গুড়ো, আর একটা কালো বোতল

থেকে খানিকটা তরল পদার্থ। পাত্রের মিশ্রিত পদার্থটি অবিলম্বে সোঁ সোঁ করে উঠলো আর ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো, এবং একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ আমার নাকে লাগতেই ভয়ানক কাস্‌তে লাগলাম।



গুণীন গর্ব্বভরে বলে উঠলেন, "আহা! বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে। ছাড়ছে না?"

—"হাঁ!"

—"ঠিক! এতে দেখাচ্ছে, জিনিষটি ঠিক হয়েছে বাবা!"

আমি মনে মনে বললাম, "এর মধ্যে অহঙ্কারের কি আছে?" এবং প্রকাশ্যে বলে উঠলাম, "যদি গন্ধটা বিশ্রী হয়, তাহলে ভাল হয় নি।"

তিনি চোখের একটু ইঙ্গিত করে বললেন, "বটে! বাবা, ওটা সব সময় হয় না। যাহোক—তুমি আর এখানে এস না।"

তাঁর কথায় আমার মনে ভীষণ আঘাত লাগলো। বললাম, "আমি আর কখন এখানে আসবো না!" এবং রাগের সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে গেলাম বাগানে। দাদামশায় সেখানে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, আপেল গাছগুলোর গোড়ায় সার বিছিয়ে দিচ্ছিলেন। কেননা তখন শরৎকাল; অনেক কাল আগেই গাছগুলোর পাতা ঝরে পড়ে ছিল।

তিনি আমাকে কাঁচিখানা দিয়ে বললেন, "এই নাও! তুমি রাসপবেরির ঝোপগুলোকে ছাঁট গে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "ঐ ভাল কাজটা যে-কাজ করে তা কি?"

—"কাজ—ওর ঘরখানা ও নষ্ট করছে, ব্যস্। মেঝেটা গেছে পুড়ে, পর্দাগুলো নোংরা হয়েছে, ছিঁড়ে গেছে। ওকে ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র যেতে বলবো।"

রাসপবেরি ঝোপগুলোর শুক্‌নো ডাল ছেঁটে ফেলতে আরম্ভ করে বললাম, "তাই হবে ওর পক্ষে সব চেয়ে ভাল।"



কিন্তু কথাগুলো বললাম, না ভেবেই।

বাদল সন্ধ্যায় দাদামশায় যখন বেরিয়ে যেতেন, দিদিমা রান্নাঘরে একটি ছোট মজার মজলিস বসাতেন। তিনি বাড়ির সকলকে চায়ের নিমন্ত্রণ করতেন। তাতে গাড়িওলা দুজন, কর্ম্মচারিটির চাকর ও পেৎরোভনা প্রায়ই আসতো; কখন কখন সৈনিকের স্ত্রীও যোগ দিত; কিন্তু 'ভাল কাজকে' বরাবরই দেখ্‌তে পাওয়া যেত ঘরের কোণে ষ্টোভের পাশে স্থির ও নির্ব্বাক হয়ে বসে আছেন। বোবা ষ্টেপান তাতারটার সঙ্গে তাস খেল্‌তো। ভালেই তাসজোড়া টেবিলের ওপর ঠুকে বোবাটার চওড়া নাকের সামনে চীৎকার করে উঠ্‌তো, "তোমার ডিল।"



"ভাল-কাজ" আমাকে তাঁর কাছে যেতে বারণ করবার খুব অল্প কাল পরেই দিদিমা একদিন তাঁর একটি মজলিস বসিয়ে ছিলেন। সেদিন যখন মজলিস বসেছে তখন শরতের ধারা অল্প-স্বল্প বর্ষিত হচ্ছে। বাতাস গর্জ্জন করছে। গাছগুলো সর্ সর্ শব্দ করে উঠছে আর ডাল দিয়ে দেওয়ালে আঁচড়াচ্ছে; কিন্তু রান্নাঘরের ভেতরটা গরম ও আরামের। আমরা সকলে প্রায় গা ঘেঁযাঘেঁষি করে বসে আছি, আর দিদিমা আমাদের গল্পের পর গল্প বলছেন। প্রত্যেকটি গল্প তার আগেরটার চেয়ে ভাল। তিনি ষ্টোভের কিনারায় বসে তার নিচের খাঁজে পা দুখানা রেখে শ্রোতাদের দিকে ঝুঁকে বসে রয়েছেন। তাঁর গায়ে এসে পড়েছে একটি ছোট টিনের ল্যাম্‌পের আলো। গল্প বলার মেজাজে থাকলে তিনি এই জায়গাটিতে বস্‌তেন। বলতেন, "ওপর থেকে

তোমাদের দেখবো। ভঙ্গি করে বসলে ভাল ভাবে কথা বল্‌তে পারি।"

আমি সেই চওড়া খাঁজটার ওপর তার পায়ের কাছে "ভাল-কাজের" প্রায় মাথার সমান হয়ে বসতাম।



দিদিমা ঝরঝরে জোরালো ভাষায় সুনির্ব্বাচিত শব্দে আমাদের যোদ্ধা আইভান ও তাপস মিরনের সুন্দর গল্পটি বলতেন।

তিনি গল্পটির উপসংহারে পৌছবার আগেই দেখতাম "ভাল-কাজ" কি কারণে যেন বিচলিত হয়ে উঠতেন, অস্থির ভাবে হাত নাড়তেন, চষমা-জোড়া খুলতেন আবার পরতেন। অথবা সেটা দুলিয়ে দুলিয়ে দিদিমার কথায় তাল রাখতেন, মাথা নাড়তেন, চোখে আঙুল দিয়ে বা খুব জোরে চোখ রগড়াতেন, যেন ঘামছেন এম্নি ভাবে কপাল ও গায়ের ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নিতেন। কেউ নড়লে, কাসলে বা মেঝেয় পা ঘষলে তিনি তাকে চুপ্‌ করতে বল্‌তেন। সেদিন দিদিমা গল্প শেষ করে ঘামে ভেজা মুখখানি জামার হাতায় মুছলেন। তখন "ভাল-কাজ" লাফিয়ে উঠে হাত দুখানা সামনে বাড়িয়ে দিলেন, যেন তার মাথা ঘুরছে। আর বল্‌লেন, "চমৎকার! লিখে রাখা উচিত! বাস্তবিকই উচিত। এটা ভয়ঙ্কর সত্যি…"

তখন প্রত্যেকেই দেখ্‌তে পেল, তিনি কাঁদছেন।…

দিদিমা রুক্ষভাবে বললেন, "যদি ভাল লাগে লিখে রাখ। ক্ষতি নেই। এই ধরনের গল্প আমি অনেক জানি।"

তিনি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন, "না, কেবল ঐটেই চাই। এটা কি—ভয়ঙ্কর ভাবে রুষ গল্প।" এবং কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন, যখন আমাদের অন্যায় কোন-কিছু করতে আদেশ দেওয়া হবে তখন আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে দৃঢ় ও কঠিন হয়ে থাকা।' সত্যি! সত্যি!"

তারপর হঠাৎ তাঁর গলা ভেঙে গেল। তিনি কথা বল্‌তে বল্‌তে থেমে আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন।



অন্যান্য অতিথিরা হেসে উঠ্‌লেন : পরস্পরের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন। দিদিমা ষ্টোভের গায়ে আরও পিছিয়ে একেবারে অন্ধকারে সরে গেলেন। তাঁকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে শোনা গেল।

পুরু লাল ঠোঁটে হাত বুলিয়ে পেৎরোভনা বললে, "মনে হচ্ছে ও মেজাজে আছে।"

পিটার-খুড়ো জবাব দিলেন, "না ওটা হচ্ছে কেবল ওর কাজের ধারা।"

দিদিমা ষ্টোভ থেকে নেমে নীরবে স্যামোভার গরম করতে লাগলেন। পিটার-খুড়ো খাটো গলায় আবার বললেন, "ভগবান কখন কখন লোককে ঐ রকম তৈরি করেন—খেয়াল।"

ভালেই ভাঙা গলায় বলে উঠলো, "যারা আইবুড়ো তারা ভাঁড়ামি করে।" তার কথায় সকলে হেসে উঠ্‌লো; কিন্তু পিটার-খুড়ো টেনে টেনে বললেন, "ও সত্যি কাঁদছিল।"

এ-সবে আমার ক্লান্তি বোধ হতে লাগলো। বুঝলাম, মনে কেমন এক বেদনার উদয় হচ্ছে। "ভাল কাজের" আচরণে খুব আশ্চর্য্য হলাম। তার জন্যে বড় দুঃখ হল। তাঁর অশ্রু-সিক্ত চোখ দুটি কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারলাম না।

সে-রাতে তিনি বাড়িতে ঘুমোলেন না। কিন্তু পরদিন ফিরে এলেন সকলের খাবার পর। তাঁর মুখে কথা নেই, ম্রিয়মাণ ও বিহ্বল।

অপরাধী বালকের মতো তিনি দিদিমাকে বললেন, "গত রাতে আমি এক কাণ্ড করে ছিলাম। আপনি রাগ করেন নি?"

—"কেন রাগ করবো ?"

—"কারণ আমি বাধা দিয়েছিলাম···কথা বলেছিলাম···"

—"তুমি কারুকেই আঘাত দাও নি।"



মনে হল, দিদিমা তাঁকে ভয় করেন। তাঁর মুখের দিকে না তাকিয়ে চাপা গলায় তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। আচরণটা তাঁর প্রকৃতির বিপরীত।

তিনি দিদিমার কাছে সরে এসে বিস্ময়কর সরলতার সঙ্গে বললেন, "দেখুন, আমি বড় একা। আমার কেউ নেই। আমি সব সময় চুপ করে থাকি—একটি কথাও বলি না। আর তারপরই যেন আমার মন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, যেন সেটা ছিঁড়ে বার করা হয়েছে। সে সময়ে আমি জড়পদার্থগুলোর সঙ্গেও কথা বল্‌তে পারি—"

দিদিমা তাঁর কাছ থেকে সরে দাঁড়ালেন। তিনি বলতে লাগলেন, "যদি তুমি এখন বিয়ে কর—"

"অ্যাঁ ?" বলে তিনি ভ্রূ-কুঁচকে হাত দু'খানা তুলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

দিদিমা তাঁর দিকে ভ্রূ-কুঁচকে তাকিয়ে এক টিপ নস্য নিলেন। তারপর আমাকে কঠোর স্বরে ভৎর্সনা করলেন, "ওর কাছে তুমি অত ঘোরা-ফেরা কোর না। শুনছো ? ভগবান জানেন, ও কি ধরনের লোক !"

কিন্তু তাঁর প্রতি আমি নতুন করে আকৃষ্ট হলাম। তিনি যখন বললেন "ভয়ঙ্কর একা" তখন তাঁর মুখখানি কি রকম ম্লান হয়ে গিয়েছিল তা দেখেছিলাম। সেই কথাগুলোর ভেতর ছিল এমন কিছু যা আমি উপলব্ধি করেছিলাম। তা আমার মর্ম্ম স্পর্শ করেছিল। আমি তাঁকে খুঁজতে গেলাম।

আঙিনা থেকে তাঁর ঘরের জানলার ভেতর তাকিয়ে দেখলাম। ঘরখানা দেখালো খালি। সেখান থেকে গেলাম বাগানে। তাঁকে খাদের ধারে দেখতে পেলাম। মাথার পিছনে হাত দুখানা দিয়ে, হাঁটুতে কনুইয়ের ভার রেখে, একখানা আধপোড়া তক্তার ওপর কষ্টে বসে। তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। কাঠখানার বেশির ভাগ ছিল মাটিতে পোতা; বাকিটা ছিল মাটি থেকে বেরিয়ে।

সেই রকম জায়গায় বসে থাকতে দেখে তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তিনি কিছুক্ষণ আমাকে দেখতে পেলেন না; তাঁর আধ-কাণা, পেঁচার মতো চোখ দুটোর দৃষ্টি ছিল দূরে। হঠাৎ বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞেস করলেন:

"আমাকে কোন কাজের জন্যে দরকার?"

—"না।"

—"তাহলে তুমি এখানে কেন?"

—"বলতে পারি না।"

তিনি চষমাজোড়া চোখ থেকে খুলে তাঁর লাল-কালো ছিট দেওয়া রুমালে সেটা মুছে বললেন, "এখানে উঠে এস।"

আমি তাঁর পাশে বসলে তিনি আমার কাঁধ হাত দিয়ে জড়িয়ে আমাকে তাঁর গায়ের সঙ্গে চেপে ধরে বললেন, "বোস। এস চুপ করে স্থির হয়ে বসা যাক। বসতে পারবে? তুমি জেদী?"

—"হাঁ।"

—"ভাল-কাজ।"

আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। শান্ত কোমল অপরাহ্ণ। বিলম্বিত গ্রীষ্মের বেলাশেষ। প্রচুর পুষ্পসম্ভার সত্ত্বেও সব যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার লক্ষণগুলি ছিল পরিস্ফুট। প্রতি ঘণ্টায় শূন্যতা দেখা

দিচ্ছিল। মাটি থেকে উঠছিল সোঁদা গন্ধ। বাতাস স্বচ্ছ। ছোট ছোট কাকগুলো লাল আকাশের গায়ে চারধারে লক্ষ্যহীন হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। সব স্তব্ধ। যে-কোন শব্দকে যেমন পাখির ডানার ঝট্‌পট বা ঝরা পাতার খস্‌খস্‌কে তখন মনে হচ্ছিল অস্বাভাবিক উচ্চ। তাতে চমক লাগছিল। শব্দগুলো জমাট স্তব্ধতায় যাচ্ছিল মিলিয়ে। সে স্তব্ধতা যেন সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করে অন্তরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলছিল। এই মুহূর্তগুলিতে অন্তরে জেগে ওঠে বিচিত্র নির্মল ভাব—অপার্থিব সূক্ষ্ম, লূতাতন্তুর মতো স্বচ্ছ। ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। অন্তরে দুঃখের ও সেই সঙ্গে সান্ত্বনার, অস্বস্তির অনল জ্বালিয়ে তুলে' সেগুলি খসা-তারার মতো আসে-যায়। আর, কোমল অন্তর যেন উজ্জ্বল হয়ে তখন যে ছাপটি গ্রহণ করে তা চিরকালের মতো যায় রয়ে।

বোর্ডারটির গায়ে গা ঘেঁষে আমি তাঁর সঙ্গে আপেল গাছের কালো ডালগুলোর ভেতর দিয়ে রক্তিম আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ডানা দুলিয়ে এক ঝাঁক কাক উড়ে যাচ্ছিল। দেখছিলাম, ডাঁটাগুলোর মাথায় কেমন করে শুক্‌নো পপিগুলো দুলে দুলে খস্‌খসে বীজগুলো ছড়াচ্ছিল। লক্ষ্য করছিলাম, ছিন্ন-ভিন্ন গাঢ় নীল মেঘ দল, ধূসর তাদের কিনারা, প্রান্তরের ওপর বিস্তৃত হয়ে আছে। আর তার তলা দিয়ে গোরস্থানে তাদের নীড়ে উড়ে চলেছে কাকের দল।

সবই সুন্দর। সেই সন্ধ্যায় সবই লাগছিল বিশেষ করে সুন্দর এবং আমার মনের ভাবের সঙ্গে সুসমঞ্জ। কখন কখন আমার সঙ্গী গভীর নিশ্বাস ফেলে বলছিলেন, "কি বল, বাবা, সব ঠিক আছে, তাই নয়? তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না তো?"

কিন্তু আকাশ অন্ধকার হয়ে, গোধূলি বেলা আর্দ্রতায় ভরে উঠে সব কিছুর ওপর বিছিয়ে গেলে তিনি বললেন, "উপায় নেই। আমাদের ভেতরে যেতেই হবে।"

তিনি বাগানের ফটকে দাঁড়িয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন, "তোমার দিদিমা মানুষটি চমৎকার। অমূল্য!" তারপর চোখ দুটি বন্ধ করে দিদিমার সেদিনের গল্পটির শেষের ছত্র কয়টি খাটো অথচ স্পষ্ট স্বরে আবৃত্তি করলেন:

"আজ্ঞা যদি দেয় অন্যায় করিতে কিছু
দৃঢ়, শক্ত রব মাথা না করিব নিচু।"

"কথাগুলো ভুলো না বাবা!" এবং তাঁর সামনে আমাকে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি লিখতে পার?"

—"না।"

—"নিশ্চয়ই লিখ্‌তে শিখবে। লিখ্‌তে শিখলে, দিদিমার গল্পগুলো লিখে রেখ। দেখবে, তাতে পরিশ্রম সার্থক হবে।"

এইভাবে আমরা বন্ধু হলাম এবং যখনই আমার ইচ্ছা হ'ত "ভাল-কাজকে" দেখতে যেতাম। দেখতাম কোন কাঠের-বাক্স বা ছেঁড়া কাপড়ের ওপর বসে তিনি সিসে গলাচ্ছেন, তামা গরম করে লাল করে তুলছেন অথবা ছোট হাতুড়ি দিয়ে নেহাইয়ের ওপর লোহার পাত পিটছেন কিম্বা সূক্ষ্ম নিক্তিতে তার ওজন করছেন।...

একদিন জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি করছেন?"...

—"একটা জিনিষ তৈরি করছি, বাবা।"

—"কি জিনিষ?"

—"তা তোমাকে বল্‌তে পারি না। তুমি বুঝ্‌তে পারবে না।"

—“দাদামশায় বলেন আপনি টাকা জাল করলেও তিনি আশ্চর্য্য হবেন না।”

—“তোমার দাদামশায় ? হাঁ। একটা কথা বলতে হয় তাই ও কথা বলেছেন। টাকা-পয়সা সব বাজে।”



—“টাকা-পয়সা না হলে আমরা রুটি কিনব কি দিয়ে ?”

—“হাঁ, তার জন্যে টাকা-পয়সার দরকার সত্যি।”

—“আর মাংসের জন্যেও।”

—“হাঁ, মাংসের জন্যে।”

তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে নীরবে হাসলেন। তাঁর সহৃদয়তায় আমাকে বিস্মিত করলে। তারপর আমার কান টানতে টানতে বললেন, “তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তুমিও সব সময় জেত। চুপ করে থাকাই ভাল।”

কখন কখন তিনি কাজ ফেলে, আমার পাশে বসে জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। দেখ্‌তেন, ছাদে চট্‌পট্‌ শব্দে বৃষ্টি পড়ছে, আঙিনায় কেমন করে ঘাস গজাচ্ছে, আপেল গাছগুলো কেমন পাতাশূন্য হয়ে পড়ছে। “ভাল-কাজ” বাক্য ব্যয় করতেন সামান্য কিন্তু যেটুকু বল্‌তেন সেটুকু প্রসঙ্গের এক চুল এদিক-ওদিক হত না। আমার মনোযোগ আকর্ষণের ইচ্ছা হলে, তিনি বেশির ভাগ সময়ই কথা না বলে আমাকে কনুইয়ের গুঁতো দিতেন আর চোখের ইসারা করতেন। আঙিনাটা আমার বিশেষ মনোরম লাগতো না; কিন্তু তাঁর কনুইয়ের গুঁতো আর সংক্ষিপ্ত কথাগুলিতে যেন আর এক রঙে রঙিয়ে দিত এবং দৃষ্টির মধ্যে প্রত্যেকটি জিনিষকে মনে হ'ত দেখবার উপযোগী। সেদিন একটা বিড়ালছানা ছুটে বেড়াচ্ছিল। একজায়গায় খানিকটা জল জমে চক

চক করছিল। ছানাটা তার ধারে দাঁড়ালো। জলে তার প্রতিবিম্বটির দিকে তাকিয়ে যেন তাকে মারতে যাচ্ছে এম্নি ভাবে একখানি থাবা তুলে রইলো।



“ভাল-কাজ” মন্তব্য করলেন, “বিড়াল হচ্ছে দাম্ভিক আর সন্দিগ্ধ।”...

“ভাল-কাজের” প্রতি আমার আকর্ষণ খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং প্রত্যহ হয়ে উঠতে লাগলো প্রবল। শেষে একদিন দেখলাম, তিনি আমার দুঃখের ও সুখের ক্ষণে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তিনি নিজে মৌনী হলেও আমার মাথায় যা কিছু আসতো সে-সব বল্‌তে আমাকে নিষেধ করতেন না। কিন্তু দাদামশাই সর্ব্বদাই আমাকে এই বলে থামিয়ে দিতেন, “ঘস্ ঘস্ করো না, শয়তানের যাঁতাকল।”

দিদিমাও নিজের ভাবনা নিয়ে থাকতেন; তাই পরের কথায় কান দিতেন না। কিন্তু “ভাল-কাজ” সর্ব্বদা আমার কপচানি মন দিয়ে শুনতেন আর প্রায়শই সহাস্যে বলতেন, “না বাবা, ও কথা সত্যি নয়। ওটা তোমার নিজের ধারণা।”

সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটি তিনি করতেন ঠিক মুহূর্ত্তে, আর তাও যখন প্রয়োজন হ'ত। তিনি যেন আমার হৃদয় ও মস্তিষ্কের বহিরাবরণ ভেদ করে সেখানে যা-কিছু ঘট্‌ছে সব দেখ্‌তে পেতেন। এমন কি উচ্চারণের আগে আমার ওষ্ঠে বৃথা, অসত্য বাক্যগুলিকেও দেখ্‌তে পেতেন। তিনি সেগুলিকে দেখ্‌তে পেয়ে দুটি মৃদু আঘাতে ছেদন করে ফেলতেন, “মিথ্যে, বাবা।”

কখন কখন তাঁর গুণীনের মতো শক্তিকে আমি টেনে বার করবার চেষ্টা করতাম। কিছু বানিয়ে বলতাম, যেন সত্যই তা ঘটেছে। তিনি কিছুক্ষণ শুনে বলতেন, “দেখ—ওটা সত্যি নয়, খোকা।”

—“কি করে জানলেন?”

—“আমি অনুভব করতে পারি, বাবা।”

দিদিমা যখন সিয়েনিউ স্কয়ার থেকে জল আনতে যেতেন আমাকে সঙ্গে নিতেন। একবার আমরা দেখলাম, সেই শহরের পাঁচজন লোক একটি চাষীকে মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে একটা কুকুর যেমন আর একটা কুকুরকে করে থাকে তেমনি ভাবে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দিদিমা বাঁক থেকে কলসিটা খুলে বাঁকখানা ঘোরাতে ঘোরাতে লোকটাকে বাঁচাতে ছুটলেন আর আমাকে বলতে লাগলেন, “তুমি এখন পালাও।”

কিন্তু আমি ভয় পেয়ে ছিলাম। তার পিছনে ছুট্তে ছুটতে লোকগুলোকে লক্ষ্য করে নুড়ি আর ঢিল ছুড়তে লাগলাম। দিদিমা বীরের মতো তাদের ঘাড়ে ও মাথায় বাঁক দিয়ে পিটতে লাগ্লেন। আর সকলে সেখানে এসে পড়লে তারা পালিয়ে গেল। দিদিমা আহত লোকটির ক্ষত ধুয়ে দিতে আরম্ভ করলেন। লোকটার মুখখানা তারা পা দিয়ে মাড়িয়ে ছিল। ছিন্ন-ভিন্ন নাকটা সে নোংরা আঙুল দিয়ে চেপে ধরে চীৎকার করতে লাগলো আর সেই সঙ্গে কাদতে লাগ্লো। তার আঙুলের তলা দিয়ে দিদিমার মুখে ও বুকে ফিন্কি দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। তার চেহারা দেখে আমার মন গেল ঘৃণায় ভরে। দিদিমাও চীৎকার করে উঠে ভয়ানক কাঁপতে লাগলেন।

বাড়িতে ফিরে এসেই বোর্ডারটির কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে বৃত্তান্তটি বল্তে আরম্ভ কর্লাম। তিনি কাজ ফেলে রেখে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে চষমার ভেতর দিয়ে স্থির ও কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তার পর হঠাৎ আমাকে বাধা দিয়ে

অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন, "চমৎকার করেছ! চমৎকার!"

যে-দৃশ্য আমি দেখেছিলাম তাতে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, তাঁর কথাগুলি আমাকে বিস্মিত করলে না, আমি বৃত্তান্তটি বলেই চললাম। কিন্তু তিনি আমাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে অস্থিরতার সঙ্গে পায়চারি করতে লাগলেন। বললেন, "ও-ই যথেষ্ট। আমি আর শুনতে চাই না। যা দরকার তুমি সবই বলেছ, বাবা—সব, বুঝলে?"



তাতে আমি অসন্তুষ্ট হলাম; কোন জবাব দিলাম না। কিন্তু পরে বিষয়টি আবার চিন্তা করে, তিনি যে আমাকে ঠিক ক্ষণটিতে নিরস্ত করেছিলেন, এটা আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়েছিলাম। প্রকৃত পক্ষে যা বলার ছিল আমি সবই তাঁকে বলেছিলাম।

তিনি বললেন, "এই ঘটনাটির কথা ভেব না, বাবা। বিষয়টি মনে রাখবার মতো ভালো নয়।"

কখন কখন ক্ষণিকের আবেগে তিনি যে-সব কথা বলেছিলেন, আমি কখন সে-সব ভুলি নি। মনে পড়ে, তাঁকে আমার শত্রু ক্লিউশনিকফের কথা বলেছিলাম। সে ছিল নিউ ষ্ট্রীটের এক যোদ্ধা—দেহটি স্থূল, মাথাটি প্রকাণ্ড। যুদ্ধে তাকে আমি পরাস্ত করতে পারতাম না, সেও আমাকে পরাস্ত করতে পারতো না। "ভাল-কাজ" আমার অনুযোগ খুব মন দিয়ে শুনে বলেছিলেন, "ও-সব বাজে! ও ধরনের গায়ের জোর কোন কাজে লাগে না। সত্যিকারের জোর হচ্ছে ক্ষিপ্রকারিতার মধ্যে। যে সব চেয়ে ক্ষিপ্র সে-ই শক্তি-শালী। বুঝলে?"

পরের রবিবারে আমি খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘুষি চালিয়ে ছিলাম

এবং ক্লিউশনিকফকে পরাস্ত করেছিলাম সহজেই। তাতে বোর্ডারটি কথায় আমি আরও বেশি করে মনোযোগী হই।

“সব রকমের কিছু ধরতে শিখবে, বুঝলে? ধরতে শিখা বড় কঠিন।”

আমি তাঁকে একটুও বুঝতাম না, কিন্তু আপনা হতেই এ কথা এবং এই ধরনের আরও অনেক উক্তি আমার মনে আছে। তবে বিশেষ করে মনে আছে এটি। কারণ কথাটি ছিল এমন সরল যে অত্যন্ত রহস্যময়। একটা ঢিল, এক টুকরো রুটি, একটা পেয়ালা বা একটা হাতুড়ি ধরতে অসাধারণ কৌশলের দরকার হয় না।

তবে আমাদের বাড়িতে তাঁকে সকলে পছন্দ করতে লাগলো ক্রমেই কম। এমন কি সেই আমুদে মহিলাটির বিড়ালটিও অন্যের কোলে যেমন লাফিয়ে উঠতো তাঁর কোলে তেমন লাফিয়ে উঠতো না। তিনি তাকে যখন কোমল কণ্ঠে ডাক্‌তেন সে ফিরেও তাকাতো না। সে জন্যে আমি তাকে মেরে ছিলাম, তার কান ধরে টেনে ছিলাম এবং প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে তাকে বলেছিলাম, “লোকটিকে ভয় করো না।”

তিনি বলেছিলেন, “আমার পোশাকে অ্যাসিডের গন্ধ বলে ও আমার কাছে আসে না।” কিন্তু আমি জানতাম প্রত্যেকে, এমন কি দিদিমাও সম্পূর্ণ অন্য রকম কৈফিয়ৎ দিতেন। কৈফিয়ৎটা ছিল রূঢ়, মিথ্যা ও ক্ষতিকর।

দিদিমা রাগের সঙ্গে একদিন জান্‌তে চাইলেন, “তুমি সব সময় ওর সঙ্গে লেগে থাক কেন? ও তোমাকে খারাপ কিছু শেখাবে দেখে নিও!”

বোর্ডারটির কাছে আমি গেলেই দাদামশায় আমাকে নিষ্ঠুরভাবে মারতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, লোকটি বদমায়েশ।

তাঁর সঙ্গে যে বন্ধুত্ব করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছিল সে কথা আমি “ভাল কাজকে” বলতাম না, কিন্তু বাড়িতে তাঁর সম্বন্ধে কি বলা হ'ত সে কথা অকপটে বলে যেতাম। “দিদিমা আপনাকে ভয় করেন। তিনি বলেন, আপনি যাদুকর। দাদামশায়ও—তিনি বলেন, আপনি ভগবানের শত্রু। আপনাকে এখানে রাখা বিপদের।”

আমার কথা শুনে তিনি মাথার চারধারে এমন ভাবে হাত নেড়েছিলেন যেন মাছি তাড়াচ্ছেন; কিন্তু তাঁর খড়ির মতো সাদা মুখে লজ্জার রক্তিমাভার মতো একটু হাসি ছড়িয়ে গিয়েছিল, আর আমার অন্তর হয়ে পড়েছিল সঙ্কুচিত, চোখের সামনে যেন বিছিয়ে যাচ্ছিল কুয়াশা।

তিনি বলেছিলেন, “বটে! দুঃখের। তাই নয় কি?

—“হাঁ।”

—“দুঃখের, বাবা—হাঁ।”

অবশেষে দাদামশায় তাঁকে ঘর ছাড়বার নোটিশ দেন। একদিন সকালে জলযোগের পর তাঁর কাছে গিয়ে দেখি তিনি মেঝেয় বসে কাঠের বাক্সে জিনিষপত্র ‘প্যাক’ করছেন। আর আস্তে আস্তে গাইছেন দিদিমার সেই গল্পের শেষ ছত্র দুটি।

তিনি বললেন, “বিদায় বন্ধু; আমি চলে যাচ্ছি।”

—“কেন?”

তিনি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, “এ কি সম্ভব যে তুমি জান না? এই ঘরখানা তোমার মায়ের জন্যে দরকার।”

—“কে বললে তা?”

—“তোমার দাদামশায়।”

—"তাহলে তিনি মিছে কথা বলেছেন !"

"ভাল-কাকা" আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিলেন। আমি মেঝেয় তাঁর পাশে বস্‌লে তিনি কোমলভাবে বললেন, "রাগ করো না। মনে করেছিলাম, তুমি এ বিষয় জান, আমাকে বল্‌তে চাও না। মনে করেছিলাম, তুমি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছো না।"

সেই জন্যেই তাঁর ভাব হয়েছিল বিষণ্ণ ও বিরক্ত।

তিনি প্রায় আমার কানে কানে বলে যেতে লাগলেন, "শোন ! মনে পড়ে, তোমাকে যখন আমার কাছে আস্‌তে বারণ করেছিলাম ?"

আমি মাথা নাড়লাম।

—"তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছিলে, হও নি ?"

—"হাঁ।"

—"কিন্তু, খোকা, তোমাকে অসন্তুষ্ট করবার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। জানতাম, তুমি যদি আমার সঙ্গে ভাব করো, তাহলে বাড়িতে তোমাকে গোলমালে পড়তে হবে। আমি ঠিক ভাবি নি ? এখন বুঝলে কেন আমি একথা বলেছিলাম ?"

আমার সমবয়সী বালকের মতো তিনি কথাগুলি বলে গেলেন। তাঁর কথায় আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। মনে হল, আমি যেন বরাবরই তা জানতাম ; বললাম, "অনেক আগে আমি তা বুঝেছিলাম।"

—"দেখ, যা বলেছি তা হয়েছে।"

আমার অন্তর-বেদনা হয়ে উঠলো প্রায় অসহনীয়। বললাম, "ওরা কেউ আপনাকে পছন্দ করে না কেন ?"

তিনি আমাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে গায়ের সঙ্গে চেপে ধরে বললেন, "আমি অন্য ধাতের মানুষ—বুঝলে ? তাই। আমি ওদের মতো নয়—"

আমি তাঁর হাতে ধরে রইলাম, বুঝতে পারলাম না কি বলি। প্রকৃতপক্ষে, কিছু বল্‌তে একেবারে অক্ষম হয়েছিলাম।

তিনি আবার বললেন, "রাগ করো না! কেঁদও না!" কিন্তু ঝাপসা চশমা জোড়ার তলা দিয়ে তাঁর নিজের চোখের জল পড়ছিল অঝোরে।

তারপর আমরা অন্য দিনের মতো নীরবে বসে রইলাম; কেবল দু' একটি কথায় কদাচিৎ সে নীরবতা ভঙ্গ হতে লাগ্‌লো। এবং সেই দিন শেষবেলায় তিনি প্রত্যেকের কাছে বিদায় নিলেন এবং আমাকে নিবিড় আলিঙ্গন করলেন। আমি তাঁর সঙ্গে ফটক অবধি গেলাম; দেখলাম, তিনি ঘোড়ার গাড়িতে চলে গেলেন। গাড়ির চাকা যখন হিমে জমাট কাদার স্তূপের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাঁব ভয়ানক ঝাঁকি লাগছিল।

দিদিমা অবিলম্বে নোংরা ঘরখানা পরিষ্কার করতে ও ঝাঁট দিতে আরম্ভ করলেন। আর আমি ইচ্ছা করেই তাঁকে বাধা দিতে এ-কোণে ও-কোণে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

তিনি আমার গায়ে হোঁচট লেগে পড়ে গিয়ে বলে উঠলেন, "যাও এখান থেকে!"

—"তোমরা ওঁকে সরিয়ে দিলে কেন?"

—"যা বোঝ না সে-বিষয়ে কথা বোল না।"

—"তোমরা বোকা—সকলেই!"

ভিজে ন্যাতাটা দিয়ে আমাকে একবার চট করে মেরে তিনি বললেন, "এই ক্ষুদে হতভাগা, তুই কি পাগল?"

তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টায় বললাম, "তোমার কথা বল্‌ছি না, আর সকলের কথা বল্‌ছি।"

কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না।

রাত্রে খেতে বসে দাদামশায় বললেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ যে সে চলে গেছে! ওর যা দেখেছি, তাতে ওর বুকে একদিন যদি ছোরাও বিঁধে থাকতে দেখতাম তাহলে অবাক হতাম না। ঠিক সময়েই গেছে!"

প্রতিশোধস্বরূপ আমি একটি চামচ ভেঙে ফেলে আবার আমার স্বাভাবিক রুক্ষ সহিষ্ণুতায় ফিরে এলাম। এই ভাবে আমার স্বদেশের অসংখ্য বন্ধুবর্গের প্রথম বন্ধুটির সঙ্গের বন্ধুত্বের অবসান ঘট্‌লো। আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশবাসী হচ্ছেন তাঁরা।

## নবম পরিচ্ছেদ

শৈশবে আমি যেন ছিলাম একটি মৌচাক। মৌমাছি যেমন চাকে মধু আনে, তেমি নানা ধরনের সরল ও অখ্যাত ব্যক্তিগণ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা এনে তাদের যা দেবার তাই দিয়ে আমার মনকে মুক্তহস্তে সম্পদশালী করে তুলে ছিল। মধুটুকু প্রায়শই হত ময়লা ও তিক্ত, তবুও তা ছিল জ্ঞান—ও মধু।

"ভাল-কাজ" চলে যাবার পর পিটারখুড়ো হয়েছিলেন আমার বন্ধু। তাঁকে দেখতে ছিল, দাদামশায়ের মতো। তিনিও ছিলেন শুষ্ক-শীর্ণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু তিনি ছিলেন মাথায় খাটো, দাদামশায়ের চেয়ে একেবারেই ছোট। তাঁকে বয়স্ক লোকের মতো দেখাতো না। মনে হত তিনি যেন মজা করবার জন্য বয়স্ক লোকের পোশাক পরেছেন। …তিনি কথা বলতেন গুন্‌গুন্ স্বরে, কখন কখন

খুব কোমল কণ্ঠে; কিন্তু আমার কেমন ধারণা ছিল, তিনি প্রত্যেককেই পরিহাস করেন।

“আমি যখন প্রথম তাঁর কাছে যাই, লেডী কাউনটেস্ টাটিয়ান—তাঁর নাম ছিল লেকসিয়েভ্না—আমাকে বলেন, ‘তোমাকে কামারের কাজ করতে হবে।’ কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি আমাকে সে কাজ ছেড়ে মালীর কাজে সাহায্য করবার আদেশ দিলেন। বললাম, ‘আচ্ছা, আমাকে শ্রমিকের কাজ না করতে হলেই হল! আমি কিছু মনে করবো না। আমাকে যদি শ্রমিকের কাজ করতে হয় তাহলে সেটা ঠিক হবে না।’ আর একবার তিনি বললেন, ‘পেৎরুশকা, তোমাকে মাছ ধরতে যেতে হবে।’ মাছ ধরি বা না ধরি আমার কাছে একই কথা; কিন্তু মাছকে আমি বল্‌লাম ‘বিদায়’। এলাম শহরে গাড়িওয়ালা হয়ে। তারপর থেকে এখানেই আছি, আর কিছুই হই নি। পরিবর্ত্তনে আমার নিজের পক্ষে খুব বেশি ভাল কিছু করি নি। আমার একমাত্র সম্পত্তি হচ্ছে ঘোড়াটি। ওটা আমাকে কাউনটেসটির কথা মনে করিয়ে দেয়।”

ঘোড়াটি ছিল বুড়ো ও সাদা রঙের; কিন্তু একদিন এক মাতাল রাজমিস্ত্রি সেটাকে নানা রঙে রঙিয়ে তুল্‌তে আরম্ভ করে। কাজটা অবশ্য সে শেষ করে না। ঘোড়াটার পা চারখানা গিয়ে ছিল গ্রন্থি থেকে খুলে। সেইজন্য দেখাতো যেন কতকগুলো ন্যাকড়া এক সঙ্গে সেলাই করা। তার নিষ্প্রভ চোখ দুটি শুদ্ধ হাড়-বার-করা মাথাটা যেন ফোলা ও পুরোনো, জীর্ণ চামড়া দিয়ে মৃতদেহটাতে হালকা ভাবে লাগানো ছিল। পিটার-খুড়ো অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে প্রাণীটির সেবা করতেন; আর তাকে ডাকতেন ‘তানকো’ বলে।

দাদামশায় একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করে ছিলেন, "তুমি ঐ জন্তুটাকে খ্রীষ্টান নামে ডাকো কেন ?"

—তিনি বলেন, "না, বাসিলি বাসিলেফ, ওরকম কিছুই করি না—সম্মান করে বলে থাকি। তানকা বলে কোন খ্রীষ্টান নামে নেই—'ভাসিয়ানা' আছে।"



পিটার-খুড়ো ছিলেন শিক্ষিত। তাঁর পড়াশুনো ছিল অনেক। কোন সাধু-মহাত্মা সব চেয়ে বেশি পবিত্র এই নিয়ে তিনি আর দাদামশায় তর্ক করতেন। কখন কখন তর্কটা হ'ত সম্পূর্ণ ব্যাকরণ-গত।...তিনি সাধারণত বাচাল, সৎপ্রকৃতি ও আমুদে হলেও এমন এক এক সময় আসতো যখন তাঁর চোখ দুটো হ'ত মরা মানুষের মতো লাল ও স্থির। তিনি তখন তাঁর ভাইপোর মতো এক কোণে জড়সড় হয়ে বিষণ্ণ মৌন মূর্ত্তিতে বসে থাকতেন।

জিজ্ঞেস করতাম, "আপনার কি হয়েছে পিটার-খুড়ো ?"

তিনি মুখ কালো করে কঠোর ভাবে বল্‌তেন, "আমার কাছ থেকে সরে যাও !"

আমাদের রাস্তার ছোট ছোট বাড়িগুলোর একখানিতে একটি ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর কপালে ছিল একটি আব, এবং কতকগুলি অভ্যাস ছিল অসাধারণ। রবিবারে জান্‌লায় বসে তিনি 'শট্‌-গান' দিয়ে কুকুর, বিড়াল, মুরগী, কাক, যা কিছু তাঁর সামনে পড়তো এবং যাকে তাঁর ভাল লাগতো না, তাকেই গুলি করতেন। একবার তিনি "ভাল-কাজের" পাঁজরায় গুলি করেছিলেন ; ছররাগুলো তাঁর চামড়ার কোটটা ভেদ করতে পারে নি, কিন্তু কতকগুলো পড়েছিল তাঁর পকেটে। সেই গাঢ়-নীল ছররাগুলোকে তিনি যে কৌতূহলের সঙ্গে পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁর সে মুখের ভাব

আমি কখন ভুলবো না। সে-বিষয়ে নালিশ করবার জন্য দাদামশায় তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ছররাগুলো রান্নাঘরের এক কোণে ছুড়ে ফেলে তিনি উত্তর দেন, "নালিশের যোগ্য নয়।"

আর একবার আমাদের সেই অব্যর্থ সন্ধানীটি দাদামশায়ের পায়ে কয়েকটি ছররা গেঁথে দিয়েছিলেন। দাদামশায় তাতে খুব রেগে কর্তৃপক্ষের কাছে একখানি দরখাস্ত লেখেন এবং সেই রাস্তায় আর যে-সব দুঃখ-ভোগী ও সাক্ষী ছিল তাদের সই সংগ্রহ করতে থাকেন, কিন্তু দোষীটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়।

পিটার-খুড়ো বাড়ি থাকলে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেই মাথাটা টুপি দিয়ে ঢেকে ফটকে ছুটে যেতেন। টুপিটার দুপাশে দুটো বড়-কান-ঢাকা ছিল। তিনি হাত দুখানা পিছনে কোটের লেজের তলায় লুকিয়ে লেজটা মোরগের মতো তুলে, পেটটা সামনের দিকে ঠেলে বার করে অব্যর্থ-সন্ধানীটির একেবারে কাছে পেভমেনটের ওপর গম্ভীর ভাবে গট্ গট্ করে পায়চারি করতেন। আমাদের বাড়ির সকলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতো। জানলায় সেই যোদ্ধা ভদ্রলোকটির রাঙা মুখখানা আর তাঁর কাঁধের ওপর তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর মাথাটি দেখা যেত; বেৎলেংগা হাউসের আঙিনা থেকে লোকে বেরিয়ে আসতো—কেবল ওব্সিয়ানিকফদের ছাই রঙের, প্রাণহীন বাড়িখানাতে প্রাণের কোন চিহ্ন দেখা যেত না।

পিটার-খুড়োর এই অভিযান কখন কখন হ'ত নিষ্ফল। শিকারী তাঁকে তাঁর গুলির যোগ্য শিকার বলেই মনে করতেন না। কিন্তু অন্য সময়ে দোনলা বন্দুকটা বার বার করতো—দুম্ দুম্।

পিটার-খুড়ো ধীরে সুস্থে আমাদের কাছে ফিরে এসে মহা আনন্দে বল্তেন, "ওর প্রত্যেকটা গুলিই ছুড়েছে মাঠের দিকে।"

একবার তাঁর কাঁধে ও ঘাড়ে কয়েকটা ছররা বেঁধে। দিদিমা সেগুলো ছুঁচ দিয়ে বার করে দেবার সময় তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "ঐ জানোয়ারটাকে তোমরা আস্কারা দাও কেন? একদিন তোমার চোখ কানা করে দেবে।"



পিটার-খুড়ো অবজ্ঞাভরে টেনে টেনে উত্তর দিয়েছিলেন, "অসম্ভব আকুলিনা আইভানোভনা। ও অনর্থ-সন্ধানীই নয়।"

—"কিন্তু ওকে আস্কারা দাও কেন?"

—"তুমি কি মনে করো আমি ওকে আস্কারা দিই? না! ভদ্র-লোকটিকে বিরক্ত করি।"

এবং হাতের তালুতে বার-করা গুলিটার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন, "ও অনর্থ-সন্ধানীই নয়। কিন্তু সেখানে, আমার মনিব কাউনটেস টাটিয়ান লেকসিয়েভ্নার বাড়িতে মারমনট ইলিচ নামে একজন সৈনিক থাকতো। গিন্নী তাকে সর্ব্বদা নিজের কাজেই ব্যস্ত রাখতেন। কিন্তু, দিদিমা, সে গুলি ছুড়তে জানতো বটে! সে বুলেট ছাড়া আর কিছুই ছুড়তো না। সে জড়বুদ্ধি ইগনাশকাকে তার কাছ থেকে চল্লিশ ধাপ কি ঐ রকম তফাতে দাঁড় করিয়ে রাখতো; আর তার বেল্টে বেঁধে দিত একটা বোতল। বোতলটা তার পায়ের ফাঁকে ঝুল্‌তো। ইগনাশ্‌কা পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসতো; আর মারমনট ইলিচ তার পিস্তল ছুড়তো—ফট—বোতলটা যেত ভেঙে গুঁড়িয়ে। একবার ইগনাশ্‌কা মাছি না কি যেন গিলে ফেলে চম্‌কে নড়ে ওঠে, আর বুলেটটা সোজা গিয়ে ঢোকে তার হাঁটুতে। তখনই ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার তার পাখানা খুলে নেন। এক মিনিটের মধ্যেই সব চুকে যায়। পাখানাকে কবর দেওয়া হয়…"

—"কিন্তু হাবাটার হল কি?"

—"ও সে! ঠিক ছিল। জড়-বুদ্ধি যে তার হাত-পায়ের কি দরকার? জড়-বুদ্ধিতার ফলে সে প্রয়োজনের বেশি খাদ্য-পানীয় পায়। প্রত্যেকেই জড়বুদ্ধিকে ভালোবাসে। তারা নিরীহ প্রকৃতির। জানো তো কথায় বলে, 'নিম্নপদস্থ লোক বোকাই ভাল, তারা বেশি ক্ষতি করতে পারে না।'

এই ধরনের কথা-বার্ত্তা দিদিমাকে আশ্চর্য্য করতো না। কেননা তিনি সে-সব শুনেছিলেন বহুবার, কিন্তু তাতে আমি অসোয়াস্তি বোধ করতাম। তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

"সেই ভদ্রলোকটি কি কাউকে খুন করতে পারবেন?"

—"কেন পারবেন না? নিশ্চ—য়ই পারবেন!···এমন কি একবার 'ডুয়েলও' লড়েছিলেন। টাটিয়ানা লেকসিয়েভনার কাছে একবার একজন আলহান এসেছিল। মারমনটের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। মুহূর্ত্তের মধ্যে তারা পিস্তল হাতে নিয়ে গেল পার্কে। সেখানে রাস্তার ওপর আলহানটি মারমটের লিভারের মধ্য দিয়ে গুলি চালিয়ে দিলে। তারপর মারমনটকে পাঠানো হল গির্জ্জার গোরস্থানে আর আলহান-টাকে পাঠানো হল, ককেসাসে···খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা যায় চুকে।···এখন তার কথা কেউ আর বলে না। লোকে তার জন্যে বেশি দুঃখ করে না; তার নিজের লোকে তারা কখন দুঃখও করে নি···তবুও এক সময়ে দুঃখ করতো—তার বিষয়ের জন্যে।"

দিদিমা বললেন, "তাহলে তারা বেশি দুঃখ করতো না।"

পিটার-খুড়ো তাঁর সঙ্গে একমত হলেন; বললেন, "তা ঠিক!··· তার বিষয়-সম্পত্তি···হাঁ, বিশেষ কিছু ছিল না।"

আমি যেন বয়স্ক ব্যক্তি এম্নি ভাব দেখিয়ে তিনি আমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতেন, তেম্নি ভাবে কথা-বার্ত্তা বলতেন, আমার চোখের

দিকে সোজা তাকাতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর চারধারে এমন কিছু ছিল যা আমি পছন্দ করতাম না। তিনি আমাকে আমার প্রিয় জ্যাম খাওয়াতেন এবং বাকি যেটুকু থাকতো সেটুকু আমার রুটিতে মাখিয়ে দিতেন। আমার জন্যে শহর থেকে আনতেন শুকনো আদা-রুটির গুঁড়ো। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন শান্ত ও গম্ভীর স্বরে।



“তুমি বড় হলে কি হবে? সামরিক বিভাগে বা অসামরিক বিভাগে ঢুকবে?”

—“সামরিক বিভাগে—সেনাদলে।”

—“ভাল! আজকাল সৈনিকের জীবন কঠোর নয়। পাদ্রিব জীবনও খারাপ নয়···তাঁকে করতে হয় কেবল মন্ত্র উচ্চারণ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা। তাতে বেশি সময় লাগে না। বাস্তবিক পক্ষে সৈনিকের চেয়ে পাদ্রির কাজ সহজ···কিন্তু জেলের কাজ আরও সহজ। ওতে কোন শিক্ষারই দরকার হয় না; ওটা হল কেবল অভ্যাসের ব্যাপার।”

মাছ কি করে টোপের চারধারে ঘুরে বেড়ায় তিনি তা মজার সঙ্গে নকল করে দেখাতেন। আর পারচ, মুগিল, ব্রীম মাছ বঁড়সিতে ধরা পড়লে কি রকম করে লাফায় তাও দেখিয়ে দিতেন।

তিনি সান্ত্বনামাখা সুরে বলতেন, “দাদামশায় তোমাকে বেত মারলে তুমি রাগ কর। কিন্তু বাবু, তাতে তোমার রাগ করবার কিছু নেই। বেতমারা হচ্ছে তোমার শিক্ষার একটি অংশ। তুমি যে-সব বেত খাও ও তো ছেলে-খেলা। আমার মনিব টাটিয়ান লেকসিয়েভনা কি রকম করে পিটতেন তোমার দেখা উচিত। তিনি ঠিক মতো মারতে পারতেন। বিশেষ করে সেজন্যেই তিনি একটি লোকও রেখেছিলেন। লোকটির নাম ছিল, খ্রীস্টোফার। সে এমন

ভাল করে তার কাজটি করতো যে আশ-পাশের জমিদার-বাড়ি থেকে কাউনটেসের কাছে তাঁরা খবর পাঠাতেন, “টাটিয়ানা লেকসিয়েভনা, আমাদের দ্বারোয়ানকে বেত মারবার জন্যে অনুগ্রহ করে খ্রীস্টোফারকে পাঠাবেন।’ আর, তিনি খ্রীস্টোফারকে ছেড়ে দিতেন।”

তাঁর নিজস্ব সাদা-সিধে বর্ণনা-ভঙ্গিতে তিনি বর্ণনা করতেন, কাউনটেস সাদা মসলিনের ফ্রক পরে, মাথায় খুব পাতলা ও আশমানী রঙের রুমাল বেঁধে একটা থামের পাশে সিঁড়ির ওপর লাল রঙের আরাম-চেয়ারে বসে কেমন ভাবে দেখতেন। আর খ্রীস্টোফার তাঁর সামনে চাষীদের মেয়ে-পুরুষকে বেত মারতো।

“এই খ্রীস্টোফারটা এসেছিল রিয়াজান থেকে। তাকে দেখাতো বেদের মতো। তার গোঁফজোড়া কান ছাড়িয়ে বেরিয়ে থাকতো। তার কুৎসিৎ মুখখানার যে-সব জায়গার দাড়ি কামাতো সে-সব জায়গার রঙ ছিল নীল। সে হয় ছিল বোকা অথবা বোকার ভান করতো যাতে তাকে বাজে প্রশ্ন করা না হয়। কখন কখন সে মাছি আর আরশুলা ধরবার জন্যে পেয়ালায় জল ঢাল্‌তো। তারপর সেগুলোকে আগুনে সিদ্ধ করতো।”

এই ধরনের অনেক গল্পের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। সেগুলো শুনেছিলাম দাদামশায় ও দিদিমার মুখে। গল্পগুলো বিভিন্ন হলেও সেগুলো অদ্ভুত রকমে ছিল এক ধরনের। প্রত্যেকটি গল্পেই ছিল লোককে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে, বিদ্রূপ করা হচ্ছে বা তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুন্‌তে শুন্‌তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম; শুন্‌তে আর ইচ্ছা হত না। তাই গাড়িওয়ালাটিকে একদিন বললাম, “আমাকে অন্য ধরনের গল্প বলুন।”

তিনি মুখ বিকৃত করে বিনীত কণ্ঠে বল্‌লেন, "আচ্ছা লোভী! একবার আমাদের একটা রাঁধুনি ছিল—"

—"কাদের ছিল?"

—"কাউনটেস্ টাটিয়ান লেকসিয়েভ্‌নার।"

—"আপনারা তাঁকে টাটিয়ান বলেন কেন? তিনি পুরুষ মানুষ ছিলেন না, ছিলেন কি?"



তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে উঠলেন।

"নিশ্চয়ই ছিলেন না। তিনি ছিলেন মহিলা। তবও তার গোঁফ-দাড়ি ছিল। তাঁর গায়ের রঙ ছিল কালো। এক কালো জার্মান বংশে তাঁর জন্ম হয়...তাঁরা হচ্ছেন নিগ্রো-জাতের লোক। হাঁ যা বলছিলাম, এই রাঁধুনিটা—গল্পটি মজার, বুঝলে বাবু।"

এই "মজার গল্পটি" ছিল এই যে, একবার রাঁধুনিটি মাছের একটা তরকারি নষ্ট করে ফেলে। তরকারিটা তাকেই খাওয়ান হয়: খেয়ে সে অসুখে পড়ে।

আমি রাগের সঙ্গে বললাম, "গল্পটা একটুও মজার নয়!"

—"মজার গল্প সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? বল! শোনা যাক্।"

—"জানি না।"

—"তাহলে চুপ করে থাকো," বলে তিনি আর একটি নীরস গল্প বল্‌লেন।

মাঝে মাঝে রবিবারে ও ছুটির দিনে, আমার মামাতো ভাইয়েরা, আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতো। সাস্‌কা মাইখেলফ ছিল অলস, বিষন্ন আর সাসকা জাকফ্ ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সবজান্তা। একবার আমরা তিনজনে ছাদে প্রমোদ ভ্রমণে গেলাম। সেখান থেকে দেখ্‌তে পেলাম, বেৎলেংগা হাউসের আঙিনায় একটা কাঠের গাদার

ওপর সবুজ রঙের ফার দেওয়া কোট গায়ে একটি ভদ্রলোক বসে কয়েকটি কুকুর ছানা নিয়ে খেলা করছেন। তাঁর ছোট, হল্‌দে রঙের কেশবিরল মাথাটিতে টুপি ছিল না। ভাইয়েদের মধ্যে একজন একটি কুকুরছানা চুরির প্রস্তাব করলে। তারা নিমেষে একটি কৌশলও উদ্ভাবন করে ফেল্‌লে। ঠিক করলে তারা নিচে রাস্তায় গিয়ে বেৎলেংগার আঙিনায় ঢোকবার পথে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, আর আমি ভদ্রলোকটিকে ভয় দেখাবার জন্য কিছু করবো। তিনি ভয়ে পালালেই তারা ছুটে আঙিনায় গিয়ে একটা কুকুর ছানা ধরবে।

—"কিন্তু আমি কেমন করে ওকে ভয় দেখাবো ?"

আমার মামাতো ভাইয়েদের মধ্যে একজন পরামর্শ দিলেন, "ওর টাকে থুথ্‌ ফেল।"

কিন্তু লোকের মাথায় থুথ্‌ ফেলা কি সাংঘাতিক পাপ নয় ? যাহোক আমি বার বার শুনে ছিলাম এবং স্বচক্ষে দেখেও ছিলাম যে, লোকে তার চেয়েও অনেক খারাপ কাজ করেছে। তাই আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার চুক্তির অংশ পালন করলাম; আর সচরাচর যেমন হয় তাতে সফলও হলাম।

ভয়ঙ্কর গোলমাল আরম্ভ হ'ল। স্ত্রী-পুরুষের একটি বাহিনী ছুটে বেরিয়ে এল বেৎলেংগা হাউসের আঙিনায়। তাদের আগে আগে এলেন এক প্রিয়দর্শন, তরুণ সামরিক কর্ম্মচারী। কাজটি যখন অনুষ্ঠিত হয় আমার মামাতো ভাইয়েরা তখন শান্ত ভাবে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা আমার উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় কিছুই জানতো না বলে, কেবল আমিই দাদামশায়ের হাতে মার খেলাম। তাতে বেৎলেংগা হাউসের বাসীন্দারা একেবারে সন্তুষ্ট হলেন।

সারা গায়ে মারের দাগ নিয়ে আমি রান্নাঘরে যখন পড়ে ছিলাম,

পিটার-খুড়ো তাঁর সব চেয়ে ভাল পোশাকটি পরে আমার কাছে এলেন। তাকে দেখাচ্ছিল ভারী খুশি।

তিনি আমার কানে কানে বললেন, "তোমার মতলবটা ছিল খাসা, বাবু। ঐ বেয়াকুব ধাড়ী ছাগলটা ওরই যোগ্য—গায়ে থুথু দেবার! পরের বার ওর পচা মাথাটায় ঢিল মের!"



আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, ভদ্রলোকটির গোলাকার, কেশবিরল, শিশুর মতো মুখখানি। মনে পড়লো, হলদে মাথাটা মুছতে মুছতে তিনি কুকুর-ছানার মতো কি রকম ক্ষীণ, কাতরস্বরে চীৎকার করে উঠেছিলেন। লজ্জায় ও আমার মামাতো ভাইয়েদের প্রতি ঘৃণায় অভিভূত হয়ে পড়লাম। কিন্তু গাড়িওয়ালাটির কুঞ্চিত মুখ-খানার দিকে তাকিয়ে সে কথা গেলাম ভুলে। তার মুখখানা তখন হয়ে উঠেছিল দাদামশায় যখন আমাকে মারতেন তখনকার মতো।

বলে উঠলাম, "দূর হও।" এবং তাঁকে লাথি ও ঘুষি মারলাম।

তিনি মুখ টিপে হাসলেন; এবং ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে চোখের ইসারা করে ঘর থেকে গেলেন বেরিয়ে।

তখন থেকে তার সঙ্গে আমার কথবার্ত্তা বলার ও মিশবার ইচ্ছাটা চলে গেল। প্রকৃতপক্ষে, আমি তাঁকে এড়িয়ে চল্‌তে লাগলাম। তবুও তাঁর চলা-ফেরা দেখতে লাগলাম সন্দেহের সঙ্গে। মনে কেমন এক আব্‌ছা ধারণা জন্মালো যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু একটা আবিষ্কার করবো। বেৎলেংগা হাউসের সেই ভদ্রলোকটি সংক্রান্ত ঘটনাটির পর, আর এক ব্যাপার ঘটলো। ওবসিয়ানিকফ-হাউস সম্বন্ধে অনেক দিন ধরে আমার কৌতূহল ছিল। মনে হ'ত, তার ছাইরঙের বহির্ভাগটার অন্তরালে লুকানো আছে এক রহস্যময় কাহিনী।

বেৎলেংগা হাউসটি সব সময় থাকতো হল্লা ও আমোদ-প্রমোদে

মশগুল। সেখানে অনেক সুন্দরী মহিলা থাকতেন। তাদের কাছে আসতো বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারী ও ছাত্রেরা। সেখান থেকে অনবরত হাসির ও গানের শব্দ, সঙ্গীত-যন্ত্রের আওয়াজ আসতো। জানলায় ঝকঝকে সাসি বসানো সেই বাড়িখানার সামনেটাও দেখাতো আনন্দে ভরা।



দাদামশায় তা পছন্দ করতেন না। বাড়িখানার বাসীন্দাদের সম্বন্ধে তিনি বলতেন, “ওরা বিধর্ম্মী···ওদের সকলেই নাস্তিক।” আর বাড়ির স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে অপ্রীতিকর শব্দ ব্যবহার করতেন।···

কিন্তু কঠোর, নীরস ওবস্নিয়াকফ হাউসটা দাদামশায়ের সম্ভ্রম জাগাতো।

এই একতলা উঁচু বাড়িখানি ছিল ঘাসে ঢাকা একখানি মাঠের একধারে। মাঠখানি ছিল শূন্য; কেবল তার মধ্যখানে ছিল একটি কুয়া। কুয়াটির দুপাশে ছিল দুটো খুঁটি। খুঁটি দুটোর মাথায় ছিল একখানি চাল। বাড়িখানা যেন রাস্তার কাছ থেকে লুকোবার ইচ্ছায় সরে গিয়েছিল। তার ছেনি-দিয়ে-কাটা দুটো জানলা মাটি থেকে ছিল কতকটা উঁচুতে। তার ধুলোমাখা সাসি দুখানার গায়ে রৌদ্র পড়ে তাতে রামধনুর রঙ ফুটে উঠতো। ফটকটার আর একধারে ছিল একটি ভাণ্ডার-গৃহ। সেটির সামনেটা ছিল ঠিক বাড়িখানার মতো। এমন কি তার জানলা তিনটেও ছিল সেই রকম। তবে জানলা তিনটি আসল ছিল না ছিল নকল। জানলা তিনটিকে দেখলে মনে কেমন একটা অশুভ ভাব জাগতো। মনে হত শূন্য আস্তাবল ও প্রশস্ত দরজা শূন্য গাড়ি রাখবার ঘরখানা সুদ্ধ সমস্ত বাড়িখানাতেই যেন রয়েছে একটা চাপা রাগ বা গুপ্ত অহঙ্কার।

কখন কখন দেখা যেত এক দীর্ঘাকার বৃদ্ধ খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠে

ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর গোঁফগুলো মুখের দুপাশে শক্ত ছুঁচের মতো বেরিয়ে থাকতো। আর এক সময়ে অপর একটি বৃদ্ধ আস্তাবল থেকে একটি ধূসর রঙের লম্বা গলা ঘোটকীকে বার করে আনতেন। বৃদ্ধটির মুখে ছিল দাড়ি-গোঁফ ; নাকটা ছিল বাঁকা। ঘোটকীটার বুকটা ছিল সংকীর্ণ, পা চারখানা সরু। সে মাঠে বেরিয়ে এসেই 'নানের' মতো যেন অন্ত্যেষ্টি সংকার করছে এমনিভাবে হাঁটু নুইয়ে মাটি আঁচড়াতো। খণ্ডটি শিস দিতে দিতে ঘোটকীটির গলায় থাপ্পড় দিতেন। তারপর তাকে অন্ধকার আস্তাবলটির মধ্যে আবার নিয়ে যাওয়া হত। আমি ভাবতাম, বৃদ্ধটি যেন বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চাইছেন, কিন্তু তাঁকে গুণ করা হয়েছে বলে যেতে পারছেন না।

এক ধরনের পোশাক, ধূসর রঙের কোট ও পা-জামা পরে, তিনটি ছেলে প্রায় প্রত্যহ দুপুর থেকে সন্ধ্যা অবধি মাঠে খেলা করতো। তারা তিনজনে টুপিও পরতো একই রকমের। তাদের তিনজনেরই মুখ ছিল গোল, চোখ ধূসর। তিনজনের চেহারায় ছিল এমন মিল যে, আমি কেবল উচ্চতা দেখে একজনকে আর একজন থেকে চিনতে পারতাম।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমি তাদের দেখতাম। তারা আমাকে দেখতে পেত না, কিন্তু আমি চাইতাম যে, আমি যে সেখানে আছি তারা তা জানুক। তারা যে-ভাবে আনন্দে ও মিলেমিশে খেলা করতো আমি তা পছন্দ করতাম। খেলাগুলো আমি জানতাম না। আমি তাদের বেশভূষা পছন্দ করতাম এবং তারা পরস্পরের প্রতি যে-রকম বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করতো আমার তা ভালো লাগতো। সেটা বিশেষ করে দেখা যেত, ছোট ভাইটির প্রতি বড় ভাই দুটির ব্যবহারে। ছোট ভাইটি ছিল ভারী মজার। দেখতে ছোট্ট কিন্তু প্রাণে একেবারে ভরা।

সে পড়ে গেলে তারা হেসে উঠ্‌তো। কেউ পড়ে গেলে হাসা ছিল তাদের রীতি। কিন্তু তাদের হাসিতে কোনো বিদ্বেষ ছিল না। তারা তাকে সাহায্য করতে তখনই ছুটে যেত। সে যদি হাতে ও হাঁটুতে ধুলো-কাদা মাখতো তাহলে তারা গাছের পাতা বা রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিত; আর মেজ ছেলেটি বিদ্বেষশূন্য অন্তরে বলে উঠতো, "নোঙরা!"



তারা কখনো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতো না, পরস্পরকে ঠকাতো না; এবং তিনজনেই ছিল চটপটে, বলিষ্ঠ ও অদম্য।

একদিন আমি একটা গাছে উঠে তাদের উদ্দেশ্যে শিষ দিলাম। তারা ক্ষণিকের জন্য পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালো। তারপর শান্তভাবে পরস্পরের কাছে সরে গেল এবং ওপরে আমার দিকে তাকিয়ে স্থিরভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলো। তারা আমাকে ঢিল মারতে যাচ্ছে মনে করে আমি মাটিতে নেমে পড়লাম। এবং পকেটগুলোতে ঢিল পুরে আবার উঠলাম গাছে। কিন্তু তারা তখন আমার কাছ থেকে অনেকটা দূরে মাঠের এক কোণে খেলা করছিল। স্পষ্টত আমার কথা গিয়েছিল ভুলে। তাতে আমি খুব দুঃখিত হলাম। কারণ প্রথমত, আমার ইচ্ছা ছিল না যে, আগে আমি যুদ্ধ শুরু করি; দ্বিতীয়ত, ঠিক সেই মুহূর্তে কে একজন জান্‌লা থেকে বলে উঠলো, "ছেলেরা, তোমাদের এঁখন ভেতরে আস্‌তে হবে।"

তারা তাড়াতাড়ি না করে নম্রভাবে হাঁসের মতো এক 'ফাইলে' চলে গেল।

বেড়ার ওপর গাছে আমি প্রায়ই মনে আশা নিয়ে বসে থাকতাম, যে, তারা আমাকে তাদের সঙ্গে খেল্‌তে বলবে। কিন্তু তারা কখন ডাকতো না। তবে মনে মনে আমি তাদের সঙ্গে খেলতাম; এবং তাদের খেলায় এমন মুগ্ধ হয়ে যেতাম যে, কখন কখন চীৎকার করতাম

ও জোরে হেসে উঠতাম। তাতে তিনজনেই আমার দিকে তাকাতো এবং নিজেদের মধ্যে ধীর ভাবে আলোচনা করতো; আর আমি বিস্ময়ের মতো মাটিতে নেমে পড়তাম।



একদিন তারা লুকোচুরি খেলছিল। মেজভাইটির লুকোবার পালা এলে সে ভাণ্ডারগৃহটির কোণে দাঁড়িয়ে সততার সঙ্গে চোখ বন্ধ করলে, একবারও উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে না। আর অন্য ভাইয়েরা ছুটলো লুকোতে। ভাণ্ডার-গৃহের ছাপ্পড়ে যে-চওড়া শ্লেজটা ছিল বড় ভাইটি লঘু ও দ্রুত পদে ছুটে তার ওপর উঠলো, কিন্তু ছোট ভাইটি বড় মজা করে কুয়াটার চারধারে ঘুরতে লাগলো; কোথায় যে লুকোবে স্থির করতে পারলো না।

বড়টি চীৎকার করে বলে উঠলো, "এক—দুই—"

ছোট ভাইটি লাফ দিয়ে কুয়ার পাড়ে উঠে দড়িটা চেপে ধরে বালতিটির মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। বালতিটাও তৎক্ষণাৎ পাড়ে ঢক করে একটা আওয়াজ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। বেশ-করে তেল-দেওয়া চাকাখানা কি রকম তাড়াতাড়ি ঘুরে গেল তা দেখে আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম; কিন্তু মুহূর্তে ব্যাপারটা অনুধাবন করে মাঠে নেমে চীৎকার করে উঠলাম, "ও কুয়োয় পড়ে গেছে!"

মেজভাইটি ও আমি এক সঙ্গে গিয়ে পৌছলাম কুয়াটার ধারে। সে দড়িটা চেপে ধরলে; কিন্তু দড়িটা তাকে ওপরে টেনে তুলছে বুঝে হাত ছেড়ে দিলে। আমি ঠিক সময়ে দড়িটা চেপে ধরলাম। বড় ভাইটি তখন এসে পড়েছিল। বালতিটা টেনে তুলতে আমাকে সাহায্য করতে করতে বললে, "আস্তে টানো।"

আমরা ছোট ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি টেনে তুললাম। সে ভয় পেয়ে ছিল খুবই। তার ডান হাতের আঙুলে ছিল ফোঁটা ফোঁটা রক্ত,

গালটি গিয়েছিল সাংঘাতিক ছড়ে। তার কোমর অবধি ভিজে গিয়েছিল, মুখখানি হয়ে উঠেছিল নীল। কিন্তু সে হাসলো, তারপরই কেঁপে উঠলো এবং চোখ দুটি চেপে বন্ধ করলো। তারপর আবার হেসে ধীরে বললে, "যা—হোক আমি প—ড়ে গিয়েছিলাম ?"



মেজ ভাইটি তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রুমালে তার মুখের রক্ত মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, "তুমি পাগল হয়ে ছিলে তাই এ রকম কাজ করেছ।"

বড় ভাইটি ভ্রূকুটি করে বললে, "আমাদের ভেতরে যাওয়া ভাল। কোন রকমেই আমরা এটি লুকোতে পারবো না।"

জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাদের কি বেত মারা হবে ?"

সে মাথা নেড়ে জানালো, হাঁ। তারপর হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে, "তুমি কত তাড়াতাড়ি এখানে ছুটে এসেছিলে।"

তার প্রশংসায় আমি খুশি হলাম ; কিন্তু তার হাত ধরবার অবসর আমার হল না। কেননা সে ভাইদের সঙ্গে কথা বলতে ফিরে দাঁড়ালো।

"চল ভেতরে যাই ; না গেলে ওর সর্দ্দি হবে। আমরা বলবো ও পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু কুয়োটার কথা আমাদের বলবার দরকার নেই।"

ছোটটি কাঁপতে কাঁপতে বললে, "না, আমরা বল্‌বো আমি খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, বলবো কি ?"

তারা চলে গেল।

ব্যাপারটি এত তাড়াতাড়ি ঘটে ছিল যে, যে-ডালটি থেকে আমি লাফ দিয়ে নেমে ছিলাম, ফিরে দেখলাম, সেটি তখনও দুল্‌ছে আর তা থেকে হলদে পাতাগুলো টুপ টাপ করে পড়ছে।

ভাই তিনটি এক সপ্তাহ আর মাঠে এল না। এবং যখন এল তখন তারা আগের চেয়ে আরও হট্টগোল করতে লাগলো। বড় ভাইটি আমাকে গাছে দেখে কোমল কণ্ঠে বললে, "এস, আমাদের সঙ্গে খেলা করো।"



আমরা সকলে ভাণ্ডার-গৃহের চালের নিচে পুরোনো শ্লেজটার ভেতর জড় হলাম। প্রত্যেকে গম্ভীর ভাবে পরস্পরকে লক্ষ্য করে অনেকক্ষণ কথা-বার্তা বললাম।

জিজ্ঞেস করলাম, "ওরা কি তোমাদের বেত মেরেছিল ?"

—"কতকটা!"

আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হল যে, সেই সব ছেলেকে আমার মতো বেত মারা হয়েছে। তাদের জন্যে মনে দুঃখ হল।

সব চেয়ে ছোটটি জিজ্ঞেস করলে, "তুমি পাখী ধর কেন ?"

—"কারণ ওদের গান শুনতে ভালোবাসি।"

—"কিন্তু ওদের তোমার ধরা উচিত নয় ; ওদের ইচ্ছেমতো উড়ে বেড়াতে দাও না কেন ?"

—"দেব না, বুঝলে ?"

—"তাহলে একটা ধরে আমাকে দেবে কি ?"

—"তোমাকে ?... কি রকমের ?"

—"বেশ চটপটে, খাঁচায় করে।"

—"সিসকিন-পাখি...তুমি তাই চাও।"

—"বিড়ালে পাখিটাকে খেয়ে ফেল্‌বে। তা ছাড়া, বাবা পাখিটা নিতে দেবেন না।"

বড়টি বললে, "না, নিতে দেবেন না।"

জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাদের মা আছে ?"

বড়টি বললে, "না।"

কিন্তু মেজটি তার কথা সংশোধন করে বল্‌লে, "আমাদের মা আছেন, কিন্তু তিনি আমাদের সত্যিকারের মা ন'ন। আমাদের মা মারা গেছেন।"



—"তাকে সৎমা বলা হয়?"

—"হাঁ।"

এবং তিনজনকেই দেখাতে লাগলো গম্ভীর। তাদের মুখ কালো হয়ে উঠলো। দিদিমা আমাকে যে-সব গল্প বলতেন, আমি তা থেকে জানতাম সৎমা কি। তাই তাদের হঠাৎ গাম্ভীর্য্যের কারণ বুঝতে পারলাম। তারা শুঁটির মধ্যে মটরের দানার মতো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে রইলো। মনে পড়ে গেল, সেই ডাইনী-সৎমা যে-কৌশলে আসল মায়ের স্থান দখল করে ছিল তার কথা।

তাদের আশ্বাস দিয়ে বললাম, "তোমাদের আসল মা তোমাদের কাছে আবার ফিরে আসবেন, দেখ যদি না আসেন।"

বড় ছেলেটি কাঁধ সঙ্কুচিত করলে।

—"মরে গেলে তিনি আসবেন কি করে? এ রকমের ব্যাপার ঘটে না।"

—"ঘটে না? ভগবান! কতবার মৃতেরা, তাদের একেবারে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হলেও, দেখা গেছে প্রাণসঞ্চারী জলের ছিটে দিতেই আবার বেঁচে উঠেছে। কত দেখা গেছে মৃত্যুটা আসলও হয় নি বা সেটা ভগবানেরও কাজ নয়, কেবল গুণীন বা ডাইনীর মন্ত্রের ফল?"

উত্তেজিত হয়ে দিদিমার গল্পগুলো বল্‌তে আরম্ভ করলাম; কিন্তু বড়টি প্রথমে হেসে উঠে চাপা গলায় বললে, "ঐ সব রূপকথা আমরা জানি!"

তার ভাইয়েরা নীরবে শুন্‌তে লাগলো। ছোটটি ঠোঁট দুখানা চেপে বন্ধ করে, গাল ফুলিয়ে, আর মেজ ভাইটি হাঁটুতে কনুইয়ের ভার দিয়ে তার ভাইয়ের যে হাতখানা তার গলা জড়িয়ে ছিল সেখানা ধরে।



তখন গোধূলি বেলা ; বাড়ির চালের ওপর ভাস্‌ছে রক্ত মেঘদল। এমন সময় আমাদের সামনে হঠাৎ এলেন সেই সাদা গোঁফ বৃদ্ধ ; গায়ে পাদ্রির মতো দারুচিনির রঙের লম্বা পোশাক, মাথায় কর্কশ লোমের টুপি।

তিনি আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এ কে ?"

বড় ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে দাদামশায়ের বাড়ির দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, "ও ও-বাড়ির ছেলে।"

—"ওকে এখানে কে ডেকেছে ?"

ছেলে কয়টি নীরবে শ্লেজ থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকে গেল ! তাদের দেখে আমার একঝাঁক হাঁসের কথা মনে পড়লো।

বৃদ্ধ আমার কাঁধটা সাঁড়াশির মতো করে চেপে ধরে আমাকে ঠেলে নিয়ে গেলেন ফটকে। ভয়ে আমার কান্না পেতে লাগলো ; কিন্তু তিনি আমাকে এত লম্বা পায়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে চললেন যে, রাস্তায় পৌঁছবার আগে আমি কাঁদবার সময়ই পেলাম না। তিনি ছোট ফটকটিতে দাঁড়িয়ে আমাকে আঙুল তুলে শাসিয়ে বললেন, "আর কখন এখানে আসবার স্পর্দ্ধা যেন না হয় !"

আমি ভয়ানক রেগে উঠলাম ; বললাম। "আমি কখন তোমার কাছে ঘেষতে চাই নি, বুড়ো শয়তান কোথাকার।"

আবার তিনি আমাকে লম্বা হাতে চেপে ধরলেন। এবং পেভ-মেনটের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "তোমার দাদামশায় বাড়ি আছেন ?"

তাঁর গলার স্বর শুনে মনে হল, যেন তিনি আমায় হাতুড়ি দিয়ে ঘা মারছেন।



আমার পক্ষে দুঃখের বিষয় যে দাদামশায বাড়িতেই ছিলেন। তিনি সেই ভীষণ বৃদ্ধটির সম্মুখে মাথাটি পিছন দিকে হেলিয়ে দাড়িগুলো সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁর নিষ্প্রভ, গোল, মাছের মতো চোখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, "দেখুন, ওর মা এখানে থাকে না। আমিও কাজে ব্যস্ত থাকি, কাজেই ওকে দেখবার কেউ নেই। আশা করি, কর্নেল, এবারটা ওকে ছেড়ে দেবেন।"

কর্নেল পাগলের মতো প্রলাপ বকতে বকতে পা ঠুকে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন; এবং তিনি চলে যেতে না যেতেই আমাকে পিটার-খুড়োর গাড়ির ওপর ফেলে দেওয়া হ'ল।

ঘোড়াটাকে ব্যোম থেকে খুলতে খুলতে খুড়ো জিজ্ঞেস করলেন, "বাবু, আবার গোলমালে পড়েছো? এখন তোমাকে কিসের জন্যে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে?"

আমি তাকে ব্যাপারটি বলতেই তিনি জ্বলে উঠলেন। "ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও কেন? সাপের বাচ্চাগুলো! দেখ, ওরা তোমার ক করেছে' এবার তোমার পালা ওদের মার দেওয়া। দেওয়া চাই।"

অনেকক্ষণ ধরে তিনি এই ভাবে ফিস্‌ফিস্ করলেন। মারের ফলে আমার সর্ব্বাঙ্গে দাগ পড়ে ছিল; তাই প্রথমে তাঁর কথা শোনবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁর কুঞ্চিত মুখখানা এমন ভাবে কাঁপছিল যে, প্রতি মুহূর্ত্তে তা হয়ে উঠছিল বিশ্রী। তাতে মনে পড়ছিল, সেই ছেলে কয়টিও মার খাবে, আমার মতে অকারণে।

বললাম, "ওদের বেত মারা উচিত নয়। কারণ ওরা সকলেই

ভাল। আর আপনার কথা, আপনি যা বলেন তার প্রত্যেকটি মিথ্যে।"

তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং কোন রকম ভণিতা না করেই বলে উঠলেন, "আমার গাড়ি থেকে নেমে যাও!"

মাটিতে লাফ দিয়ে নেমে চীৎকার করে উঠলাম, "আহাম্মক!"

তিনি আমার পিছনে ছুটতে ছুটতে চীৎকার করতে লাগলেন, "আমি বোকা, আহাম্মক? আমি মিছে কথা বলি? দাঁড়াও তোমায় ধরি আগে!"

কিন্তু তিনি আমাকে ধরতে পরলেন না। সেই মুহূর্তে দিদিমা বেরিয়ে এলেন; আমি ছুটে গেলাম তাঁর কাছে।

পিটার-খুড়ো তাকে বললেন, "এই ক্ষুদে হতভাগাটা আমাকে অস্থির করে তুলেছে! আমি বয়সে ওর চেয়ে পাঁচগুণ বড় তবুও আমাকে অপমান করতে, গাল দিতে সাহস করে…আমার মাকেও… সকলকেই।"

তাঁর এই রকম নির্লজ্জ কথা শুনে আমি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারিয়ে ফেললাম। তাঁর দিকে নির্বোধের মতো তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না। কিন্তু দিদিমা কঠোর স্বরে উত্তর দিলেন, "পিটার, তুমি যে এখন মিছে কথা বলছো এতে আর সন্দেহ নেই। ও তোমাকে কি কাউকেই অপমান করবে না।"

দাদামশাই গাড়িওয়ালাটাকে বিশ্বাস করতেন!

সেদিন থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে শুরু হল এক নীরব কিন্তু তিক্ত দ্বন্দ্ব। তিনি আমাকে তাঁর ঘোড়ার লাগাম দিয়ে মারবার চেষ্টা করতেন কিন্তু ভাব দেখাতেন ভাল মানুষের মতো; খাঁচা খুলে

আমার পাখীগুলো উড়িয়ে দিতেন ; কখন কখন বিড়ালে সেগুলোকে ধরে খেয়ে ফেল্‌তো। এবং যখনই সুবিধা পেতেন দাদামশায়ের কাছে আমার নামে নালিশ করতেন। আর দাদামশায় তা বিশ্বাসও করতেন। তাঁর সম্বন্ধে আমার প্রথমে যে ধারণা হয়েছিল সেটা দৃঢ় হল—তিনি বৃদ্ধের ছদ্মবেশে আমারই মতো বালক। আমিও তাঁর গাছের ছালের জুতোর বিননী খুলে দিতাম অথবা ভেতরে একটু কেটে রাখতাম, যাতে জুতো জোড়া পায়ে দিলেই তৎক্ষণাৎ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। একদিন আমি তাঁর টুপিতে একটু লঙ্কার গুঁড়ো রেখে দিলাম। তার ফলে তিনি পূরো একটি ঘণ্টা ধরে হাঁচলেন। আর হাঁচির জন্য যাতে তাঁর কাজ বন্ধ না থাকে তারও চেষ্টা করতে লাগলেন।



রবিবারে তিনি আমার ওপর নজর রাখতেন এবং যা আমার করা বারণ ছিল—ওবসিয়ানিকফদের সঙ্গে কথা বলা—তা বহুবার ধরতেন এবং দাদামশায়ের কাছে সে কথা লাগাতেন।

ওবসিয়ানিকফদের সঙ্গে আমার আলাপটা ক্রমেই বেশ এগিয়ে যাচ্ছিল ; আমি তাতে আরও খুশি হয়ে উঠছিলাম। দাদামশায়ের বাড়ি ও ওবসিয়ানিকফদের বেড়ার মাঝখানে ছিল একটা আকা-বাঁকা পায়ে চলা পথ। সেখানে ছিল কতকগুলো এম ও লিনডেন গাছ এবং এলডারের কয়েকটা ঘন ঝোপ। তার আড়ালে বেড়ার গায়ে একটি অর্দ্ধ চন্দ্রাকার গর্ত্ত কেটে ছিলাম। তিনটি ভাই পালা করে বা দুজন এক সঙ্গে সেখানে আসতো এবং গর্ত্তটার ধারে উবু হয়ে বা হাঁটু গেড়ে বস্‌তো। আমরা চাপাগলায় সেখানে অনেকক্ষণ আলাপ করতাম। একজন পাহারা দিত পাছে কর্নেল এসে পড়েন।

তারা আমাকে বলতো কি দুঃখের তাদের জীবন। তাদের

কথা শুনে আমার মনে কষ্ট হ'ত। তারা আমার খাঁচার পাখিগুলোর ও নানা শিশু-সুলভ ঘটনার গল্প করতো ; কিন্তু তারা কখনও তাদের বিমাতা বা পিতার কথা বল্‌তো না, অন্তত যতদূর আমার মনে পড়ে। তারা আমাকে প্রায়ই গল্প বলতে বলতো ; আর আমি তাদের কাছে দিদিমার গল্পগুলো হুবহু বলতাম। যদি বলতে বলতে কিছু ভুলে যেতাম, তাদের অপেক্ষা করতে বলে দিদিমার কাছে ছুটে গিয়ে ভোলা কথাগুলো মনে করিয়ে নিতাম। তাতে দিদিমা খুশি হতেন।



আমি তাদের কাছে দিদিমার বিষয় অনেক কথা বলতাম। একবার বড় ছেলেটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করে ছিল, "তোমার দিদিমাকে সব দিক দিয়েই ভাল বোধ হয়...এক সময়ে আমাদেরও দিদিমা ছিল।"

সে এইভাবে প্রায়ই দুঃখের সঙ্গে কথা বল্‌তো ; এবং যে-সব ব্যাপার অতীতে ঘটেছিল সে-সবের কথা বলতো যেন সে এগার বছর নয় এক শ' বছর ধরে বেঁচে আছে। মনে পড়ে তার হাত দুখানি ছিল সরু, আঙুলগুলি শীর্ণ, দুর্ব্বল ; চোখ দুটি ছিল গির্জ্জার প্রদীপের মতো কোমল ও উজ্জ্বল। তার ভাইয়েরাও ছিল কমনীয় ; কিন্তু বড়টিই ছিল আমার প্রিয়।

প্রায়ই আমি কথা-বার্ত্তায় এমন ডুবে থাকতাম যে, পিটার-খুড়ো আমাদের একেবারে কাছে না এসে পড়লে তাঁকে দেখতেই পেতাম না। তাঁর গলার স্বরে আমরা চারধারে ছিটকে যেতাম। তিনি বলে উঠতেন, "আ—বা-র !"

আমি লক্ষ্য করেছিলাম, তাঁর মৌনতা ও বিষণ্ণভাবটা ক্রমেই যেন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এবং তিনি যখন কাজ থেকে ফিরতেন আমি একটি বারের দৃষ্টিতেই বুঝে নিতে শিখেছিলাম তিনি কি রকম মেজাজে আছেন।...

কিছুকাল আগে তাঁর বোবা ভাইপোটির বিবাহ হয়েছিল। সে গ্রামে বাস করতে গিয়েছিল। তাই পিটার-খুড়ো একাই আস্তাবলের জানলা-ভাঙা নিচু ঘরখানাতে থাকতেন। সেই ঘরে ছিল চামড়া, আলকাতরা, ঘাম ও তামাকের ঝাঁঝাল গন্ধ। সেইজন্য তাঁর ঘরে আমি ঢুকতাম না। তিনি আলো জ্বেলে রেখে ঘুমোতে আরম্ভ করেছিলেন। দাদামশায় তাঁর এই অভ্যাসে বিষম আপত্তি করতেন। বলতেন,

—"তুমি আমাকে পুড়িয়ে মারবে পিটার।"

—"না, মারবো না। ভাববেন না। রাত্রে একটা জলের পাত্রের মধ্যে আলোটা রাখি।" খুড়ো কথাগুলি বলতেন অপাঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে।

মনে হত তিনি যেন প্রত্যেককেই অপাঙ্গে লক্ষ্য করছেন। অনেকদিন আগেই তিনি মজলিশে আসা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মুখখানি যেন আরও কুঁকড়ে গিয়েছিল এবং তার ওপর বার্দ্ধক্যের রেখাগুলি যেন হয়েছিল আরও গভীর।...

একদিন সকালে দাদামশায় ও আমি আঙিনার তুষার পরিষ্কার করছি। আগের রাতে প্রবল তুষার পাত হয়েছিল। এমন সময় ফটকের আঙটাটায় খটাং করে শব্দ হল আর একটা কনষ্টেবল এসে আঙিনায় ঢুকে পিঠ দিয়ে ফটকটা ঠেলে বন্ধ করে একটা মোটা আঙুল নেড়ে দাদামশায়কে ডাকলে। দাদামশায় তার কাছে গেলে সে এমন ঝুঁকে দাঁড়ালো যে, ঠিক দেখাতে লাগলো যেন তার লম্বা নাকটা দাদামশায়ের কপালখানা ছেনি দিয়ে কাটছে। সে দাদামশায়কে কি বললে, কিন্তু এমন খাটো গলায় যে, আমি তার কথাগুলো শুনতে পেলাম না। দাদামশায় তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, "এখানে?

কখন ? ভগবান !" এবং তিনি এমনভাবে লাফিয়ে উঠলেন যে দেখে হাসি পেল। সেই সঙ্গে আবার বললেন, "ভগবান আমাদের মঙ্গল করুন ! এ কি সম্ভব ?"



কনেষ্টবলটা কঠোর ভাবে বললে, "অত চেঁচিও না।"



দাদামশায় ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেলেন ; বললেন, "কোদাল রেখে ভেতরে যাও।"



আমি এক কোণে লুকিয়ে রইলাম ; এবং সেখানে থেকে তাঁকে আর কনষ্টেবলটাকে গাড়িওয়ালাটার আস্তাবলে যেতে দেখলাম। কনষ্টেবলটা তার ডান হাতের দস্তানাটা খুলে বাঁ হাতের চেটোয় ঘা মেরে বললে, "সে জানে আমরা তার পেছনে লেগেছি। সে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে এইখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে।"

দিদিমাকে সব কথা বলবার জন্য আমি ছুটে রান্নাঘরে গেলাম। তিনি রুটির জন্য ময়দা ছানছিলেন। তিনি আমার কথা শুনতে লাগলেন, আর তাঁর ময়দামাখা হাত দুখানা উঠতে পড়তে লাগলো। তারপর শান্ত ভাবে বললেন, "মনে হয় ও কিছু চুরি করছিল। তুমি এখন পালাও, তোমার তাতে কি ?"

আমি আবার যখন আঙিনায় বেরিয়ে গেলাম, দেখলাম দাদামশায় টুপি খুলে আকাশের দিকে চোখ তুলে ফটকে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখের রাগের চিহ্ন ; রাগে তাঁর শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠছিল ; একখানা পা কাঁপছিল।

তিনি পা ঠুকে চীৎকার করে উঠলেন। "আমি তোমাকে ভেতরে যেতে বলেছি !" কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে এসে ডাকলেন, "মা, এখানে এস !"

দুজনে পাশের ঘরে গিয়ে বহুক্ষণ ফিসফিস্ করে আলোচনা

করলেন ; কিন্তু দিদিমা যখন রান্নাঘরে ফিরে এলেন, তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম, ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাকে এমন ভয়বিহ্বল দেখাচ্ছে কেন?"

তিনি শান্ত ভাবে বললেন, "চুপ্ করে থাক।"



সারাদিন বাড়িতে একটা থমথমে ভাব লেগে রইলো। দাদামশায় ও দিদিমা ঘন ঘন অশান্ত দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগলেন ; একসঙ্গে আস্তে আস্তে দুর্বোধ্য ভাষায় সংক্ষেপে কথাবার্তা বললেন। তাতে অস্থির ভাবটা আরও গভীর হয়ে উঠলো।

দাদামশায় কাসতে কাসতে হুকুম দিলেন, "সারা বাড়িতে আলো জেলে রাখো, মা।"

আমরা তাড়াতাড়ি আহারাদি করলাম। কিন্তু কারোই ক্ষুধা ছিল না। দাদামশায় বললেন, "মানুষের ওপর শয়তানের প্রভাব···তুমি তা সব জায়গায় দেখতে পাবে···এমন কি আমাদের ধার্ম্মিক আর পাদ্রিদের ওপরেও···এর কারণ কি, অ্যাঁ?"

দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

শীতের সেই রুপালি-ধূসর বেলা এগিয়ে চললো, আর বাড়ির আবহাওয়া বোধ হতে লাগলো আরও অশান্ত ও থমথমে। সন্ধ্যার আগে আর একটা লাল, মোটা, কনষ্টেবল এসে রান্নাঘরে ষ্টোভের পাশে বসে ঢুলতে লাগলো। দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, "এটা ওরা বার করলে কি করে?" লোকটা মোটা গলায় উত্তর দিলে, "আমরা সব কিছু বার করি, কাজেই তুমি মাথা ঘামিও না।"

মনে পড়ছে, আমি জানলায় বসে মুখে একটা ডবল কোপেক পুরে সেটাকে গরম করছিলাম, সেন্ট জর্জ ও ড্রাগনের জানলার সার্সির গায়ে জমাট তুষারের ওপর তার ছাপ দেব বলে। হঠাৎ দরজা থেকে

ভয়ঙ্কর একটা আওয়াজ এল; দরজাটা খুলে গেল এবং পেৎরোভ্না পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগলো, "দেখ, তোমাদের ওখানে কি!"



কনষ্টেবলটাকে দেখেই সে আবার ছুট দিল দরজার দিকে; কিন্তু লোকটা তার স্কার্ট ধরে ফেলে ভয়ঙ্কর চীৎকার করে উঠলো, "দাঁড়াও। তুমি কে? আমরা কি দেখবো?"



হঠাৎ ধরবার ফলে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কাঁদতে আরম্ভ করলো। বোধ হল কথায় ও চোখের জলে তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। সে বলতে লাগলো, "আমি যখন গরুটা দুইতে গিয়েছিলাম তখন ওটা দেখেছি···আমি নিজের মনে বললাম—কাশিরিনদের বাগানে বুট-জুতোর মতো দেখা যাচ্ছে ওটা কি?"

এই কথায় দাদামশায় পা ঠুকে চীৎকার করে বললেন, "এই বোকা, তুই মিছে কথা বল্‌ছিস্! আমাদের বাগানে তুই কিছুই দেখ্‌তে পাস নি। কেননা বেড়াটি খুব উঁচু, আর ওর গায়ে কোন ফাঁক নেই। তুই মিছে কথা বলছিস্। আমাদের বাগানে কিছুই নেই।"

একখানা হাত তাঁর দিকে বাড়িয়ে, আর একখানা হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরে পেৎরোভ্না হাউ হাউ করে বল্‌তে লাগলো, "বাবা, কথাটা সত্যি। সত্যি, বাবা···এমন একটা জিনিষের কথা মিথ্যে বলবো? তোমার বেড়া অবধি পায়ের ছাপ ছিল, একজায়গায় তুষার ছিল পা দিয়ে চেপে মাড়ানো। আমি এগিয়ে গিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলাম···ওকে···সেখানে পড়ে আছে সে···"

—"কে? কে?"

প্রশ্নটা বার বার করা হলেও তার কাছ থেকে কিন্তু একটি কথাও বার করা গেল না। হঠাৎ সকলে ঠেলাঠেলি করতে করতে বাগানের

দিকে ছুটলো যেন পাগল হয়ে গেছে। দেখলাম, সেখানে খাদটার ধারে পোড়া কড়িটার গায়ে ঠেসান দিয়ে পড়ে আছেন পিটার-খুড়ো। তাঁর ওপর আলগা ভাবে ছড়ানো রয়েছে তুষার; তাঁর ডান কানের নিচে রয়েছে গভীর ক্ষত, লাল, দেখ্‌তে মুখের মতো। তার মাঝ থেকে দাঁতের মতো বেরিয়ে আছে মাংসের টুকরো।



ভয়ে আমি চোখ বন্ধ করলাম, কিন্তু চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম, পিটার-খুড়োর হাঁটুব ওপর রয়েছে আমার বহু পরিচিত ঘোড়ার-সাজের মিস্ত্রীর ছ্‌রিখানা। তাঁর বাঁ হাতখানা কেটে ফেলা হয়েছিল। সেখানা তুষারে ডুবে যাচ্ছিল।···তুষারের উপর রক্ত পড়ে জমে গিয়েছিল। আর বুকের ওপর জমাট রক্তধারার মাঝে ছিল একটি প্রকাণ্ড পিতলের ক্রশ। সকলে যে-রকম গোলমাল করছিল তাতে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। পেৎরোভনা একবারও কান্না থামালো না। কনষ্টেবলটা চীৎকার করে ভালেইকে এক জায়গায় খবর দিতে বললে। দাদামশায় চীৎকার করে উঠলেন, “সাবধান! ওর পায়ের ছাপগুলো মাড়িও না।”

কিন্তু তিনি হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে মাটির দিকে তাকিয়ে ভারিক্কী চালে জোরে বলে উঠ্‌লেন, “তোমার গোলমাল করবার কিছু নেই, কনষ্টেবল! এটা হল ভগবানের ব্যাপার···তাঁর বিচারের রায়···”

দিদিমা ভীষণ ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাত ধরে আমাকে বাড়িতে আনলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, “উনি ওরকম করলেন কেন?”

—“দেখতে পাও নি?”

সন্ধ্যায় এবং তারপরও বহুরাত্রি পর্য্যন্ত রান্নাঘরে অপরিচিত লোক-জন আসা-যাওয়া করলো। পুলিশই প্রভুত্ব করতে লাগলো।···

দিদিমা তাদের সকলকে চা দিলেন। টেবিলে একটি মোটা-সোটা দাড়িওয়ালা লোক বসে ছিল। তার মুখে বসন্তের দাগ। সে সরু গলায় বলছিল, "ওর আসল নাম আমরা জানি না···আমরা যা-কিছু বার করতে পেরেছি ওর জন্মস্থান হচ্ছে এলাংমা···আর সেই বোবাটা···ওটা হল কেবল ছদ্মবেশ···সে আদৌ বোবা-কালা নয়···সে ব্যাপারটার বিষয় সব জানতো···এর মধ্যে আর একটি তৃতীয় ব্যক্তিও আছে···তাকে এখন আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। ওরা অনেকদিন দিন ধরে গির্জ্জার জিনিষ-পত্র চুরি করছিল। ওদের কাজই ছিল তাই।"

পেংরোভনা বলে উঠলো, "ভগবান!"

আমি ষ্টোভের ধারে শুয়ে নিচে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। সকলকে মনে হতে লাগলো কি রকম ছোট, মোটা ও ভয়ঙ্কর।



## দশম পরিচ্ছেদ

এক শনিবারে খুব সকালে আমি পেংরোভ্নার ফল-মূলের বাগানে রবিন ধরতে গেলাম। সেখানে রইলাম অনেকক্ষণ। কারণ ধৃষ্ট রক্ত-বক্ষ পাখিগুলো কিছুতেই ফাঁদে ধরা পড়তে চাইছিল না। আমার সব বেশি চেয়ে আনন্দ হত পাখিদের চাল-চলন দেখ্তে। সেই তুষার ছাওয়া দিনটির স্বচ্ছ স্তব্ধতার মাঝে আমি তুষার ঢাকা প্রান্তর-খানির ধারে একা বসে পাখির কলস্বর শুন্তে লাগলাম। এমন সময় দূর থেকে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে এল ট্রাইকার ঘণ্টার আওয়াজ—রুষ-দেশের শীতকালে স্কাইলারকের বিষাদ সঙ্গীতের মতো।

তুষারের ওপর বসে থাকতে থাকতে অসাড় হয়ে পড়েছিলাম। বোধ হতে লাগলো আমার কান দুটো হিমে জমে যাচ্ছে। উঠে বাড়ির দিকে চললাম।

ফটকটা ছিল খোলা। একটি ভীমকায় লোক তিনটি ঘোড়াকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আর আনন্দে শিষ দিচ্ছিল। ঘোড়া তিনটি জোতা ছিল একটি প্রকাণ্ড বড় স্লেজে। তাদের গা থেকে উঠছিল বাষ্প। আমার অন্তর নেচে উঠলো। জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে কাকে এনেছো?

লোকটা ফিরে আমাকে তার কুক্ষির তলা দিয়ে দেখে, জবাব দেবার আগে কোচম্যানের জায়গায় লাফ দিয়ে উঠে বসে বললে, "পাদ্রিকে?"

কিন্তু আমার বিশ্বাস হল না। সে শিষ দিতে দিতে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। ঘোড়াগুলো মাঠ দিয়ে ছুটে চললো। আমি তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর ফটকটা বন্ধ করে দিলাম। খালি রান্নাঘরখানাতে ঢুকতে ঢুকতে প্রথমেই যা শুনলাম, তাহচ্ছে আমার মায়ের সতেজ কণ্ঠস্বর। তিনি বলছিলেন, "কি ব্যাপার? তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?"

বাইরের পোশাকটা না ছেড়েই খাঁচাগুলো ফেলে দিয়ে আমি দরজায় ছুটে গেলাম। সেখানে দাদামশায়ের সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগলো। তিনি আমার কাঁধ চেপে ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কষ্টে ঢোক গিলে ভাঙা গলায় বললেন, "তোমার মা এসেছে···তার কাছে যাও··· দাঁড়াও!" তিনি আমাকে এমন জোরে নাড়া দিলেন যে, আমি ঘুরতে ঘুরতে ঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা খেলাম।

দরজায় ঘা দিলাম। দরজার গায়ে ছিল ফেলট ও অয়েলক্লথের ঢাকা। আমার হাত ঠাণ্ডায় এমন অসাড় হয়ে গিয়েছিল যে, ল্যাচ-কী খুঁজে পেতে কিছু সময় লাগলো। তারপর নিঃশব্দে ঢুকে দরজায় বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার চোখ ধেঁধে গেল।

মা বললেন, "এই যে সে! ভগবান! কত বড়টি হয়েছে। কি, তুমি আমাকে চেননা?…কি রকম করে তোমরা ওকে পোশাক পরিয়েছ! …হাঁ, ওর কান দুটো সাদা হয়ে যাচ্ছে! মা, শিগগির একটু হাঁসের চর্বি নিয়ে এস!"



তিনি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার ওপর ঝুঁকে আমার বাইরের পোশাকটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে আমাকে ঘোরাচ্ছিলেন যেন আমি বল ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর বিশাল দেহটি ঢাকা ছিল গরম, নরম, সুন্দর পোশাকে। পোশাকটি ছিল পুরুষের ক্লোকের মতো লম্বা কালো বোতামের সারি দিয়ে ঘাড় থেকে স্কার্টের ধার অবধি আঁটা।

আগের চেয়ে তাঁর মুখখানিকে ছোট, চোখ দুটিকে আরও বড় ও ভেতরে বসা বোধ হচ্ছিল। চুলগুলোকে মনে হচ্ছিল গাঢ় সোনালী রঙের। আমার পোশাকগুলো ছাড়িয়ে তিনি দরজা দিয়ে ছুড়ে ফেলছিলেন আর বলছিলেন, "তুমি কথা বলছো না কেন? আমাকে দেখে খুশি হওনি কি? ফুঃ! কি নোংরা শার্ট…"

তারপর তিনি আমার কানে হাঁসের চর্বি মালিশ করে দিলেন। তাতে আমার লাগছিল। কিন্তু তিনি যখন মালিশ করছিলেন, তাঁর গা থেকে এমন মিষ্ট সুগন্ধ বার হচ্ছিল যে, ব্যথাটি যেমন লাগবার কথা তার চেয়ে লাগছিল কম। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর গায়ের একেবারে কাছে সরে গেলাম। এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, কথা বলতে পারছিলাম না। তাঁর কথার মাঝখানে শুনছিলাম দিদিমার

নিম্ন, বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর, "ও এমন স্বেচ্ছাচারী···একেবারে হাতের বাইরে চলে গেছে। এমন কি দাদামশায়কেও ভয় করে না···ও ভারিয়া··· ভারিয়া!"

—"মা ঘ্যান ঘ্যান" করো না, দোহাই তোমার। ওতে মন্দটা ভাল হয় না।"

মায়ের কাছে প্রত্যেক-কিছুকে দেখাচ্ছিল ক্ষুদ্র, ম্লান ও প্রাচীন। আমার নিজেকেও দিদিমার মতো প্রাচীন বোধ হতে লাগলো।

আমাকে তাঁর হাঁটুতে চেপে ধরে তপ্ত সবল হাত দুখানি দিয়ে আমার মাথার চুলগুলো সমান করতে করতে তিনি বললেন, "ওকে শাসন করবার একজন চাই। ওর ইস্কুলে যাবার সময় হয়েছে···তুমি পড়া শিখতে চাও, চাও না?"

—"আমি যা জানতে চাই, শিখেছি।"

—"তোমাকে আর একটু বেশি শিখতে হবে···তুমি কি রকম বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছো!" বলে তিনি মন খুলে হাসলেন।

দাদামশায় ঘরে এলেন। তাঁর মুখখানা হয়ে গিয়েছিল ছাইয়ের মত মলিন, চোখ দুটো লাল। তিনি রাগে ফুলছিলেন। তিনি আসতেই মা আমাকে সরিয়ে দিয়ে গলার স্বর চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ঠিক করেছো বাবা? আমাকে যেতে হবে?"

দাদামশায় জানলায় দাঁড়িয়ে সার্সির গা থেকে নখ দিয়ে তুষার আঁচড়ে ফেলতে ফেলতে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। অবস্থাটি আমার পক্ষে হয়ে উঠলো বড় বেদনাদায়ক।

তিনি রূঢ় ভাবে বলে উঠলেন, "লেক্সি, ঘর থেকে চলে যাও!"

আমাকে আবার কাছে টেনে নিয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন, "কেন? তুমি যেও না। আমি বারণ করছি!" তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং

রক্তিম মেঘভারের মতো নিঃশব্দে সরে গিয়ে দাদামশায়ের পিছনে দাঁড়ালেন। বললেন, "আমার কথা শোন, পাপাশা—"

দাদামশায় তাঁর দিকে ফিরে তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন, "চুপ্—"

মা শান্তভাবে বললেন, "আমাকে ধমকিও না।"

দিদিমা কাউচ থেকে উঠে আঙুল তুলে মাকে ভৎর্সনা করলেন, —"ভারভারা!"

দাদামশায় গজ্ গজ্ করতে করতে বসে বললেন, "থামো একটু! আমি জানতে চাই কে—? অ্যাঁ? কে সে?…কি করে হল?"

এবং হঠাৎ এমন ভয়ঙ্কর কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন যেন সে গলার স্বর তাঁর নয়। "তুমি আমার নামে কলঙ্ক এনেছো, ভারকা?"

দিদিমা আমাকে বললেন, "ঘর থেকে বেরিয়ে যাও!"

আমি রান্নাঘরে গেলাম। বোধ হতে লাগলো যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি ষ্টোভের ওপর উঠে বহুক্ষণ সেখান থেকে তাদের কথাবার্ত্তা শুনতে লাগলাম। পার্টিশনের ভেতর দিয়ে তা শোনা যাচ্ছিল। তাঁরা সকলে একসঙ্গে পরস্পরকে বাধা দিয়ে কথা বলছিলেন অথবা সকলেই চুপ করছিলেন। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল একটি শিশু। আমার মায়ের সম্প্রতি একটি শিশু হয়েছে। মা তাকে একজনের কাছে লালন-পালনের জন্য দিয়েছেন। বুঝতে পারলাম না দাদামশায় রুষ্ট হয়েছেন কিসের জন্য। তাঁর অনুমতি না নিয়ে মা সন্তানটিকে প্রসব করবার জন্য অথবা শিশুটিকে তাঁর কাছে না আনবার জন্য?

তিনি পরে রান্নাঘরে এলেন। তাঁর চুল উস্কো-খুস্কো। তাঁর সঙ্গে এলেন দিদিমা ব্লাউসের নিচের অংশ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে। দাদামশায় একখানি বেঞ্চিতে বসে ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন আর

দিদিমা তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন। "বাবা, ওকে ক্ষমা কর। এ ভাবে তুমি ওকে এড়াতে পারবে না। তুমি কি মনে কর ভদ্রলোকদের আর বড় বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন ব্যাপার ঘটে না? নারী চরিত্র তুমি তো জানো। ওকে ক্ষমা কর। কেউই নিখুঁত ভাবে তৈরী নয়, তা তো জানো।"

দাদামশায় দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর তিক্ত হাসির সঙ্গে বললেন, হাসিটা সোনালো কান্নার মতো, "কাকে না তুমি ক্ষমা করতে চাও? আশ্চর্য! তোমার ইচ্ছামতো যদি চল্‌তে পারতে তাহলে সকলকেই ক্ষমা করা হ'ত···"

তারপর নিচু হয়ে দিদিমার কাঁধ চেপে ধরে তাকে ঝাঁকি দিয়ে আবার বললেন, "কিন্তু তোমার দুশ্চিন্তা করবার দরকার নেই। আমার মধ্যে তুমি ক্ষমা খুঁজে পাবে না। আমরা মৃত্যুর প্রায় দ্বারে এসে পৌঁছেছি—আমাদের জীবনের শেষ দিনগুলিতে এল শাস্তি··· আমাদের শান্তিও নেই, সুখও নেই···আরও যা হবে, আমার কথাগুলো মনে রেখ···মরবার আগে আমরা হব ভিখারী—ভিখারী!"

দিদিমা তার হাত ধরলেন, এবং তাঁর পাশে বসে মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন, "আহা, বেচারী! তাহলে তুমি ভিখারী হতে ভয় পাও! মনে কর আমরা ভিখারী হয়ে গেলাম? তোমাকে যা করতে হবে তা এই—তুমি বাড়ি থাকবে, আর আমি ভিক্ষায় বার হব···লোকে আমাকে দেবে, ভয় নেই!···আমাদের অনেক থাকবে; কাজেই ও দুঃখটা তুমি মন থেকে সরিয়ে দিতে পারো।"

ছাগলের মতো মাথা নেড়ে দাদামশায় হঠাৎ হেসে উঠলেন; এবং দিদিমার গলা জড়িয়ে তাঁকে দেহের সঙ্গে চেপে ধরলেন। দিদিমার পাশে তাঁকে দেখাতে লাগলো ক্ষুদ্র ও শুষ্ক।

তিনি বলে উঠলেন, "হায় রে নির্ব্বোধ···এখন আমার যা কিছু আছে তা কেবল তুমিই !···তুমি কিছুই বোঝ না বলেই কোন কিছুর জন্যে দুশ্চিন্তা কর না। কিন্তু পিছনের দিকে তাকাও···মনে করে দেখ, ওদের জন্যে আমরা কি রকম খেটেছি···ওদের জন্যে কি রকম প্রাণপাত করেছি···সে-সব সত্ত্বেও এখন—"



এইখানে আমি আর নিজেকে সংযত করতে পারলাম না. আমার চোখের জল বাধা মানলো না। ষ্টোভ থেকে লাফ দিয়ে নেমে, আনন্দে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের কাছে ছুটে গেলাম। কারণ, দুজনে এমন চমৎকার সখ্যতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিলেন, কারণ, তাঁদের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছিল, কারণ, মা এসেছেন, কারণ, তারা দুজনে আমাকে ধরে, আমাকে আলিঙ্গন দিয়ে, নিবিড় ভাবে বুকে চেপে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু দাদামশায় আমার কানে কানে বললেন, "এই ক্ষুদে ভূত, তাহলে তুমি এখানে ! তোমার মা ফিরে এসেছে। বোধ হয় এখন থেকে সব সময় তুমি তার সঙ্গে থাকবে। এখন আর বুড়ো শয়তান দাদামশায় বেচারীর দরকার নেই, অ্যাঁ ? আর দিদিমা, যে তোমাকে এমন নষ্ট করেছে···তাকেও দরকার নেই ···অ্যাঁ ? উফ !"

তিনি আমাদের সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রুষ্টস্বরে বলে উঠলেন, "ওরা সকলেই আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে—সকলেই আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে···ওকে ডাকো। দাঁড়িয়ে আছ কেন ? শিগগির যাও।"

দিদিমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর দাদামশায় ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "করুণাময় জগদীশ্বর ! তা···তুমি দেখতে পাচ্ছ আমাদের অবস্থা এখন কি !" বলে বুকে ঘুষি মারলেন।···

মা যখন এলেন তাঁর লাল পোশাকটি রান্নাঘরখানি আলোকিত করে তুল্‌লো। তিনি টেবিলের ধারে বসলেন। দাদামশায় ও দিদিমা বসলেন তাঁর দু'পাশে। তিনি তাঁদের কাছে কি যেন শান্ত, গম্ভীর ভাবে বর্ণনা করে যেতে লাগলেন, আর, তাঁরা নীরবে শুনতে লাগলেন, যেন তাঁরা তাঁর ছেলে-মেয়ে আর তিনি তাঁদের মা! উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে আমি কাউচের ওপর ঘুমিয়ে পড়লাম।···

মায়ের সঙ্গে আমি যখন তাঁর ঘরে একা রইলাম তিনি কাউচে পা মুড়ে বসে তাঁর পাশের জায়গাটি দেখিয়ে বললেন, "এখানে এসে বস। এখন—বল দেখি তোমার এখানে থাক্‌তে কেমন লাগে? বেশি ভাল নয়, অ্যাঁ?"

—"জানি না।"

—"দাদামশায় তোমায় মারেন, অ্যাঁ?"

—"এখন বেশি নয়।"

—"অ্যাঁ?···এখন, সব কথা আমাকে বল···যা তোমার ইচ্ছা হয় বল···হাঁ?"

তাঁর কাছে দাদামশায়ের কথা বলতে ইচ্ছা না থাকায়, সেই ঘরে যে সহৃদয় ব্যক্তিটি ছিলেন তাঁর বিষয় বল্‌তে লাগলাম। বললাম, তাকে কেউ পছন্দ করতো না; দাদামশায় তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। দেখলাম, কাহিনীটি তিনি পছন্দ করলেন না, বললেন, "আর কি?"

আমি তাঁকে সেই ছেলেটির কথা আর কেমন করে কর্নেল আমাকে তাঁর মাঠ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সে কথাও বললাম। আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে তিনি শুনে গেলেন।

তাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো; বললেন, "মানে!" এবং মাটির দিকে তাকিয়ে মিনিটখানেক চুপ্‌ করে রইলেন।

জিজ্ঞেস্ করলাম, “দাদামশায় তোমার ওপর রাগ করছিলেন কেন?”

—“কারণ তাঁর মতে আমি অন্যায় করেছি।”

—“সেই লোকটাকে এখানে না এনে—?”

তিনি ভয়ানক চমকে উঠলেন; ভ্রূকুটি করে ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন। তারপর হেসে উঠে আমাকে নিবিড় করে চেপে ধরে বললেন, “এই খুদে রাক্ষস! এখন ও বিষয়ে তোমাকে চুপ করে থাকতে হবে, শুনলে? কখন ও বিষয়ে আলোচনা করেনা—শুনেছো যে তাও ভুলে যাও।”

তারপর উঠে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন।···

টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি জলছিল এবং আয়নাখানার শূন্য কাচে প্রতিফলিত হচ্ছিল। মেঝেয় নিঃশব্দে এগিয়ে আসছিল কালো ছায়া। ঘরের কোণে ইকনের সামনে জলছিল একটা আলো; আর তুষারাবৃত জানলাগুলি জ্যোৎস্নায় ঝক ঝক করছিল। মা তাঁর চারধারে তাকাতে লাগলেন যেন শূন্য দেওয়ালে ও ছাদে কি খুঁজছেন। বললেন, “তুমি কখন শুতে যাও?”

—“আমাকে আর একটু থাকতে দাও।”

—“তা ছাড়া, তুমি আজ একটু ঘুমিয়ে ছিলে।” কথাগুলি তিনি নিজের মনেই বললেন।

জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি কি চলে যেতে চাও?

বিস্মিত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, “কোথায়?” এবং আমার মাথাটি তুলে এতক্ষণ ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন যে, আমার চোখে জল এল। জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কি হয়েছে?”

—“আমার ঘাড় ব্যথা করছে।”

আমার অন্তরও ব্যথিত হচ্ছিল। কেননা আমি হঠাৎ বুঝতে পেরে ছিলাম, তিনি আমাদের বাড়িতে থাকবেন না, শীঘ্রই আবার চলে যাবেন।



একটা মাদুর পা দিয়ে সরাতে সরাতে মা মন্তব্য করলেন, “তোমার বাবার মতো হচ্ছ। দিদিমা কি তাঁর বিষয় তোমাকে কিছু বলেছেন ?”



—“হঁা।”

—“উনি ম্যাকসিমকে খুব ভালোবাসতেন—খুবই ; আর সেও ওঁকে ভালবাসতো।”

—“জানি।”

মা মোমবাতিটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলেন ; তারপর সেটা নিবিয়ে দিতে দিতে বললেন, “এই ভালো।”

হঁা, তাতে আবহাওয়াটা আরও সজীব ও নির্ম্মল হয়ে উঠলো ; ছায়াগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল ; মেঝেতে উজ্জ্বল নীল আলোর ছাপ লেগে রইলো আর জানলার সাসির গায়ে সোনালি স্ফটিক ঝলমল করতে লাগলো।

—“কিন্তু তুমি এতকাল কোথায় ছিলে ?”

তিনি কতকগুলো শহরের নাম করলেন।

—“তুমি ঐ পোশাকটা কোথায় পেয়েছ ?”

—“নিজে তৈরি করেছি। আমার নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ আমি নিজে তৈরি করি ”

আমি ভাবতে ভালোবাসতাম যে তিনি অন্যের চেয়ে পৃথক ; কিন্তু দুঃখ ছিল যে তিনি এত কম কথা বলেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁকে কোন প্রশ্ন করা না হলে তিনি মুখই খুলতেন না।

একটু পরেই তিনি এসে আমার পাশে কাউচে বস্‌লেন। সেখানে দুজনে ঘেঁষা-ঘেঁষি করে যে-পর্য্যন্ত না বৃদ্ধ-বৃদ্ধা গির্জ্জা থেকে ফিরে এলেন চুপ-চাপ বসে রইলাম। তাঁরা এলেন গায়ে মোম ও ধূপাদির গন্ধ, মুখ গম্ভীর, চলা-ফেরা ধীর…

মা আস্‌বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে রুষ-ভাষা শিখাতে লাগলেন। তিনি কতকগুলো বই কিনলেন। আমি কয়েকদিনের মধ্যেই রুষ-ভাষা পড়তে শিখলাম। কিন্তু মা তারপরই আমাকে কবিতা মুখস্থ করাতে লাগলেন। তাতে আমাদের উভয়েরই বিরক্তির কারণ ঘটলো।

আমি ভুল পড়তাম। তিনি আমার ভুল সংশোধন করে দিতেন। ভুলটা কতক পরিমাণে আমার ইচ্ছাকৃত।

একদিন কবিতাটি মুখস্থ বলবার সময় শব্দগুলি এমন ভাবে উল্টে-পাল্টে আবৃত্তি করতে লাগলাম যে তার কোন অর্থই হল না। তাতে খুব খুশি হলাম।

কিন্তু বেশিদিন এ রকম আনন্দ উপভোগ করা গেল না। একদিন তার জন্য শাস্তি পেতে হ'ল। সেদিন পড়ার পর মা জিজ্ঞেস করলেন, কবিতাটি মুখস্থ করেছি কি না। আমি তৎক্ষণাৎ কবিতাটি উল্টে-পাল্টে আবৃত্তি করতে লাগলাম। কিন্তু যখন আমার চমক ভাঙলো মা তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং টেবিলের ওপর হাত দুখানির ভার দিয়ে খুব স্পষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, “কি বলছো?”

—“জানি না।”

—“তুমি ভাল করেই জান।”

—“ওটা হচ্ছে—”

—“ওটা হচ্ছে কি?”

—"মজার কিছু।"

—"কোণে গিয়ে দাঁড়াও।"

—"কেন ?"

—"কোণে গিয়ে দাঁড়াও।" তাঁর ভাব দেখে আমার ভয় হতে লাগলো।

—"কোন্ কোণে ?"

কোন জবাব না দিয়ে তিনি স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি অস্থির হয়ে উঠতে লাগলাম। কারণ বুঝতে পারলাম না, তিনি কি চান। এক কোণে ইকনের নিচে ছিল একখানি ছোট টেবিল। তার ওপর একটি ভাসে ছিল কতকগুলি সুগন্ধী ঘাস ও ফুল; আর এক কোণে ছিল একটি ঢাকা দেওয়া ট্রাংক। বিছানাটি ছিল তৃতীয় কোণটিতে; ঘরের চতুর্থ কোণ ছিল না। কারণ দরজাটা ছিল দেওয়াল অবধি।

তাঁর কথা বুঝতে না পেরে হতাশ ভাবে বললাম, "তুমি কি বল্‌ছো বুঝতে পারছি না।"

তিনি একটু নরম হলেন; নীরবে কপাল ও গাল দুখানি মুছলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "দাদামশায় তোমাকে কোণে দাঁড় করান নি ?"

—"কখন ?"

হাত দিয়ে দুবার টেবিল ঠুকে তিনি বলে উঠলেন, "যখনই হোক্! তিনি কখন তা করেছেন কি ?"

—"না—অন্তত আমার তা মনে পড়ে না।"

তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। "ফুঃ! এখানে এস।"

"তুমি আমার ওপর এত রাগ করছো কেন ?" বল্‌তে বল্‌তে আমি তাঁর কাছে গেলাম।

—"কারণ তুমি ইচ্ছে করেই কবিতাটা গুলিয়ে ফেলেছো।"

যত ভাল করে পারলাম তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম; চোখ বন্ধ করে আমি কবিতাটির প্রত্যেকটি শব্দ মনে করতে পারি, কিন্তু আবৃত্তি করতে গেলেই কথাগুলো বদলে যায়।

—"ঠিক কথা বলছো?"

বললাম, ঠিকই বলছি, কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করেই দেখলাম, আমি খুব ঠিক বলছি না। হঠাৎ পদ্যটি আমি নির্ভুল ভাবে আবৃত্তি করলাম। তাতে আমার নিজেরই বিস্ময় জাগলো। হতবুদ্ধির মতো হয়ে পড়লাম। মায়ের সামনে লজ্জায় লাল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখের জলের মধ্য দিয়ে দেখ্‌তে পেলাম মার কালো মুখখানি। তিনি ঠোঁট কামড়াচ্ছেন, ভ্রূকুটি করছেন।

"এর মানে কি? তাহলে তুমি ভান করছিলে?" তাঁর গলার স্বরকে মনে হল যেন তাঁর নয়।

বললাম, "জানি না। আমার সে ইচ্ছে ছিল না।"

—"তুমি সহজ নও। যাও।"

আমার আরও কবিতা মুখস্থ করবার জন্য জেদ ধরলেন। কিন্তু প্রত্যেক দিনই আমার স্মৃতিশক্তি ক্রমে কমে আসতে লাগলো।... একটি কবিতা আমাকে খুবই কষ্ট দিয়েছিল। কবিতাটি ছিল বড় করুণ।

মা আমার কিছু করতে না পেরে দাদামশায়ের কাছে সব বললেন। দাদামশায় উত্তর দিলেন, "ও সব ভান! ওর চমৎকার স্মৃতিশক্তি। আমার সঙ্গে স্তব মুখস্থ করেছে...ও ভান করছে। ওর স্মৃতিশক্তি ভাল। ওকে শিখানো পাথরে খোদাই করার মতো... তাতেই বুঝবে কত ভাল...ওকে তোমার মারা উচিত।"

দিদিমাও আমাকে তিরস্কার করলেন। "তুমি গল্প, গান মনে রাখতে পার···গানগুলো কি কবিতা নয়?"

এ সবই সত্য; কিন্তু তবুও আমি কবিতা মুখস্থ করতে বস্‌লেই যেন কোথা থেকে নানা শব্দ আরশুলার মতো সুড় সুড় করে এসে সার বেঁধে দাঁড়াতো।··· রাত্রে বিছানায় যখন দিদিমার পাশে শুতাম, বইয়ে যা পড়তাম এবং আমি নিজে ভিখারীদের সম্বন্ধে রচনা করতাম বল্‌তে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। দিদিমা আমাকে বক্তৃতা দিতেন। "দেখ! তুমি কি করতে পারো! কিন্তু ভিখারীদের নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়। ভগবান তাদের মঙ্গল করুন। যীশুখ্রীষ্ট দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেছিলেন, অন্য সাধু মহাত্মারাও করেছিলেন তাই।"

—"এত দুষ্ট হওয়া তোমার খুব অন্যায়। তাতে কেবল তোমার মার রাগ হয়; তুমি ছাড়াও তাঁর অনেক দুশ্চিন্তা রয়েছে।"

—"তাঁর কি হয়েছে?"

—"যাই হোক! তুমি বুঝ্‌বে না!"

—"জানি! কারণ দাদামশায়—"

—"চুপ্!"

আমার অবস্থা হল কঠোর:···মায়ের কাছে লেখা-পড়া শিক্ষা করা আমার পক্ষে ক্রমেই হয়ে উঠতে লাগলো আরও বিস্বাদের ও আরও কষ্টের। আমি সহজেই অঙ্কটা আয়ত্ত করলাম, কিন্তু লেখবার ধৈর্য্য আমার ছিল না; আর ব্যাকরণ? ওটা ছিল আমার কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য।

কিন্তু তখন আমার মনে একটা ভাব চেপে বসেছিল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম এবং অনুভবও করছিলাম যে, দাদামশায়ের বাড়িতে মায়ের বাস করা কঠিন। তাঁর মুখের ভাব প্রত্যহ

রুক্ষ হয়ে উঠছিল। বাগানের ওপর যে জানলাটি ছিল তিনি সেখানে বহুক্ষণ চুপ্-চাপ বসে থাকতেন।

তিনি আমাকে পড়াতে বসে প্রশ্ন করতেন এবং আমার উত্তরের কথা যেতেন ভুলে। আগের চেয়ে প্রায়ই রেগে উঠতেন। তাতে যদি মনে আঘাত পেতাম। কেননা গল্পে যেমন হয়, আর সকলের চেয়ে মায়েদেরই ভাল ব্যবহার করা উচিত।



কখন কখন আমি তাঁকে বলতাম, "আমাদের সঙ্গে তুমি থাকতে ভালোবাস না, বাস কি ?"

তিনি রাগের সঙ্গে বলে উঠতেন, "তোমার নিজের কাজ কর।"

আমার মনে ধারণা হতে লাগলো, দাদামশায় এমন কিছু করেছেন যা দিদিমা ও মাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে ফেলেছে। তিনি মায়ের সঙ্গে তার ঘরে ঘন ঘন দরজা বন্ধ করে থাকতে লাগলেন। সেখানে শুনতে পেতাম তিনি রাখালের কাঠের বাঁশীটির মতো আর্ত্তনাদ ও তীক্ষ্ণ শব্দ করছেন। তা আমার বিশ্রী লাগ্‌তো। একবার যখন তাঁদের এই কথা চল্‌ছে মা এমন ভাবে তীক্ষ্ণ স্বরে কথা বলে উঠলেন, যাতে বাড়ির প্রত্যেকেই শুনতে পায়।

তিনি বললেন, "আমি ওটা চাই না! চাই না!"

একটা দরজা ধপ করে উঠলো—দাদামশায় চীৎকার করতে লাগলেন। ব্যাপারটা ঘটলো সন্ধ্যায়। দিদিমা তখন রান্নাঘরের টেবিলের ধারে বসে দাদামশায়ের জন্য একটা শার্ট তৈরি করছিলেন আর নিজের মনে কথা বলছিলেন। দরজাটির শব্দ হতে তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনে বলে উঠলেন, "ভগবান! ও (মা) ওপরে ভাড়াটেদের কাছে গেল।"

সেই মুহূর্ত্তে দাদামশায় রান্নাঘরে ছুটে এসে দিদিমাকে তেড়ে গিয়ে

তাঁর মাথায় মারলেন এক ঘুষি। এবং ঘুষি ঝাঁকিয়ে তাঁকে বলে উঠলেন, "এই মড়া বুড়ী, যে কথা বলবার দরকার নেই সে কথা বলে বেড়াস নি!"

আঘাতে খুলে-পড়া চুলগুলো গোছাতে গোছাতে দিদিমা শান্তভাবে বললেন, "তুমি একটা বোকা বুড়ো। তুমি কি মনে কর আমি চুপ করে থাকবো? তোমার সমস্ত [illegible] কথা আমি যা জানি ওকে (মাকে) সব বলবো।"



তিনি দিদিমার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর প্রকাণ্ড মাথাটিতে ঘুষি মারতে লাগলেন।

আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা না করে বা মারগুলি দাদামশায়কে না ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "চালাও! মারো আমায়, বেবাকুফ নির্বোধ!...ঠিক হচ্ছে! আমায় মারো!"

আমি কাউচ থেকে কুশন ও কম্বল এবং ষ্টোভের চারধারে যে বুটগুলো ছিল সেগুলো তুলে নিয়ে দাদামশায়কে ছুঁড়ে মারতে লাগলাম। কিন্তু তিনি রাগে এমন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন যে, সেদিকে খেয়ালই করলেন না। দিদিমা পড়ে গেলেন; দাদামশায় তাঁর মাথায় লাথি মারতে লাগলেন। পরিশেষে তিনি হোঁচট খেয়ে নিজেই গেলেন পড়ে। তাঁর গা লেগে এক কলসি জল উল্টে পড়ে গেল। তিনি রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে লাফ দিয়ে উঠে, উন্মাদের মতো চারধারে তাকিয়ে চিলে-কোঠায় তাঁর নিজের ঘরের দিকে ছুটলেন।

দিদিমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠলেন এবং বেঞ্চির ওপর বসে তাঁর চুলগুলো সমান করতে লাগলেন। আমি কাউচ থেকে লাফ দিয়ে উঠলাম। তিনি রাগের স্বরে আমাকে বল্লেন, "ঐ বালিশ আর জিনিষগুলো সব ওদের জায়গায় রাখো...লোককে বালিশ ছুড়ে মারা!

…এটা কি তোমার ব্যাপার ? আর ঐ শয়তানটা, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে—আহাম্মক !"

তিনি তাড়াতাড়ি নিশ্বাস টেনে আমাকে তাঁর কাছে ডাকতে ডাকতে ভ্রূকুটি করলেন এবং মাথাটি নুইয়ে বললেন, "দেখ ! আমার এমন লাগছে কিসে ?"



আমি তাঁর ভারী চুলের রাশি একপাশে সরিয়ে দেখলাম, একটা মাথার কাঁটা তাঁর মাথার চামড়ার মধ্যে গভীর ভাবে ঢুকে গেছে। সেটা টেনে বার করলাম ; কিন্তু আর একটা দেখেই আমার আঙুলের সব জোর যেন চলে গেল ; বললাম, "বরং মাকে ডাকি। আমার ভয় করছে।"

তিনি আমাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। "কি হয়েছে ?… মাকে ডাকবে বৈকি !…ভগবানকে ধন্যবাদ যে সে কিছুই দেখেও নি, শোনেও নি ! আর তুমি—আমার সামনে থেকে সরে যাও।"

তিনি ঘনচুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে লাগলেন। আমি যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে আরও দুটো মোটা বাঁকা কাঁটা টেনে বার করতে তাঁকে সাহায্য করলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার লাগছে ?"

—"বেশি নয়। কাল জল গরম করে মাথা ধুয়ে ফেলবো। তখন ব্যথা থাকবে না।"

তারপর তিনি মিনতিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "যাদু আমার, তোমার মাকে বলবে না যে দাদামশায় আমাকে মেরেছে, বলবে ? এমনিতেই ওদের মধ্যে যথেষ্ট মন-কষাকষি চলছে। বলবে না, বলবে ?"

—"না।"

—"ভুলো না ! এস, সব ঠিক করে রাখা যাক্‌…আমার মুখে কোন

ছড়ার দাগ নেই, আছে ? ঠিক হয়েছে। আমরা কথাটা চেপে রাখতে পারবো।”

তারপর তিনি মেঝে পরিষ্কার করতে লাগলেন। আমি মর্মস্থল থেকে বলে উঠলাম, “তুমি সাধুর মতো···লোকে তোমাকে যন্ত্রণা দেয়। তোমার ওপর অত্যাচার করে, আর তুমি সে কথা মনেও রাখো না।”

—“কি সব বাজে কথা বলছো ? সাধু-মহাত্মা—? কখন কোথাও একটি দেখেছো ?”



তিনি হামাগুড়ি দিতে লাগলেন আর আমি ষ্টোভের পাশে বসে দাদামশায়ের ওপর প্রতিশোধ নেবার উপায় স্থির করতে লাগলাম। তিনি এই প্রথম আমার চোখের সামনে দিদিমাকে এমন বিশ্রী ভাবে মারলেন। অন্তর টগ্‌বগ্‌ করে ফুট্‌তে লাগলো।

কিন্তু এই ঘটনার দু-একদিন পরে আমাকে কোন একটি জিনিষের জন্য ওপরে চিলে-কোঠায় পাঠানো হলে দেখলাম, তিনি মেঝেয় একটা খোলা ট্রাংকের সামনে বসে কতকগুলো কাগজ দেখছেন। চেয়ারে পড়ে ছিল তাঁর প্রিয় ক্যালেনডারখানি—বারোখানি মোটা পৃষ্ঠা একসঙ্গে বাঁধানো। তাতে ছিল সাধু মহাত্মাগণের ছবি।

আমি ক্যালেনডারখানা ছিঁড়ে ফেল্‌বার সঙ্কল্প করলাম। দাদামশায় একখানি গাঢ় নীল কাগজ পড়বার জন্য জানলার কাছে যেতেই আমি চট্ করে খান কয়েক পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়ে তরতর করে নিচে নেমে গেলাম এবং দিদিমার কাঁচিখানি টেবিল থেকে চুরি করে কাউচে বসে ক্যালেণ্ডারে সাধু-মহাত্মাদের মাথাগুলি কাটতে লাগলাম।

একটি সারির শিরশ্ছেদন করবার পর ক্যালেণ্ডারখানি নষ্ট করতে দুঃখ বোধ হতে লাগলো। তাই ছবিখানি চৌকো করে কাট্‌তে মনস্থ করলাম। কিন্তু দ্বিতীয় সারিটিকে টুকরো টুকরো করবার আগেই

দাদামশায় দরজায় এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাকে ক্যালেণ্ডারখানা নিয়ে আসবার অনুমতি দিয়েছে কে ?"



তাঁর চোয়াল দুখানা হয়ে গেল শক্ত, দাড়িটা লাফাতে লাগলো; তিনি এত জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন যে, কাগজগুলো গেল উড়ে।



অবশেষে আমার পা ধরে টানতে টানতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন, "কেন এ কাজ করলে !"



আমি পা ওপর দিকে ও মাথা নিচের দিকে করে পড়ে গেলাম। দিদিমা আমাকে ধরে ফেললেন। তিনি দিদিমাকে ঘুষি মারতে মারতে বলতে লাগলেন, "আমি ওকে খুন করবো।"

সেই মুহূর্তে মা এসে দেখা দিলেন। আমি ষ্টোভের পাশে লুকোলাম। তিনি দাদামশায়ের পথ আগলে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত চেপে ধরলেন। দাদামশায় মায়ের মুখের সামনে হাত নাড়ছিলেন। তিনি দাদামশায়কে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার এরকম করবার মানে কি ? স্থির হও।"

দাদামশায় জানলার নিচে বেঞ্চিখানিতে বসে গর্জ্জন করে উঠলেন, "তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে চাও। তোমরা সকলেই আমার বিরুদ্ধে—প্রত্যেকে।"

মা নরম স্বরে বললেন, "নিজের জন্য তোমার লজ্জা হয় না ? এ সব হাঁট করা কেন ?"

দাদামশায় চীৎকার করে উঠলেন, বেঞ্চিতে লাথি মারলেন। বোধ হল, তিনি মায়ের কথায় সত্যই লজ্জা পেয়েছেন।

মা ক্যালেণ্ডারখানার পাতার টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি ওগুলো একখানা ক্যালিকো কাপড়ের ওপর আঠা দিয়ে এঁটে দেব। তাতে আরও ভাল দেখাবে।..."

"আজই করে দাও। অন্য পাতাগুলো এখনই আন্‌ছি।"

তিনি দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন; কিন্তু সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে আঙুল বাঁকিয়ে দেখিয়ে বললেন, "ওকে বেত মারতে হবে।"

মা আমার দিকে ঘুরে বললেন, "সে আর বল্‌তে হবে না। কেন তুমি এ কাজ করেছো?"

—"আমি ইচ্ছে করেই করেছি। উনি যেন দিদিমাকে আর না মারেন। মারলে আমি ওঁর দাড়ি কেটে ফেলবো।"

দিদিমা তাঁর ছেঁড়া বডিসটা খুলে ফেলে মাথাটি ছুলিয়ে বললেন, "তুমি যা প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা মনে করে চুপ-চাপ থাকো। যদি চুপ করে না থাকো তোমার জিভ যেন ফুলে ওঠে।"

মা তাঁর দিকে তাকালেন এবং আমার কাছে সরে এলেন।

"উনি কখন দিদিমাকে মেরেছিলেন?"

দিদিমা রাগের সঙ্গে বললেন, "ওকে এ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত! এটা কি তোমার ব্যাপার?"

মা দিদিমার কাছে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন "মা! আমার ছোট্ট মা-টি।"

—"বাপু রাখো তোমার 'ছোট্ট মা-টি'। এখান থেকে যাও।"

তাঁরা দুজনে পরস্পরের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

* * * *

মা প্রথমবার বাড়ি এসে সৈনিকের স্ত্রী সেই আমুদে মহিলাটির সঙ্গে ভাব করেন। এবং প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই তিনি ওপরে সামনের দিককার ঘরে যেতেন। সেখানে কখন কখন বেৎলেংগা হাউসের সুন্দরী মহিলাগণকে ও পদস্থ কর্মচারীদের দেখতেও পেতেন। দাদামশায় এসব আদৌ পছন্দ করতেন না। একদিন তিনি যখন রান্নাঘরে বসে

আছেন, মাকে একটা চামচ নেড়ে শাসিয়ে বললেন, "তাহলে তুমি আবার তোমার পুরোনো পথ ধরেছো, গোল্লায় যাও! ভোরের আগে আমরা ঘুমোতেই পাই না।"

তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই ভাড়াটেদের তুলে দিলেন এবং তারা চলে গেলে কোথা থেকে যেন দু বোঝা আসবাব-পত্র এনে সামনের ঘরখানাতে পুরে বন্ধ করে মস্ত একটা তালা দিয়ে রাখলেন।

প্রতি রবিবারে ও ছুটির দিনে লোকে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসতে লাগলো। জাকফ-মামাও আসতেন তাঁর গিটারটি নিয়ে। আর আসতেন দিদিমার বোন ও তাঁর ছেলে। সঙ্গে আসতো একটি কোল কুঁজো, টাক মাথায় লোক। লোকটার কাজ ছিল ঘড়িতে দম দেওয়া। সে একপাশে মাথা হেলিয়ে ঘরের কোণে বস্‌তো। তার খাঁজকাটা কামানো থুংনিটা আঙুল দিয়ে টোকা দিতে দিতে অদ্ভুত ভাবে হাস্‌তো। তার একটি মাত্র চোখ দিয়ে সে আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাতো যে, তার মধ্যে অদ্ভুত এক ভাব প্রকাশ পেত। সে কথা বল্‌তো কম। তার প্রিয় কথা ছিল, "ব্যস্ত হবেন না।"

যখন আমি তাকে প্রথম দেখি তখন আমার বহুকাল আগের একটি দিনের কথা মনে পড়ে। আমরা তখন নিউ ষ্ট্রীটে থাকতাম। সেদিন ফটকের বাইরে ঢাকের থপ থপ আওয়াজ শুনতে পেলাম। ছুটে গিয়ে দেখলাম, একখানা গাড়িকে কতকগুলো সৈন্য ঘিরে আছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে কালো পোশাক-পরা কতকগুলো লোক। তারা যাচ্ছিল কয়েদখানা থেকে স্কয়ারে। গাড়িতে বেঞ্চিতে বসেছিল মধ্যমাকার একটি লোক। তার পায়ে শিকল-বাঁধা, মাথায় পশমের টুপি; তার বুকে ঝুলছিল একখানা কালো ট্যাবলেট। ট্যাবলেটখানার গায়ে সাদা বড় বড় হরফে কি যেন লেখা ছিল। লোকটা এমন ভাবে মাথা নিচু করে

ছিল যেন ট্যাবলেটে যা লেখা ছিল সে তা পড়ছিল। সে দুলছিল আর শিকলগুলো করছিল খড় খড়। তাই মা যখন ঘড়িতে-দম-দেওয়া লোকটিকে বললেন, "এই আমার ছেলে" আমি তখন ভয়ে তার কাছ থেকে সরে গিয়ে পিছনে হাত দিয়ে দাড়ালাম।



সে বললো, "ব্যস্ত হবেন না।" এবং আমাকে ধরেই লঘুভাবে চট করে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলো। বললো, "ঠিক আছে। বেশ বলিষ্ঠ ছোকরা।"

আমি কোণের দিকে সবে গিয়ে দাদামশায়ের চামড়া-মোড়া আরাম চেয়ারখানাতে বসে পড়লাম এবং সেখান থেকে সব দেখতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম, বড়দের আনন্দ উপভোগের ধারণা অতি বিরক্তিকর।...

সকলে 'রাম' দিয়ে চা খেতে লাগলেন। তারপর দিদিমার তৈরী পানীয় পান করলেন, দই খেলেন আর খেলেন মাখন, ডিম ও মধু দিয়ে তৈরী 'বন'। সকলে ঘামতে আরম্ভ করলেন, হাঁফাতে লাগলেন। এবং খাওয়া হয়ে গেলে চেয়ারে চেপে বসে জাকফ-মামাকে বাজাতে বললেন।

মামা নুয়ে পড়ে যন্ত্রে ঘা দিলেন, এবং একটি বিরক্তিকর, বেসুরো সুর বেজে উঠলো।

আমার ভালো লাগলো না। দিদিমা বললেন, "অন্য কোন গান কেন বাজাচ্ছো না, জাশা ?—একটা সত্যিকারের গান! মাণ্টেনা মনে পড়ে, আমরা যে-সব গান বাজাতাম ?"

খসখসে ফ্রকটা ছড়িয়ে দিয়ে দিদিমার বোন উত্তর দিলেন, "আজ-কাল গানের নতুন 'ফ্যাসান' হয়েছে মাটুশকা।"

দাদামশায় ঘড়িতে দম-দেওয়া মিস্ত্রির সঙ্গে হেঁয়ালির সঙ্গে কথা-

বার্তা বলছিলেন আর মাকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিলেন। আর সে ভদ্র ভুলেশ্বরের যে দিকে মা ছিলেন সেদিকে তাকাচ্ছিল, মাথা নাড়ছিল।



যে ব্যক্তি পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছে সে যেমন করে হাসে ভিকটর সারাজিয়েভ, দিদিমার বোনের ছেলে, তেমনি হাসি হেসে মেঝেতে পা ঘষে হঠাৎ সরু গলায় গান ধরলে, "আদ্রে পাপা! আদ্রে পাপা!"



সকলে চমকে উঠে কথা থামিয়ে তার দিকে তাকালো; আর ধোপানী অর্থাৎ দিদিমার বোন গর্ব্বভরে বললেন, "গানটা ও থিয়েটারে শিখেছে। থিয়েটারে ওই গানটা গায়।"

এই ভাবে দু-তিনটে সন্ধ্যা কাটলো। তারপর মিস্ত্রিটা এল একদিন দিনের বেলায়। আমি মায়ের কাছে বসে তাকে একটা ছেঁড়া কারুকার্য্যকরা কাপড় সেলাইয়ে সাহায্য করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল আর দিদিমা ছুটে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর মুখে ভয়ের চিহ্ন। তিনি ফিস্ ফিস্ করে বললেন, "ভারিয়া, ও এসেছে!" বলেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মা নড়লেন না, তাঁর একটি চোখের পাতাও কাঁপলো না, কিন্তু একটু পরেই আবার দরজাটা খুলে গেল। দাদামশায় এসে দাঁড়ালেন দরজায়। বললেন, "ভারভারা, পোশাক পরে এস।"

মা স্থির হয়ে বসে রইলেন এবং তাঁর দিকে না তাকিয়ে বললেন, "কোথায় আসবো?"

—"ভগবানের দোহাই। তর্ক করো না। লোকটা ভাল, শান্ত প্রকৃতি, ভাল কাজ করে। লেকসির বাবা হবে…"

মা তাকে শান্তভাবে বাধা দিয়ে বললেন, "এ হতে পারে না।"

দাদামশায় যেন অন্ধ এমনিভাবে হাত দুখানা বাড়িয়ে মায়ের দিকে

এগিয়ে তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়ে রাগে ফুলে খড়খড়ে গলায় বললেন, “এস। নাহলে টেনে নিয়ে যাবো—চুলের মুঠি ধরে।”

মা উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আমাকে তার কাছে টেনে নিয়ে যাবে!” এবং তাড়াতাড়ি তাঁর বডিস ও স্কারট খুলে ফেলতে লাগলেন। তাঁর মুখখানি ম্লান ও চোখদুটি সঙ্কুচিত হয়ে গেল। পরিশেষে সেমিজটি মাত্র গায়ে রইলো। তিনি দাদামশায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন “এবার তার কাছে আমাকে টেনে নিয়ে যাও।”

দাদামশায় দাত কড়মড় করতে করতে, তাঁর মুখের সামনে ঘুষি ঝাঁকিয়ে বললেন, “ভারভারা! এখনই পোশাক পর!”

মা তাঁকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দরজার হাতলটা ধরে বললেন, “কৈ? এস!”

দাদামশায় বললেন, “জাহান্নামে যাও।”

—“আমি ভয় পাই না—এস।”

মা দরজাটা খুলে ফেললেন, কিন্তু দাদামশায় তাঁর সেমিজটা চেপে ধরলেন এবং হাঁটু গেড়ে বসে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, “ভারভারা! শয়তান! আমাদের সর্ব্বনাশ করবে। তোমার লজ্জা-সরম নেই?”

দিদিমা মায়ের পথ আগলে ছিলেন। তাঁর মুখের কাছে এমন হাত নাড়ছিলেন যেন তিনি একটি মুরগী। তিনি মাকে দরজা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “ভারকা! এই বোকা! কি করছো? যাও, বেহায়া মাগী।”

তিনি মাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজায় হুক আটকে দিলেন। তারপর দাদামশায়কে টেনে তুলে বললেন, “এই বুড়ো শয়তান!”

তারপর তাঁকে কাউচে বসিয়ে দিলেন। এবং মাকে বললেন, “এখনই পোশাক পর।”

মেঝে থেকে পোশাকটা কুড়িয়ে নিয়ে মা বললেন, "কিন্তু আমি ওর কাছে যাচ্ছিনা—শুনছো?"

দিদিমা আমাকে কাউচ থেকে ঠেলে দিয়ে বললেন, "একপাত্র জল নিয়ে এস। শিগগির।"

আমি গলির দিকে ছুটে গেলাম।···শুনতে পেলাম মা বলছেন, "কাল আমি বাড়ি থেকে চলে যাবো।"

রান্নাঘরে গিয়ে জানলার পাশে বসে রইলাম যেন স্বপ্ন দেখছি।

শেষে মনে পড়লো আমাকে কি জন্য পাঠানো হয়েছে। একটা পিতলের পাত্রে খানিকটা জল নিয়ে গেলাম গলিতে। সামনের ঘর থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল সেই ঘড়িতে-দম-দেওয়া মিস্ত্রি। দিদিমা পেটের ওপর হাত দুখানি জোড়া করে রেখে তার পিছনে মাথা নুইয়ে কোমল স্বরে বললেন, "ব্যাপারটা যে কি তা তুমি নিজেই জান। তোমাকে জোর করে কারো প্রতি ভাল ব্যবহার করানো যায় না।"

সে দরজায় থামলো। তারপর বেরিয়ে গেল আঙিনায়। দিদিমা থরথর করে কাঁপছিলেন। তিনি নিজেই যেন বুঝতে পারছিলেন না, হাসবেন কি কাঁদবেন।

তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েছে?"

তিনি জলের পাত্রটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমার পায়ে খানিকটা ছিটিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "তাহলে এই জায়গাটাতে তুমি জলের জন্য এসেছিলে? দরজাটায় খিল লাগাও!" তিনি মায়ের ঘরে ফিরে গেলেন। আর আমি আবার গেলাম রান্নাঘরে। শুনতে পেলাম তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন, আর্তনাদ করছেন, কি বলছেন যেন একটি বোঝা, তাঁদের পক্ষে খুবই ভারী, বোঝা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরাচ্ছেন।

* * * *

দিনটি ছিল আলোভরা। তুষার-ছাওয়া জানলার সাসির মাঝ দিয়ে শীতের সূর্যের বাঁকা রশ্মিগুলি এসে পড়ছিল। টেবিলে সাজানো ছিল খাবার সরঞ্জাম। একটি গব্‌লেটে ছিল লাল রংয়ের ঘোল, আর একটিতে গাঢ় সবুজ রঙের ভদকা। দাদামশায় সেটি তৈরি করে ছিলেন। জানলায় যে-সবজায়গায় বরফ গলে গিয়েছিল সে-সব জায়গার মধ্য দিয়ে ছাদের ওপর এবং বেড়ার খুঁটিগুলোব গায়ের তুষার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। চোখ ধেঁধেঁ যায় এমন উজ্জ্বল ও রুপোর মতো ঝক ঝকে তুষার। জানলার চৌকাঠের গায়ে খাঁচায় আমার পাখীগুলো রৌদ্রে খেলা করছিল। নিরীহ সিস্‌কিনগুলো আনন্দে কলরব করছিল, রবিনগুলো শিষ দিচ্ছিল আর গোলড্‌ফিঞ্চগুলো গান করছিল।

কিন্তু এই উজ্জ্বল, শুভ্র দিনটি কোন আনন্দকেই আনল না। দিনটিকে, প্রত্যেক কিছুকেই মনে হচ্ছিল খাপছাড়া। পাখি-গুলোকে উড়িয়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনকে পেয়ে বসলো।

কিন্তু মাকে দেখাতে লাগলো সুখী ও শান্ত। তিনি দিদিমাকে চুম্বন করলেন। তাঁকে রাগ করতে বারণ করলেন। আর দাদামশায় একেবারে ক্লান্ত হয়ে টেবিলে বসে পড়লেন। তাঁর চোখে রোদ লাগলো। দিদিমার তৈরী পাইটা পুড়ে গিয়েছিল। তবু তিনি চোখ মিট্ মিট্ করতে করতে বললেন, "ওতেই হবে। ওতে কিছু এসে যায় না। ভাল পাই আমরা যথেষ্ট খেয়েছি। বস, ভারিয়া…"

তিনি এমন ব্যবহার করতে লাগলেন যেন তাঁর মাথা বিগড়ে গেছে।…দিদিমা তাঁকে বাধা দিয়ে রাগের সঙ্গে বললেন, "তুমি খাও…তুমি সব চেয়ে ভাল যে কাজটি করতে পারো তা হচ্ছে ওই।"

মা সারাক্ষণ হাস্য-পরিহাস করতে লাগলেন। তাঁর পরিষ্কার চোখ

ছুটি ঝক্ ঝক্ করতে লাগ্‌লো। তিনি আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন, "তাহলে তুমি তখন ভয় পেয়েছিলে?"

না, তখন ভয় পাই নি, কিন্তু এখন অস্থির ও বিহ্বল হয়ে উঠলাম। অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া চললো। রবিবারে ও ছুটির দিনে তাই ছিল নিয়ম। আমার বোধ হতে লাগলো মাত্র আধ ঘণ্টা আগে যারা পরস্পরকে গালাগাল দিচ্ছিল, পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করতে উদ্যত হয়েছিল, কাঁদছিল এরা তারা নয়।···কিন্তু সেই চোখের জল ও কান্না, পরস্পরের প্রতি সেই আক্রমণ পরিশেষে আমাকে আর উত্তেজিত ও ব্যথিত করতে পারতো না।

বহুপরে আমি উপলব্ধি করলাম কৃষকদের অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্যভরা জীবনের অফুরন্ত কাজের দিনগুলিতে দুঃখ হয়ে ওঠে ছুটি, অগ্নি লীলা হয় আমোদ, কাটা দাগ হয় মুখের অলঙ্কার। এই তাদের বিলাস।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পর মা হঠাৎ সকল কাজে স্বমত প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন; দৃঢ় হলেন এবং শীঘ্রই হয়ে উঠ্‌লেন সেই গৃহের কর্ত্রী। দাদামশায় হয়ে গেলেন গম্ভীর ও শান্ত; বাড়িতে তাঁর কোন খাতির রইলো না। তিনি কদাচিৎ বাড়ির বাইরে যেতেন; চিলে-কোঠায় বসে বই পড়তেন।

তাঁকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, বইখানা কি। কিন্তু তিনি গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, "যাই হোক্···একটু সবুর কর, আমি মরলে তুমি এখানা পাবে।"

তিনি মায়ের সঙ্গে খুব নরম ভাবে কথা-বার্ত্তা বল্‌তে লাগলেন, কিন্তু ক্রমেই কম।···

তাঁর ট্রাংকে ছিল নানা রকমের আশ্চর্য্য পোশাক-পরিচ্ছদ— সিল্কের স্কারট, প্যাড-দেওয়া সাটিনের জ্যাকেট, হাতা-কাটা গাউন, রূপালি জরি বসানো কাপড়, মুক্তোবসানো টায়রা, নানা রঙের রুমাল ও পাথর বসানো নেকলেশ। তিনি সেগুলো সব মায়ের ঘরে নিয়ে চেয়ার ও টেবিলের ওপর রেখে বললেন, "আমাদের যৌবনে পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল এখনকার চেয়ে আরও সুন্দর; আরও দামী। কিন্তু সে-সব অতীত। আর ফিরিয়ে আনা যায় না···এই নাও···পর···।"

মা অল্পক্ষণের জন্য তাঁর ঘরে গেলেন। এবং যখন ফিরে এলেন তাঁর পরিধানে গাঢ় নীল হাতকাটা সোনালি জরির কাজকরা পোশাক, মাথায় মুক্তো বসানো টায়রা। দাদামশায়কে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার চোখে কি রকম ঠেকছে বাবা?"

দাদামশায় বিড় বিড় করে কি বলে উল্লসিত হয়ে উঠ্‌লেন; এবং মায়ের চারধারে ঘুরে হাত দুখানি তুলে যেন ঘুমের ঘোরে কথা বলছেন, এম্নি জড়িয়ে বল্‌লেন, "এঃ! ভারভারা···যদি তোমার প্রচুর টাকা থাক্‌তো তাহলে তোমার চারদিকে সব চেয়ে ভাল লোক ঘোরা-ফেরা করতো···!"

মা তখন সামনের দিকের দুখানা ঘরে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে বহু লোক দেখা করতে আস্‌তো। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি আসতেন ম্যাকসিমোফরা। তাঁরা ছিলেন দু' ভাই। একজনের নাম ছিল পিটার। পিটার ছিলেন প্রিয়দর্শন; মুখে পাতলা দাড়ি, চোখ দুটি নীল। তিনি ছিলেন পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী। তাঁরই সামনে সেই

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির মাথায় থুথু ফেলবার জন্য দাদামশায় আমাকে শাস্তি দিয়েছিলেন।



বড়দিনের ছুটির দিনগুলি সকলে কাটাতেন আনন্দে হৈ-হল্লা করে। প্রতি সন্ধ্যায় লোকে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আস্‌তো। মাও বেশ-ভূষা পরে থাকতেন এবং তাঁদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেন।

তিনি যখনই তাঁর অতিথিদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেন তখনই বোধ হত যেন বাড়িখানি মাটিতে বসে গেছে এক ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা প্রতি কোণে সঞ্চিত হচ্ছে! দিদিমা বৃদ্ধা হংসীর মতো ডানা ঝাপটে সারা ঘরে ঘুরে-ফিরে সব জিনিষ গুছিয়ে রাখতেন। আর দাদামশায় ষ্টোভের গরম টালিতে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনে বলতেন, “আমাদের দেখতে হবে বংশ কি রকমের···”

বড়দিনের ছুটির পর মা মাইকেল-মামার ছেলে শাস্‌কা ও আমাকে স্কুলে দিলেন। শাস্‌কার বাবা আবার বিবাহ করেছিলেন এবং প্রথম থেকেই বিমাতা তাঁর সপত্নী পুত্রটিকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখ্‌ছিলেন ও তাকে মারতে আরম্ভ করেছিলেন। তাই দিদিমার কাকুতি-মিনতিতে দাদা-মশায় সাস্‌কাকে বাড়িতে রেখেছিলেন। আমরা দুজনে একমাস স্কুলে গেলাম এবং যতদূর মনে পড়ে, আমি যা শিখেছিলাম, তা হচ্ছে আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, “তোমার নাম কি” তাহলে মাত্র “পিয়েশকফ” বলে উত্তর দিতে হবে না, বলতে হবে “আমার নাম হচ্ছে পিয়েশকফ”। আর শিক্ষক-মশায়কে একথাও বলতেও হবে না, “আমাকে ধমকাবেন না, মশায়, আমি আপনাকে ভয় করি না।”

প্রথমে স্কুল আমার ভাল লাগতো না, কিন্তু আমার মামাতো ভাইটি প্রথমে খুব খুশি হয়েছিল। সহজেই অনেক বন্ধু করে নিয়েছিল।

একবার সে পড়া দেবার সময় ঘুমিয়ে পড়ে এবং হঠাৎ ঘুমের ঘোরে বলে ওঠে, "আমি কোরবো না!"

তারপরেই চমকে জেগে উঠে বিনা আড়ম্বরে ক্লাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। এর জন্য সকলে তাকে নির্দ্দয়ভাবে বিদ্রূপ করে; এবং পরদিন স্কুলে আসবার পথে আমরা যখন সিয়েনস্ভি স্কয়ারের ধারে এসে পড়ি সে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, "তুমি যাও…আমি যাব না…আমি বেড়াতে যাবো।"



সে উবু হয়ে বসে তুষারে গর্ত্ত করে তার মধ্যে বইগুলো রেখে তার ওপর বরফ চাপা দিয়ে চলে গেল। জানুয়ারি মাস। চারধারে রুপালি রৌদ্র ঝরে পড়ছিল। মামাতো ভাইটির ওপর আমার বড় হিংসে হতে লাগলো, কিন্তু মনকে কঠিন করে আমি স্কুলে গেলাম। মাকে আমি দুঃখ দিতে চাইলাম না। যে-বইগুলো সাস্কা পুঁতে রেখে ছিল সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কাজেই পরদিন তার স্কুলে না-যাবার যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল। কিন্তু তৃতীয় দিনে দাদামশায়কে তার ব্যবহারটা জানানো হল। বিচারের জন্য আমাদের দুজনের ডাক পড়লো। রান্নাঘরে দাদামশায়, দিদিমা ও মা টেবিলের ধারে বসে আমাদের জেরা করতে লাগলেন। সাস্কা দাদামশায়ের প্রশ্নের কি রকম মজার উত্তর দিয়েছিল, তা কখন ভুলবো না।

—"তুমি স্কুলে যাও নি কেন?"

—"স্কুলটা কোথায় ভুলে গিয়েছিলাম।"

—"ভুলে গিয়েছিলে?"

—"হাঁ। কেবলই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—"

—"কিন্তু তুমি আলেকসির সঙ্গে গিয়েছিলে। ওর মনে ছিল স্কুলটা কোথায়।"

—"আমি ওকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।"

—"লেকসিকে হারিয়ে ফেলেছিলে?"

—"হ্যাঁ।"



—"কি করে?

সাস্‌কা ক্ষণিক চিন্তা করে নিশ্বাস টেনে নিয়ে বললে, "তুষারপাত হচ্ছিল, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।"



সকলে হাসলেন—এমন কি সাস্‌কাও সাবধানে হাসলে। কিন্তু দাদামশায় দাঁত বার কার বিদ্বেষের সঙ্গে হাসলেন, "কিন্তু তুমি ওর হাত কি বেলট চেপে ধরতে পারতে; পারতে না?"

সাস্‌কা বললে, "চেপে ধরেও ছিলাম কিন্তু বাতাসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।"

সে অলস, হতাশ স্বরে কথাগুলো বলে যেতে লাগলো আর আমি তার ধৃষ্টতায় বিস্মিত হয়ে এই অনাবশ্যক, বিশ্রী মিথ্যা কথাগুলো অস্বস্তির সঙ্গে শুনে যেতে লাগলাম।

আমাদের প্রহার দেওয়া হল এবং এক হাত-ভাঙা প্রাক্তন বৃদ্ধ ইন্‌জিন-শ্রমিককে নিযুক্ত করা হল আমাদের স্কুলে নিয়ে যেতে এবং শিক্ষার পথ থেকে সাস্‌কা যাতে বিপথে গিয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। পরদিন, আমার মামাতো ভাইটি বড় রাস্তাটিতে গিয়ে পড়তেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো এবং পা থেকে একপাটি উঁচু বুট খুলে তার কাছ থেকে অনেকটা দূরে ছুঁড়ে দিলে। তারপর আর একপাটি খুলে বিপরীত দিকে ছুঁড়ে ফেলেই মোজা পায়ে ছুট্‌লো স্কোয়ার দিয়ে। বৃদ্ধ হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে বুট দুপাটি কুড়িয়ে নিয়ে ভীষণ বিচলিত হয়ে আমাকে বাড়ি নিয়ে গেল।

সেদিন, সারা দিনমান দাদামশায়, দিদিমা ও মা পালানো

ছেলেটিকে শহরে খুঁজে বেড়ালেন এবং তাঁরা যখন তাকে খুঁজে পেলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সে চিরকোফের শুঁড়িখানার জনসাধারণকে তার নাচ দেখিয়ে আমোদ দিচ্ছিল। তাঁরা তাকে বাড়ি নিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁরা তাকে কিছু বললেন না। সে আমার পাশে শুয়ে তাকের ওপর পা তুলে ছাদের গায়ে ঘষতে ঘষতে আস্তে আস্তে বললে, "আমার সৎমা আমাকে ভালোবাসে না, আমার বাবাও না। আর দাদামশায়ও নয়। কেন আমি ওদের সঙ্গে থাকবো? তাই দিদিমাকে বল্‌তে বলবো দস্যুরা কোথায় থাকে। আমি তাদের কাছে যাবো পালিয়ে···তখন তোমরা বুঝবে, সকলেই···আচ্ছা, আমরা দুজনে একসঙ্গে পালাই না কেন?"



কিন্তু আমি তখন তার সঙ্গে পালাতে পারতাম না; কারণ সে-সময়ে আমার সম্মুখে ছিল এক কঠিন কাজ। আমি একজন প্রকাণ্ড পাতলা দাড়িওয়ালা সামরিক কর্ম্মচারী হব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। সেজন্য লেখা-পড়া শিক্ষা করা ছিল একান্ত দরকার। আমার মামাতো ভাইকে আমার মতলবটি জানালে সে চিন্তার পর আমার সঙ্গে একমত হল।

"ভাল কথা। তুমি যে-সময়ে সামরিক কর্ম্মচারী হয়ে উঠবে আমি সে-সময়ে হয়ে উঠ্‌বো একজন দস্যু-সর্দ্দার। তোমাকে আমায় বন্দী করতে হবে। আর আমাদের একজনকে আর একজনকে মেরে ফেল্‌তে বা বন্দী করতেই হবে। আমি তোমাকে মেরে ফেল্‌বো না।"

—"আমিও তোমাকে মেরে ফেলবো না।"

সেই বিষয়টিতে আমরা হলাম এক মত।

তারপর দিদিমা ঘরে এলেন। তিনি ষ্টোভের ওপর উঠে আমাদের দিকে একবার তাকিয়েই বললেন, "এই নেংটি ইঁদুরগুলো? এঃ! অনাথ ছেলে দুটি!···বেচারী রে!"

তিনি সাস্‌কার বিমাতা—সরাইওয়ালার মুটকী মেয়ে আমার নাদেজদা-মামীকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করলেন, থামলেন না; এবং সব বিমাতাকেই গালাগাল দিতে লাগলেন! পরদিন যখন আমার ঘুম ভাঙলো, তখন গা লাল দাগে ভরে গেছে। সেই হল আসল বসন্তের আরম্ভ।



তাঁরা আমাকে পিছন দিককার চিলে-কোঠাটিতে রেখে দিলেন। সেখানে আমি দীর্ঘকাল অন্ধ হয়ে শক্ত করে হাত-পায়ে পটি বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইলাম। একদিন এমন বুকচাপাঁয় ধরে ছিল যে তাতে প্রায় মারা যেতে বসেছিলাম। দিদিমা ছাড়া আমার কাছে আর কেউই আসতেন না। তিনি আমাকে চামচ করে খাওয়াতেন যেন আমি একটি শিশু, এবং তাঁর অফুরন্ত গল্প-ভাণ্ডার থেকে আমাকে প্রত্যেকবার নতুন নতুন বলতেন।

একদিন সন্ধ্যায়, তখন আমি প্রায় সেরে উঠেছি, শুয়ে আছি। আমার পায়ে পটি বাঁধা ছিল না। হাত দুখানিতে পটি বাঁধা ছিল যাতে মুখ না চুলকোতে পারি। দিদিমা যে-সময়ে আস্‌তেন কি কারণে যেন সে-সময়ে এলেন না। তাতে আমার ভয় হল। তারপরই হঠাৎ তাঁকে দেখলাম। তিনি চিলে-কোঠাটার ধুলোভরা দরজাটার বাইরে হাত দুখানা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন; পিটার খুড়োর মতো তাঁর ঘাড়ের অর্দ্ধেক কাটা। আর, সেই মলিন গোধূলি আলোয় কোণ থেকে তাঁর দিকে একটা প্রকাণ্ড বিড়াল সবুজ লোলুপ চোখ দুটি মেলে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে গিয়ে পড়লাম আঙিনায় তুষার-ঝটিকায় মধ্যে। জানলার চৌকাঠে আমার পা আর ঘাড় ছড়ে গেল। তখন মায়ের সঙ্গে লোকেরা দেখা করতে এসেছিল। কাজেই সার্সির বা জানলার ফ্রেম ভাঙার শব্দ কেউ শুনতে

পেল না। আমাকে কিছুক্ষণ তুষারের ওপর পড়ে থাকতে হ'ল। আমার কোন হাড় ভাঙে নি বটে কিন্তু কাঁধের হাড় খুলে গিয়ে ছিল, ভাঙা কাচে শরীরের অনেক জায়গা কেটেও গিয়ে ছিল খুব, আর পা দুখানা নাড়বার শক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি তিন মাস বিছানায় পড়ে ছিলাম; নড়বার শক্তি একটুও ছিল না। স্থির হয়ে শুয়ে সব শুনতাম; ভাবতাম, বাড়িটা কি রকম দুমদাম শব্দ করছে; কত লোক আসছে-যাচ্ছে।



ছাদের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে প্রবল তুষার-ঝটিকা; দরজায় প্রতিধ্বনি তুলে বাতাস যাওয়া-আসা করছে, চিমনির মাঝে গাইছে অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীত, করছে খট্ খট্ শব্দ; দিবসে ডাকছে কাক এবং রাতের স্তব্ধতার মাঝে কানে এসে পৌঁছচ্ছে নেকড়ের করুণ ডাক। এম্নি সঙ্গীতের প্রভাবে আমার অন্তর বর্দ্ধিত হয়ে উঠতে লাগলো। পরে জানালাপথে মার্চ মাসের উজ্জ্বল রবি-নয়নে দেখা দিল লাজুক বসন্ত, প্রথমে শঙ্কায়, কোমলতায়; কিন্তু প্রতিদিনই সে হয়ে উঠতে লাগলো নির্ভীক ও খরতর। বসন্তের মর্ম্মরতা এমন কি দেওয়ালগুলো অবধি ভেদ করলে—স্ফটিক তুষার কণিকাগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে লাগলো। আধ-গলা তুষার ঝরে পড়ছিল আস্তাবলের চাল থেকে। দিদিমা যখন আমার কাছে আস্‌তে লাগলেন, তাঁর কথায় প্রায়ই ভদকার গন্ধ পাওয়া যেতে লাগলো এবং প্রতিদিনই তা হয়ে উঠতে লাগলো উগ্রতর। অবশেষে তিনি একটি বড় সাদা পট এনে আমার বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখতে লাগলেন আর চোখের ইসারা করে আমাকে বল্‌লেন, "আমাদের ঐ দাদামশায়টিকে কিছু বলো না, মানিক। বলবে?"

—"তুমি মদ খাও কেন?"

—"তাতে কি! বড় হলে তুমি বুঝবে।"

টী-পটটার নলে মুখ দিয়ে টেনে জামার হাতায় মুখ মুছে মিষ্টি করে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "বল দেখি বাবুমশায়, এই সন্ধ্যায় তুমি কোন্ বিষয় আমার কাছ থেকে শুনতে চাও?"



—"আমার বাবার বিষয়।"

—"কোথা থেকে শুরু করবো?"

আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম। তাঁর কথাগুলি তানমুখর স্রোতস্বতীর মতো বহুক্ষণ বয়ে গেল।

একদিন তিনি স্বেচ্ছায় আমাকে বাবার বিষয় বলতে আরম্ভ করেছিলেন। সেদিন তিনি ছিলেন বিষণ্ণ, ক্লান্ত! তিনি বলেছিলেন, "তোমার বাবার স্বপ্ন দেখেছিলাম। মনে হ'ল, তাকে শিষ্ দিতে দিতে আস্‌তে দেখলাম। তার পিছন পিছন আসছিল একটা কুকুর। তার জিভ্‌টা এক ধারে বে'রিয়ে পড়েছে। কোন কারণে আমি ম্যাকসিম সাবাতিয়েভিচের খুব ঘন ঘন স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিলাম···তার মানে তার আত্মা শান্তি পাচ্ছে না···"

পর পর কয়েকটি সন্ধ্যা তিনি আমার বাবার ইতিহাস বললেন। তাঁর সকল গল্পের মতোই সেটাও ছিল কৌতূহল-জাগানো।

আমার বাবা ছিলেন এক সৈনিকের ছেলে। ঠাকুরদা নিজের চেষ্টায় পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অধীন কর্ম্মচারীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হ'ন। এবং সেখানে—সাইবিরিয়ার কোন জায়গায়—আমার বাবার জন্ম হয়। বাবার জীবনটা ছিল দুঃখের; এবং খুব শৈশবেই তিনি বাড়ি থেকে পালাতেন। একবার ঠাকুরদা তাঁকে বনের মধ্যে খুঁজে বার করতে কুকুর ছেড়ে দেন, যেন তিনি একটা খরগোশ। আর একবার

তাঁকে ধরতে পেরে এমন নির্দ্দয়ভাবে মারেন যে, প্রতিবেশীরা ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে।

জিজ্ঞেস করছিলাম, “লোকেরা কি ছেলেদের সর্ব্বদাই মারে?”

দিদিমা শান্ত ভাবে বলেছিলেন, “সর্ব্বদা।”



আমার বাবার মা মারা যান আগে এবং তিনি যখন নয় বছরের তখন ঠাকুরদারও মৃত্যু হয়। তাঁর লালন-পালনের ভার নেয় একজন ক্রুশ-মিস্ত্রি। সে তাকে পাবম্ শহরের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়ে তার পেশা শিক্ষা দিতে শুরু করে। কিন্তু আমার বাবা তার কাছ থেকে পালিয়ে যান এবং অন্ধদের মেলায় পৌঁছিয়ে দিয়ে তাঁর জীবিকা অর্জ্জন করতে থাকেন। তাঁর বয়স যখন ষোলো বছর তখন তিনি নিজনিতে আসেন এবং একজন ষ্টীমার কনট্রাক্টরের কাছে কাজ নেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি হয়ে ওঠেন একজন দক্ষ ছুতোর মিস্ত্রি, চামড়া মোড়ার ও সাজাবার কাজেও হ'ন পাকা। যে-কারখানায় তিনি কাজ করতেন সেটি ছিল কোবলিখ ষ্ট্রীটে দাদামশায়ের বাড়ির পাশে।

দিদিমা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, “বেড়াটাও উঁচু ছিল না, আর কয়েকটি লোকও লাজুক ছিল না। তাই ভারিয়া আর আমি একদিন যখন বাগানে রাসপ্‌বেরি তুলছি সেই বেড়াটার ওপর উঠলো কে বলতো? তোমার বাবা ছাড়া আর কে হবে···আমি বোকার মতো ভয় পেলাম। কিন্তু সে আপেল গাছগুলোর মাঝ দিয়ে চল্‌লো। চমৎকার দেখ্‌তে, গায়ে সাদা শার্ট, পরনে ব্রীচেস্···খালি পা, মাথায় টুপি নেই, মাথার লম্বা চুলগুলো চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা। ঐ ভাবেই সে কোর্টশিপ করতে এসেছিল। যখন আমি প্রথমে তাকে জানলা দিয়ে দেখি, তখন নিজের মনে বলেছিলাম, ‘চমৎকার

ছোকরা!' তাই সে যখন আমার একেবারে কাছে এল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এ রকম করে আস কেন, ছোকরা?' "

"সে হাঁটু গেড়ে বসে বললে, 'আকুলিনা আইভানোভনা···আসি তার কারণ আমার সারা অন্তর আছে এখানে···ভারিয়ার কাছে। ঈশ্বরের দিব্যি, আমাদের সাহায্য কর! আমরা দুজনে বিয়ে করতে চাই।' সে কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম, মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। তাকিয়ে দেখলাম, তোমার মা, ঐ দুষ্টুটা রাসপবেরির মতো রাঙা হয়ে একটা আপেল গাছের আড়ালে লুকিয়ে তোমার বাবাকে ইসারা করছে; কিন্তু তার চোখে ছিল জল।

"বলে উঠলাম, 'ও শয়তানগুলো! কি করে এত সব করলে? তোমার কি চৈতন্য আছে ভারভারা? আর ছোকরা তুমি? ভেবে দেখ, তুমি কি করছো! তুমি কি জোর করে তোমার পথ করে নিতে চাও?'

"সে সময় দাদামশায় ছিলেন ধনী; কারণ ছেলেদের অংশ তখনও তিনি দেননি। তাঁর নিজেরই চারখানা বাড়ি আর টাকা ছিল। তার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও ছিল। তার অনেক দিন আগেই তাঁকে সকলে দিয়েছিল লেশ দেওয়া টুপি, আর একটা উর্দি। কারণ তিনি একটানা নয় বছর ব্যবসায়ী-সঙ্ঘের প্রধান ছিলেন—আর সে সময়ে তাঁর দেমাকও ছিল। আমার যা বলা উচিত আমি তাদের তাই বললাম; কিন্তু সারাটা ক্ষণ ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। তাদের জন্যে বড় দুঃখও হল। দুজনেই এমন বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল। তারপর তোমার বাবা বললে, 'আমি খুব ভাল করেই জানি বাসিলি বাসিলিচ ভারিয়াকে আমার হাতে দিতে রাজী হবেন না; তাই আমি ওকে চুরি করে নিয়ে যাবো। কেবল তোমাকে আমাদের সাহায্য করতে হবে।'

"আমাকে তোমাদের সাহায্য করতে হবে? আমি তাকে ঠাট্টা না করে থাকতে পারলাম না, কিন্তু তার মনকে কিছুতেই ফেরানো গেল না। সে বললে, 'তুমি আমাকে ঢিলই মার বা সাহায্যই কর, আমার কাছে সব একই কথা—আমি কিছুতেই ছাড়বো না।'

"তারপর ভারভারা তার কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললে, 'বিয়ে করবার কথা আমরা অনেক দিন থেকেই বলছি—মে মাসে আমাদের বিয়ে হওয়া উচিত।"

"তার কথায় আমি কি রকম চমকে উঠেছিলাম!

দিদিমা হাসছিলেন; তাঁর সারা দেহ কাঁপছিল। তারপর একটিপ নস্য নিয়ে চোখ মুছে বলেছিলেন, "তুমি এখনও বুঝতে পারবে না···বিয়ে করা মানে কি তা তুমি জানো না, কিন্তু তুমি এ কথা বুঝ্‌তে পারো যে বিয়ের আগে একটি মেয়ের সন্তান প্রসব করা হচ্ছে তার পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপদের। এ কথা মনে রেখো, যখন বড় হবে কোন মেয়েকে ও-পথে ভুলিয়ে নিয়ে যেও না। তোমার পক্ষে হবে ভীষণ পাপ—মেয়েটার হবে কলঙ্ক, ছেলেটা হবে জারজ। দেখ যেন এটা ভুল না! তুমি মেয়েদের ওপর সদয় হবে, তাদের জন্যেই তাদের ভালোবেসে, লালসার জন্যে নয়। তোমাকে সৎ পরামর্শ দিচ্ছি।"

তিনি চেয়ারে দুলতে দুলতে চিন্তার মাঝে তলিয়ে গেলেন। তারপর দেহটাকে নাড়া দিয়ে আবার বল্‌তে লাগলেন, "কি করা যাবে? আমি ম্যাকসিমের কপালে মারলাম চড়, ভারিয়ার বেণী ধরে দিলাম নাড়া; কিন্তু ম্যাকসিম ঠিক কথাই বললে, 'ঝগড়ায় সব মিটে যাবে না।' আর তোমার মা বললে, 'ভেবে দেখা যাক প্রথমে কি করলে সব চেয়ে ভাল হবে। ঝগড়া করা যাবে পরে।'

তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার টাকা-কড়ি কিছু আছে ?"

সে উত্তর দিলে, 'ছিল কিছু ; কিন্তু তা দিয়ে ভারিয়াকে একটা আংটি কিনে দিয়েছি।'

—'তখন তোমার কাছে কত ছিল ?'

—'প্রায় এক শ রুবল।'

"এখন, সে-সময়ে টাকা-কড়ি এমন সস্তা ছিল না, জিনিষ-পত্রের দামও ছিল আক্রা। আমি দুটিকে দেখতে লাগলাম—তোমার মা আব বাবাকে—আর মনে মনে বললাম, 'কি ছেলেমানুষ! কি বোকা!'

"তোমার মা বললে, 'আংটিটা আমি মেঝের নিচে লুকিয়ে রেখেছি, যাতে তুমি দেখ্‌তে না পাও। আমরা সেটা বেচতে পারি।'

"তারা এমন ছেলেমানুষ—দুজনেই! যা হোক্, এক সপ্তাহের মধ্যে কি করে বিয়ে হতে পারে সে-সমস্ত আলোচনা করলাম ; এবং প্রতিজ্ঞা করলাম, পাদ্রির সঙ্গে সব বন্দোবস্ত আমিই করে ফেলবো।. কিন্তু নিজেরই বড় অসোয়াস্তি বোধ হতে লাগলো। কারণ বড় ভয় হতে লাগলো দাদামশায়কে। আর ভারিয়াও বড় হয়েছিল। তা, আমরা সব বন্দোবস্ত করে ফেললাম।

"কিন্তু তোমার বাবার একজন শত্রু ছিল—একজন কারিগর। লোকটার মন ছিল বিশ্রী। সে অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিল, কি চলছে। সে আমাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে লাগলো। আমার একমাত্র মেয়েকে যা-কিছু ভাল পেলাম তাই দিয়ে সাজালাম। তারপর তাকে বার করে নিয়ে গেলাম ফটকে। সেখানে একখানা ট্রইকা দাঁড়িয়ে ছিল। সে তাতে উঠলো ; ম্যাকসিম শিষ দিলে।

তারপর দুজনেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল ! চোখে জল নিয়ে আমি ঘরে ফিরে যাচ্ছি, এমন সময়ে সেই লোকটির সঙ্গে দেখা। সে খ্যান খ্যানে গলায় বলে উঠলো, 'আমার মনে কোন গোল নেই ; নিয়তির খেলায় আমি বাধা দেব না। আকুলিনা আইভানোভ্‌না, চুপ করে থাকবার জন্যে আমাকে কেবল পঞ্চাশটি রুবল দিতে হবে।'

"কিন্তু আমার কাছে টাকা-কড়ি কিছুই ছিল না। আমি টাকা-কড়ি রাখা পছন্দ করতাম না বা সঞ্চয়ের ইচ্ছাও আমার ছিল না। তাই বোকার মতো বল্‌লাম, 'আমার টাকা-কড়ি নেই, কাজেই আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারবো না।'

"সে বললে, 'তুমি দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করতে পারো।'

"কেমন করে তা পারি ? প্রতিজ্ঞার পর কোথা থেকে টাকা পাবো ?"

"সে বললে, 'পয়সাওয়ালা স্বামীর কাছ থেকে চুরি করা কি এতই কঠিন ?'

"আমি যদি বোকা না হতাম তাহলে তার কথায় সায় দিতাম। কিন্তু আমি তার নোংরা মুখখানাতে থুথু দিয়ে বাড়িতে গেলাম ঢুকে। আর সে আঙিনায় ছুটে এসে চীৎকার করতে লাগলো।"

চোখ দুটি বন্ধ করে দিদিমা সহাস্যে বললেন, "আমার সেই দুঃসাহসিক কাজটির স্মৃতি এখনও মনে পড়ে। দাদামশায় বন্য পশুর মতো গর্জন করতে লাগলেন ; জানতে চাইলেন আমরা তাঁকে নিয়ে মজা করছি কি না ! আবার ব্যাপারটি তখন এমন হয়েছিল যে, তিনি কিছুদিন থেকেই ভারিয়ার হিসাব-নিকেশ করছিলেন আর তার সম্বন্ধে অহঙ্কার করছিলেন, 'বড় ঘরে, ভদ্র-লোকের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব !' শেষে তার জন্যে এল এক চমৎকার

ভদ্রলোক! কিন্তু জননী মেরীই আমাদের চেয়ে ভাল জানেন, কি রকমের দুটি মানুষকে একসঙ্গে গেঁথে দিতে হবে।”

“দাদামশায় সারা আঙিনায় ছুটে বেড়াতে লাগলেন যেন তাঁর গায়ে আগুন লেগেছে; আর মাইকেল ও জাকফকে ডাকতে লাগলেন। সেই শয়তান কারিগরটির পরামর্শ শুনে, এমন কি, কোচোয়ান ক্লিমাকে ডাকলেন; তাকে একটা চামড়ার ফিতে নিতে দেখলাম। ফিতেটার মাথায় ছিল একটা সীসে বাঁধা; আর মাইকেল নিল তার বন্দুক। সে-সময়ে আমাদের ঘোড়াগুলো ছিল ভাল, তেজী; আর গাড়িও ছিল হালকা। মনে হল ওরা নিশ্চয়ই তাদের পথে ধরবে। কিন্তু ঠিক তখনই ভারিয়ার ভাগ্যদেবী আমাকে এক মন্ত্রণা দিলেন। আমি একখানা ছুরি দিয়ে ব্যোমের দড়িগুলো সব কেটে ফেললাম। ঠিক হয়েছে! এবার পথে চলতে বাধা পাবে! হলও তাই। পথে ব্যোমটা গেল খুলে, দাদামশায়, মাইকেল ও ক্লিমা মারা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল; তাছাড়া পথে হ'ল দেরি। তারপর যখন তারা ব্যোমটা ঠিক করে গাড়ি হাঁকিয়ে গির্জ্জায় গিয়ে পৌঁছলো তখন ভারিয়া আর ম্যাক্সিম বিয়ে করে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আছে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

“তারপর আমাদের লোকেরা ম্যাকসিমের সঙ্গে মারামারি শুরু করলে। কিন্তু তার স্বাস্থ্য ছিল বড় খাসা, তার গায়ে ছিল অসাধারণ জোর। সে মাইকেলকে ধরে বারান্দা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার হাত ভেঙে ফেললে। ক্লিমাও আহত হল। আর দাদামশায়, জাকফ আর সেই কারিগরটা তো ভয়ে সারা!

“এমন কি রাগের মধ্যেও সে বুদ্ধি হারালো না, দাদামশায়কে বললে, ‘ঐ চামড়ার ফিতেটা আপনি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন।

আমার চারধারে ঘোরাবেন না। কারণ আমি শান্তিপ্রিয় লোক। ভগবান আমাকে যা দিয়েছেন আমি কেবল তাই নিয়েছি। কেউই তা আমার কাছ থেকে নিতে পারবে না…'



"তারপর তারা আর কিছু করলে না। দাদামশায় এই বল্‌তে বল্‌তে গাড়িতে ফিরে এসে উঠ্‌লেন, 'এবার বিদায়, ভারভারা! তুমি আর আমার মেয়ে নও। আমি তোমাকে আর দেখ্‌তে চাই না।'



"তিনি বাড়ি এসে আমাকে মারলেন, গালি দিলেন; কিন্তু আমি কেবল কাঁদলাম, একটি কথাও বললাম না।

"সবই চলে যায় যা হবার তা হবেই। তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'দেখ, আকুলিনা, তোমার কোন মেয়ে নেই। এ কথা মনে রেখো।'

"কিন্তু আমি কেবল মনে মনে বললাম, 'আরও মিছে কথা বল্ কটা-চুলো, হিংসুটে বুড়ো—বল্ যে বরফ গরম।' "

আমি তাঁর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলাম, কথাগুলো গিলেছিলাম। তাঁর কাহিনীটির কোন কোন অংশ আমাকে বিস্মিত করেছিল। কারণ দাদামশায় মায়ের বিয়ের বর্ণনা দিয়েছিলেন অন্য রকম। তিনি বলেছিলেন, তিনি বিয়েটার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং বিয়ের পর মাকে তাঁর বাড়িতে আস্‌তে বারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়েটা গোপনে হয় নি; বিয়ের সময় তিনি গির্জ্জায় উপস্থিত ছিলেন। আমি দিদিমাকে জিজ্ঞেস করিনি, তাঁদের মধ্যে সত্য কথা বলছেন কে। কারণ দুটো গল্পের মধ্যে তাঁরটাই ছিল সুন্দর। আর সেটাই আমার সব চেয়ে ভাল লাগতো।…

"প্রথমে দু' সপ্তাহ আমি জানতেই পারি নি, ম্যাকসিম আর ভারভারা কোথায়। তারপর একটি ছোট ছেলেকে দিয়ে তারা

আমাকে বলে পাঠালে। ছেলেটি এসেছিল খালি পায়ে। এক শনিবারে তাদের দেখতে গেলাম। বাড়িতে সকলে জানলে আমি গেছি গির্জায় সান্ধ্যোপাসনায় ; কিন্তু তার বদলে গেলাম তাদের কাছে। তারা অনেক দূরে, স্বয়েতিনসক স্লোপে, একখানা বাড়ির একধারে ওপর তলায় থাকতো। সেখান থেকে পাশের কারখানাটা দেখা যেত—ধুলো উড়ছে, নোংরা, সব সময়ে গোলমাল। কিন্তু তাদের সেদিকে খেয়ালই ছিল না—তারা ছিল যেন দুটি বিড়াল, পরম সুখী। এক সঙ্গে খেলা করছে। যা পারতাম তাদের জন্যে সঙ্গে নিয়ে যেতাম—চা, চিনি, নানা রকমের ডাল, গম, ময়দা, শুকনো ব্যাঙের ছাতা আর সামান্য কিছু টাকা। টাকা কটা দাদামশায়ের তবিল থেকে চুরি করতাম। তুমি চুরি করতে পার বুঝলে? যদি সেটা তোমার জন্যে না হয়। কিন্তু তোমার বাবা কিছুই নিতে চাইতো না; বলতো 'আমরা কি ভিখারী?' ভারভারাও ঐ সুরে বলে উঠতো, 'আঃ! এ সব কেন মা?'

"আমি তাদের উপদেশ দিতাম। বলতাম, 'এই বোকা দুটো, জানতে চাই, আমি কে?…ভগবান তোমাদের যে মা দিয়েছেন আমি সে। আর তুমি বোকা মেয়েটা হচ্ছ আমারই রক্ত-মাংস। আমার মনে তুমি কষ্ট দিতে চাও? জানো না কি এই পৃথিবীতে তোমার নিজের মাকে যখন কষ্ট দাও, তখন স্বর্গে ভগবানের মা গভীর দুঃখে চোখের জল ফেলেন?'

"তখন ম্যাকসিম আমাকে কোলে নিয়ে সারা ঘরে ঘুরতে লাগলো। তার গায়ে ছিল খুব জোর, ভালুকটা! আর ভারভারা, শয়তানটা, তার স্বামীর জন্য হয়ে উঠেছিল ময়ূরীর মতো দেমাকি। সে তার দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছিল যেন সে একটা নতুন পুতুল। আর এমন

ভাবে ঘর-সংসারের কথা বল্‌তে লাগলো যেন সে পাকা গিন্নী! তার কথা শুনে হাসি পেতে লাগলো।...

"এইভাবে অনেক কাল চললো। তোমার ভূমিষ্ঠ হবার সময় আসছিল ঘনিয়ে, কিন্তু তবুও দাদামশায় একটি কথাও বললেন না—আমাদের বুড়োটা ভারী জেদী! সে জান্‌তো আমি গোপনে তাদের দেখতে যাই। কিন্তু যেন জানে না এমনি ভাব দেখাতো। বাড়িতে প্রত্যেককে মারিয়ার কথা বল্‌তে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল। তাই তার কথা কেউ বলতো না। আমিও তার কথা বলতাম না; কিন্তু জানতাম পিতৃ-হৃদয় দীর্ঘদিন নীরব থাকতে পারে না। অবশেষে সঙ্কট সময়টি এল। তখন রাত্রি। এমন করে তুষার-ঝড় বইছিল যে মনে হচ্ছিল জানলার গায়ে ভালুক লাফিয়ে পড়ছে। চিমনির ভিতরে বাতাস হুঙ্কার দিচ্ছে যেন দানবেরা মাতামাতি করছে। দাদামশায় আর আমি শুয়ে ছিলাম, কিন্তু ঘুমোতে পারছিলাম না।

"বললাম 'এই রকম রাত গরীবের পক্ষে খারাপ; কিন্তু যাদের মনে শান্তি নেই তাদের পক্ষে সব চেয়ে খারাপ।'

"তারপর দাদামশায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা কেমন আছে? ভাল?'

"জিজ্ঞেস করলাম, 'কাদের কথা বলছো? আমাদের মেয়ে ভারভারা আর আমাদের জামাই ম্যাকসিমের কথা?'

—" 'কার কথা বল্‌ছি তুমি কি করে বুঝলে?' "

—"বললাম, 'ঢের হয়েছে বাবা; ন্যাকামী ছাড়ো। ওতে কি সুখ পাও?'

"তিনি নিশ্বাস টানলেন; বললেন, 'শয়তানী! বুড়ী শয়তানী!'

"একটু পরে বললেন, 'লোকে বলে সে বড় বোকা, ( উনি তোমার বাবার কথা বলছিলেন। ) সত্যিই ও বোকা ?' "

"বললাম, 'বোকা তাকেই বলে যে কাজ করে না, লোকের গলগ্রহ হয়ে থাকে। এই দেখ জাকফ আর মাইকেলকে। ওরা কি বোকার মতো জীবন কাটায় না ? এ-বাড়িতে কাজ করে কে ? কে টাকা রোজগার করে ? তুমি ! ওরা দুজনে যে তোমায় সাহায্য করবে তাও পারে কি ?'



তারপর তিনি আমাকে নানা রকম গালাগাল দিতে লাগলেন। আমি চুপ করে রইলাম। "বললেন, 'ঐ রকম একটা লোকের বশ হও কি করে ? যখন জান না, ও কোথা থেকে এসেছে, ও কি ?' "

"তবুও একটি কথাও বললাম না ; শেষে বললাম, 'তোমার গিয়ে দেখা উচিত তারা কেমন করে দিন কাটাচ্ছে। তারা বেশ আছে।' "

"তিনি বললেন, 'তাতে ওদের খুব বেশি সম্মান দেওয়া হবে। ওরা এখানেই আসুক।"

"সে কথায় আমি আনন্দে কেঁদে ফেললাম ; আর তিনি আমার খোঁপা খুলে দিলেন। ( তিনি আমার চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসতেন। ) আর বললেন, 'অমন আত্মহারা হয়ো না, নির্বোধ। তুমি কি মনে কর আমার হৃদয় নেই ?"

"সকলের চেয়ে বেশি চালাক এই ধারণাটা আমাদের দাদামশায়ের মাথায় ঢোকবার আগে উনি খুবই ভাল ছিলেন। তারপর থেকেই উনি হয়েছেন হিংসুটে, বোকা।"

"তা, একদিন তোমার বাবা-মা এলেন। দুজনেরই লম্বা-চওড়া তেল-চকচকে শরীর, দুজনেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ম্যাক্সিম দাদামশায়ের সামনে দাঁড়ালো। তিনি তার কাঁধে হাত রাখলেন।

"সে বললে, 'বাসিলি বাসিলিচ, ভাববেন না যেন আমি আপনার কাছে যৌতুকের জন্যে এসেছি; আমি এসেছি আমার স্ত্রীর বাবাকে সম্মান দেখাতে।'

"দাদামশায় তাতে খুব খুশি হলেন, হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'আরে লড়ুয়ে! ওরে ডাকাত! আচ্ছা, এবারটা সব ছেড়ে দেওয়া গেল। আমাদের সঙ্গেই থাকো।"

ম্যাকসিম ভ্রূ কুঁচকে বললে, 'ভারিয়ার যেমন ইচ্ছে তাই হবে। আমার কাছে সবই সমান।'

"আর তারপরই আরম্ভ হ'ল। দু'জনে এক সময়ও বন্‌তো না; কিছুতেই দু'জনের মিল হ'ত না। আমি তোমার বাবাকে চোখের ইসারা করতাম; টেবিলের নিচে দিয়ে লাথি মারতাম। কিন্তু তাতে কোন কাজই হত না। সে নিজের মত আঁকড়ে থাকতো৷ তার চোখ দুটি ছিল সুন্দর। খুব উজ্জ্বল, পরিষ্কার; ভ্রূ জোড়া ছিল কালো। ভ্রূ কোঁচকালে চোখ একেবারে ঢাকা পড়তো, মুখখানা হত পাথরের মতো কঠোর। আমার কথা ছাড়া আর কারো কথা সে শুনতো না। আমি তাকে আমার নিজের ছেলে-মেয়েদের চেয়েও—যদি সম্ভব হয় —ভালোবাসতাম বেশি। সে তা জানতো। সেও আমাকে ভালো-বাসতো। কখন কখন সে আমাকে জড়িয়ে ধরতো; আমাকে কোলে নিয়ে সারা ঘরে ঘুরতে ঘুরতে বলতো, 'এই পৃথিবীর মতো তুমি হচ্ছ আমার সত্যিকারের মা। তোমাকে ভারভারার চেয়ে বেশি ভালোবাসি।' আর তোমার মা ছুটে এসে বলে উঠতো, 'এই বদমায়েশ, এমন কথা বল্‌তে তোমার সাহস হয়?' তোমার মা যখন খুব খুশি থাকতো তখন দুষ্টু হয়ে উঠতো। আমরা ছিলাম সুখী। তোমার বাবা চমৎকার গানও গাইতে পারতো। আর, সব এমন

সুন্দর গান জানতো! গানগুলো সে সংগ্রহ করেছিল অন্ধদের কাছ থেকে। অন্ধদের চেয়ে ভাল গাইয়ে আর কেউ নেই।

"তারা বাগানে বাইরের বাড়িটাতে ঘর-করনা পেতে বস্‌লো। আর সেইখানেই যখন ঢং ঢং করে বেলা দুপুর বাজছে, তোমার জন্ম হ'ল। তোমার বাবা দুপুরে খাবার জন্যে বাড়ি এল। তখন তুমি ছিলে তাকে অভিনন্দন জানাতে। সে এত খুশি হয়ে ছিল যে, আত্ম-হারা হয়ে পড়েছিল। তোমার মাকে প্রায় ক্লান্ত করে ফেলেছিল। যেন সে বুঝতেই পারছিল না, এই পৃথিবীতে একটি সন্তানের জন্ম দেওয়া কি কঠোর পরীক্ষা। সে আমাকে কাঁধে নিয়ে আঙিনা পেরিয়ে চললো দাদামশায়ের কাছে খবরটি দিতে—যে রঙ্গমঞ্চে আর একটি দৌহিত্র এল। এমন কি দাদামশায়ও হেসে উঠে বলেছিলেন, 'ম্যাকসিম, তুমি কি রকম দৈত্য বলতো?'

কিন্তু তোমার মামারা তাকে পছন্দ করতো না। সে মদ খেত না, নির্ভয়ে কথা-বার্ত্তা বল্‌তো, সকল রকমের নষ্টামিতে ছিল পরম পাকা। তার জন্যে তাকে তিক্ত ফলও ভোগ করতে হয়েছিল। যেমন, একদিন ঈষ্টারের সময় বাতাস উঠলো। হঠাৎ সারা বাড়িতে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। বুঝতে পারলাম না, তার মানে কি? দাদামশায়ও ভয়ঙ্কর ভয় পেলেন। সারা বাড়িতে আলোগুলো জ্বালিয়ে রাখতে বলে ছুটোছুটি করতে করতে প্রাণপণে চীৎকার করে বললেন, 'আমরা সকলে একসঙ্গে উপসনা করবো!'

"তারপরই শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। তাতে আমাদের ভয় আরও বাড়লো। তখন জাকফ-মামা বুঝতে পারলে। সে বললে, "এ ম্যাকসিমের কাজ।" পরে ম্যাকসিম স্বীকার করে ছিল, সে অনেক-গুলো বোতল আর নানা রকমের গেলাস জানলায় লাগিয়ে দিয়েছিল।

সেগুলোর ভেতর দিয়ে বাতাস যাবার সময় ঐ রকম শব্দ হচ্ছিল।

একবার খুব তুষার পাত হল। নেকড়ের পাল মাঠ থেকে শহরেও আসতে লাগলো। তারা কুকুর মারতে লাগলো, ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে দিতে লাগলো। আর, মাতাল চৌকিদারদের খেয়ে ফেলতে লাগলো। তাতে লোকের মন গেল আতঙ্কে ভরে, কিন্তু তোমার বাবা তার বন্দুকটি নিয়ে বরফে চলবার জুতো পায়ে দিয়ে দুটো নেকড়েকে শিকার করে আনলে। সে তাদের চামড়া ছাড়িয়ে, মাথা দুটো পরিষ্কার করে তাতে কাঁচের চোখ বসিয়ে দিলে। জিনিষটা দেখতে হল সত্যিই খাসা। মাইকেল-মামা কিসের জন্যে যেন গলিতে গিয়েই ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। তার মাথার চুলগুলো তখন খাড়া হয়ে উঠেছে, চোখদুটো ঘুরছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে, কথা বলতে পারছে না। অবশেষে ফিস্ ফিস্ করে বললে, 'নেকড়ে!' প্রত্যেকে হাতের কাছে অস্ত্রস্বরূপ যা পেল তাই নিয়ে আলো শুদ্ধ ছুটলো দরজায়। সকলে ঠাহর করে দেখলো একটা উঁচু মঞ্চের আড়াল থেকে একটা নেকড়ের মাথা বেরিয়ে আছে। তারা সেটাকে মারতে লাগলো; তাকে গুলি করলে। কিন্তু সেটা কি বলতো? তারা আরও কাছে গিয়ে দেখলো, সেটা একখানা খালি চামড়া আর একটি নেকড়ের মাথা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার সামনের পা দুখানা মঞ্চের গায়ে পেরেক দিয়ে রয়েছে গাঁথা!

"তারপর জাকফও এই নষ্টামিতে যোগ দিল। ম্যাকসিম একখানা কার্ডবোর্ড কেটে একটা মাথা তৈরি করে তার নাক, চোখ ও মুখ বসিয়ে তাতে শণের ফেঁসো আঠা দিয়ে চুলের মতো করে আটকে দিলে। তারপর জাকফের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে লোকের

জানলায় সেই বিকট মুখখানা ঢুকিয়ে দিতে লাগলো। লোকে সেটা দেখেই ভয়ে চীৎকার করে ছুটে পালিয়েছিল। এম্নি ধরনের আরও অনেক আমাজ্জিত রসিকতা তারা করে বেড়াতো; কিছুই তাদের বাধা দিতে পারতো না। আমি অনুনয় করে, এসব ছেড়ে দিতে বলতাম; ভারিয়াও বলতো। কিন্তু তারা ছাড়তে চাইতো না। ম্যাকসিম কেবল হাসতো।

"এ সব শেষে ফিরে লাগলো তারই মাথায়; আর তাকে প্রায় শেষ করেও ফেলেছিল। তোমার মাইকেল-মামা, সে সর্ব্বদা দাদামশায়ের সঙ্গে থাকতো, একটুতেই অসন্তুষ্ট হ'ত। সে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ে না। তোমার বাবাকে সরাবার জন্যে সে একটা উপায় ঠিক করেছিল। তখন শীতের আরম্ভ। তারা এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরে আসছিল। তারা ছিল চারজন—ম্যাকসিম, তোমার দুই মামা আর একজন ডিকন। একজন গাড়োয়ানকে মেরে ফেলবার জন্যে পরে তাঁকে নিচের পদে নামিয়ে দেওয়া হয়। তারা ইয়ামসকি ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়ে এসে ম্যাকসিমকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় ডিউকফ পুকুরটার ধারে। এবং এমন ভাব দেখায় যেন 'স্কেট' করতে যাচ্ছে। তারা বরফের ওপর দিয়ে ছোট ছেলেদের মতো করে পা-হড়কে যেতে আরম্ভ করে; আর ম্যাকসিমকে একটা বরফের গর্ত্তর কাছে টেনে নিয়ে যায়। তারপর তাকে তার মধ্যে ঠেলে ফেলে দেয়—কিন্তু সে কথা আমি তোমাকে বলেছি।"

—"আমার মামারা এমন খারাপ কেন?"

এক টিপ নস্য নিয়ে দিদিমা শান্ত ভাবে বললেন, "ওরা খারাপ নয়। ওরা হচ্ছে বোকা! ওরা ম্যাকসিমকে ঠেলা দিয়ে জলে ফেলে দেয় কিন্তু ডোববার সময় সে গর্ত্তটার কিনারা চেপে

ধরে। তারা গোড়ালি দিয়ে তার আঙুলগুলো থেঁৎলে দিতে থাকে। সৌভাগ্যবশত সে শান্ত ছিল আর ওরা হয়ে পড়েছিল মাতাল। সে বরফের নিচে সরে গিয়ে মুখখানা জলের ওপর দিকে ভাসিয়ে রেখে ছিল যাতে নিশ্বাস নিতে পারে। কিন্তু তারা ওকে ধরতে পারে না। একটু পরেই সকলে সেখান থেকে চলে যায়। কিন্তু ম্যাকসিম বরফ আঁকড়ে ধরে ওপরে উঠে ছুটে যায় থানায়। তুমি তো জান, থানাটা জায়গাটার কাছে বাজারের ধারে। তখন যে-ইনস্পেকটারটির ডিউটি ছিল তিনি তাকে আর আমাদের পরিবারটিকে চিনতেন। জিজ্ঞেস করেন, 'কেমন করে এটা হল?"

দিদিমা কৃতজ্ঞতাভরা কণ্ঠে বললেন, "ভগবান ম্যাকসিম্ সাবাতিয়েভিচের আত্মাকে শান্তিতে রাখুন! সে তার যোগ্য; কারণ, সে পুলিশের কাছ থেকে সত্যটা গোপন রেখেছিল। সে বলে, এটা আমারই দোষ। আমি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পুকুরটার ধারে গিয়ে পড়ি। তারপর হোঁচট খেয়ে গর্ত্তটার মধ্যে পড়ে যাই।'

ইনস্‌পেকটার বলেন, 'কথাটা সত্যি নয়। তুমি মদ খাও নি।'

"যাহোক্ ব্যাপারটার সার কথা এই যে, তারা ম্যাকসিমের গায়ে ব্র্যাণ্ডি মালিশ করে তাকে শুকনো পোশাক্ পরিয়ে তাঁর গায়ে ভেড়ার চামড়া জড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে। তাকে সঙ্গে করে এনেছিলেন স্বয়ং ইনসপেক্‌টর এবং আরও দুজন। জাস্‌কা আর মিশকা তখনও ফেরে নি; তারা গিয়েছিল একটা শুঁড়িখানায় ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে উৎসব করতে। তোমার মা আর আমি ম্যাকসিমের শুশ্রূষা করতে লাগলাম। সে তখন একেবারে বদলে গিয়েছিল। তার মুখখানা হয়ে গিয়েছিল নীল, আঙুলগুলো গিয়েছিল ছড়ে; আর সেগুলোর ওপর রক্ত শুকিয়ে জমে ছিল; মাথার লম্বা কোঁকড়া চুল-

গুলোয় যে তুষারের ফুল ফুটেছিল, কেবল সেগুলো গলছিল না। তার চেহারাটা হয়ে গিয়েছিল ফ্যাকাসে।



“ভারভারা চীৎকার করে উঠলো, ‘ওরা তোমার এ কি দশা করেছে?’



“ইনস্পেক্টার আসল ব্যাপারটার গন্ধ পেয়ে জেরা করতে লাগলেন। ইনস্পেক্টারকে ভারভারার ঘাড়ে চাপিয়ে শান্ত ভাবে ম্যাক্সিমের কাছ থেকে সত্যি ব্যাপারটা বার করবার চেষ্টা করলাম। ‘কি হয়েছে বল দেখি?’

“সে ফিস্ ফিস্ করে বললে, ‘প্রথমে তোমাকে এই কাজটি করতেই হবে, জাকফ আর মাইকেলের জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকো গে। ওদের সঙ্গে দেখা হলেই বলবে, ওরা যেন বলে আমার কাছ থেকে ওদের ছাড়াছাড়ি হয় ইয়ামসকি স্ট্রীটে। সেখান থেকে ওরা যায় পোক্রোস্কি স্ট্রীটে; আর আমি যাই প্রিয়াদিল্নি লেনে। মনে রেখ, গুলিয়ে ফেল না। তাহলে পুলিশে টানাটানি করবে।

“আমি দাদামশায়ের কাছে গিয়ে বললাম, ‘তুমি গিয়ে ইনস্পেক্টারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল; আর, আমি ছেলেদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকি গে। তাদের সঙ্গে দেখা হলেই বলবো, আমাদের কি বিপদ।”

“দাদামশায় কাঁপতে কাঁপতে পোশাক পরতে লাগলেন আর বল্‌তে লাগলেন, ‘কি যে হবে আমি জানতাম! এইটেই আশা করছিলাম।’

“সব মিছে কথা। তিনি সে-সবের কিছুই জানতেন না। তা, মুখে হাত চাপা দিয়ে ছেলেদের সঙ্গে দেখা করলাম। মিশ্‌কা ভয়ে তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হল; আর জাস্‌কা, বাছা আমার, কথাটা ফাঁস

করে দিলে ; বললে, 'ব্যাপারটার কথা আমি কিছুই জানি না। এ-সব মাইকেলের কাজ।'

"যাহোক, ইনস্পেকটারের সঙ্গে ব্যাপারটা ঠিক করে ফেললাম। তিনি ছিলেন খাসা ভদ্রলোক ; বললেন, 'কিন্তু সাবধান হওয়া ভাল। তোমাদের বাড়িতে খারাপ যদি কিছু ঘটে তাহলে দোষ যে কার সে আমি জানতে পারবোই।' এই বলে তিনি চলে গেলেন।



"আর দাদামশায় ম্যাকসিমের কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমায় ধন্যবাদ ! তোমার জায়গায় আর কেউ হলে তুমি যে-ভাবে কাজ করেছো, সে-ভাবে কাজ করতো না—সে আমি জানি ! আর পরিবারের মধ্যে এমন একটি ভাল লোককে আনবার জন্যে তোমায়ও ধন্যবাদ ভারভারা।' ইচ্ছে করলে, দাদামশায় খুব চমৎকার কথা বল্‌তে পারতেন। এই ঘটনার পরই তিনি নির্ব্বোধ হতে আরম্ভ করলেন।"

"তখন কেবল আমরা তিনজনে রইলাম। ম্যাকসিম সাবাতিয়েভিচ্ কাঁদতে আরম্ভ করলে ; এবং প্রায় প্রলাপ বক্‌তে লাগলো। 'ওরা আমাকে এ রকম করলে কেন ? আমি ওদের কি ক্ষতি করেছি ? মা···ওরা কেন এ রকম করলে ?' সে কখনও বলতো না 'মামাশা' ছোট ছেলের মতো বলতো 'মা'। আর বাস্তবিক তার স্বভাবও ছিল শিশুর মতো।

"আমি কাঁদতে লাগলাম। কাঁদা ছাড়া আমার আর কিই বা করবার ছিল ? আমার ছেলে-মেয়েদের জন্যে এমন দুঃখ ! তোমার মা বডিসের সমস্ত বোতাম ছিঁড়ে ফেলে আলুথালু বেশে বসে রইলো, যেন সে মারামারি করছিল। আর বল্‌তে লাগলো, 'চল, এখান থেকে আমরা যাই, ম্যাকসিম। আমার ভাইয়েরা হচ্ছে আমার শত্রু। আমি ওদের ভয় করি। চল, এখান থেকে চলে যাই।'"

"তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। বললাম, 'আগুনে আর জঞ্জাল দিও না। ওটা ছাড়াই বাড়িটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে।'

"আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কি ঐ দাদামশায়টা সেই দুজনকে ক্ষমা চাইতে পাঠালো। ভারভারা এক লাফে উঠে মিশকার গালে মারলে চড়; সেই সঙ্গে বললে, 'এই তোমাদের ক্ষমা!' আর তোমার বাবা বলে উঠলো, 'তোমরা এ রকম কাজ কি করে পারলে, ভাই? তোমরা আমাকে ঠুঁটো করে ফেলতে পারতে। হাত না থাকলে আমি কাজ করবো কি করে?'

"যাহোক, তাদের মধ্যে মিটমাট হয়ে গেল। তোমার বাবা কিছু দিন ভুগলো। সাত সপ্তাহ সে বিছানায় পড়ে ছটফট করেছিল। তখন কেবলই বলতো, 'মা, চল অন্য শহরে যাই। জায়গাটা একঘেয়ে হয়ে গেছে।'

"তারপর তার আস্ত্রাখানে যাবার সুযোগ ঘটলো। ওদের ছাড়তে আমার বড় কষ্ট হতে লাগলো. তোমার বাবারও কষ্ট হয়েছিল। সে বার বার বলছিল, তাদের সঙ্গে আমারও আস্ত্রাখানে যাওয়া উচিত। কিন্তু ভারভারা খুশি হয়েছিল; মনের আনন্দ চেপে রাখবারও চেষ্টা করে নি—শয়তানী! এম্নি করে তারা চলে গিয়েছিল—এই।"

তিনি এক ঢোক ভদ্‌কা খেলেন, এক টিপ নস্য নিলেন এবং জান্‌লা দিয়ে গাঢ় নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'হাঁ, তোমার বাবা আর আমি—আমাদের শরীরে একই রক্ত বইতো না—কিন্তু অন্তরে আমরা ছিলাম একই গোষ্ঠীর।"

তিনি আমাকে এইসব কথা যখন বল্‌তেন তার মাঝখানে দাদামশায় কখন কখন এসে পড়তেন। তিনি মুখ তুলে বাতাসের গন্ধ

শুঁকে, দিদিমার দিকে সন্দেহের সঙ্গে তাকিয়ে তাঁর কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে শুনতে বলতেন, 'ও কথা সত্যি নয়! 'ও কথা সত্যি নয়!'



তারপর কোন ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করতেন, 'লেক্‌সি, ও এখানে ব্র্যাণ্ডি খাচ্ছিল?" •

—"না।"

—"মিছে কথা। আমি স্বচক্ষে ওকে মদ খেতে দেখেছি।" বলে সংশয়াকুল মনে তিনি বেরিয়ে যেতেন।

দিদিমা চোখের ইসারা করতেন।···

একদিন দাদামশায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে বললেন, "মা?"

—"অ্যাঁ?"

—"দেখছো কি ব্যাপার চলছে?"

—হাঁ, দেখছি!"

—"এতে কি মনে হয় তোমার?"

—"বিয়ে হবে। মনে পড়ে তুমি একটি বড়লোকের কথা কি রকম করে বলতে?"

—"হাঁ।"

—"সে এসেছে!"

—"ওর কিছুই নেই।"

—"সে আমাদের দেখবার দরকার নেই। ও বুঝুক।"

দাদামশায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা কোন্ বিষয়ের আলোচনা করছিলে?"

দিদিমা আমার পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ক্ষুণ্ণভাবে বললেন,

"তুমি সব কিছু জানতে চাও। অল্প বয়সেই সব-কিছু যদি জেনে ফেল, যখন বুড়ো হবে তখন আর কিছু জানবার থাকবে না যে!"

কথা কয়টি বলেই তিনি হেসে উঠে মাথা নাড়লেন।

* * * * *

"ওগো দাদামশায়! দাদামশায় গো! ভগবানের চোখে একটি ধুলোকণা ছাড়া তুমি আর কিছু নও। লেনকা—এ কথা কাউকে বলো না, দাদামশায়ের একেবারে সর্ব্বনাশ হয়েছে! উনি একটি ভদ্রলোককে অনেক টাকা ধার দিয়েছিলেন, ভদ্রলোকটি দেউলে হয়ে গেছেন।" বলে দিদিমা সহাস্থে, নীরবে বহুক্ষণ চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলেন। তাঁর মুখখানি হয়ে উঠ্‌লো বিষণ্ণ।

মা কদাচিৎ চিলে-কোঠায় আমাকে দেখতে আসতেন এবং বেশিক্ষণ থাকতেন না। এমনভাবে কথা বলতেন যেন তাঁর খুব তাড়া। তিনি আরও সুন্দরী হয়ে উঠেছিলেন ; এবং দিন দিনই ভাল পোশাক পরছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে যেমন দিদিমার মধ্যে যে একটা পরিবর্ত্তন আসছিল এ বিষয়ে আমি সচেতন হয়ে উঠেছিলাম। বুঝছিলাম, একটা কিছু চল্‌ছে যেটা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে।

দিদিমার গল্পগুলো শুনতে আর আমার ভাল লাগছিল না ; এমন কি আমার বাবার যে-সব গল্প তিনি বল্‌তেন সে-সবও লাগছিল বিস্বাদ।

দিদিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আমার বাবার আত্মা শান্তি পাচ্ছে না কেন?"

চোখ দুটি ঢেকে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি কি করে বলবো? ও হল ভগবানের ব্যাপার…অলৌকিক…আমাদের দৃষ্টির বাইরের।"

রাতে বিনিদ্র চোখে আমি জানলার মাঝ দিয়ে গাঢ় নীল

আকাশের গায়ে অতি ধীরে ভাসমান নক্ষত্রগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতাম—মনে মনে করুণ গল্প রচনা করতাম। তার প্রধান অংশ গ্রহণ করতেন আমার বাবা। তিনি একখানি ছড়ি হাতে চারধারে অবিরাম একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর তাঁর পিছন পিছন চলেছে একটি লোমশ কুকুর।



## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

একদিন সন্ধ্যার আগেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলে মনে হতে লাগলো, আমার পা দু'খানায় সাড় এসেছে। পা দুখানা বিছানার বাইরে রাখলাম, কিন্তু আবার অসাড় হয়ে গেল। তবে বোঝা গেল আমার পা দুখানা সেরে গেছে, আমি আবার হাঁটতে পারবো। খবরটা এমন চমৎকার যে, আনন্দে চীৎকার করে উঠ্‌লাম।

মনে পড়ে না কি করে হামাগুড়ি দিয়ে মায়ের ঘরে গিয়েছিলাম; কিন্তু মনে পড়ে তখন তাঁর সঙ্গে সেখানে ছিলেন জন কতক অপরিচিত ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে সবুজ পোশাক পরে এক শুষ্ক বৃদ্ধা ছিলেন। তিনি কঠোর কণ্ঠে সকলের কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "ওকে একটু রাসপে্‌বেরি সিরাপ খেতে দাও; আর ওর মাথাটা ঢেকে রাখো।"

তিনি ছিলেন আগাগোড়া সবুজ; তাঁর পোশাক, তাঁর টুপি এবং তাঁর মুখও। চোখের নিচে ছিল কতকগুলো আঁচিল। এমন কি সেই আঁচিলগুলোর ওপর যে লোমগুলো ছিল সে গুলোকেও দেখাচ্ছিল ঘাসের মতো। নিচের ঠোঁটটা নামিয়ে ওপরের ঠোঁটটা

তুলে কালো দস্তানাপরা হাতে চোখ দুটো ঢেকে যেন সবুজ দাঁতগুলো দিয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

হঠাৎ নরম হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ও কে?"



দিদিমা অপ্রীতিকর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "তোমার আর একটি দিদিমা।"



মা হাসতে হাসতে ইউজেন ম্যাকসিমফকে আমার কাছে নিয়ে এলেন।

তিনি তাড়াতাড়ি তাকে কি বললেন আমি বুঝ্‌তে পারলাম না; ম্যাকসিমফ চোখ মিট্‌ মিট্‌ করতে করতে আমার দিকে নিচু হয়ে বললেন, "আমি তোমাকে একটা পেন্টিং বাক্স উপহার দেব।"

সেই সবুজ বৃদ্ধাটি ঠাণ্ডা আঙুল কয়টি দিয়ে আমার কান দুটো নাড়তে নাড়তে বললেন, "নিশ্চয়ই!"

দিদিমা আমাকে প্রায় কোলে করে দরজার কাছে নিয়ে যেতে যেতে বলে উঠলেন, "মূর্চ্ছা যাচ্ছে!"

কিন্তু আমি মূর্চ্ছা যাচ্ছিলাম না। কেবল চোখ দুটি বন্ধ করে ছিলাম; তিনি আমাকে কতকটা কোলে কোরে, কতকটা টানতে টানতে ওপরে নিয়ে যেতেই জিজ্ঞেস করলাম, "আমাকে এ সম্বন্ধে বলা হয় নি কেন?"

—"হয়েছে···থামো!"

—"তোমরা প্রতারক···সকলেই!"

আমাকে বিছানায় শুইয়ে তিনি নিজে বালিশে উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে ফেললেন। তাঁর মাথা থেকে পা অবধি কাঁপতে লাগলো। দুটি কাঁধ ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগলো; অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "তুমি কাঁদছো না কেন?"

আমার কাঁদবার একটুও ইচ্ছা ছিল না। চিলে-কোঠায় তখন গোধূলি আলোক নেমেছে ; ঠাণ্ডা লাগছিল। আমি শিউরে উঠলাম। ঘুমের ভান করে রইলাম, দিদিমা চলে গেলেন।



তারপর কতকগুলি বৈচিত্র্যহীন দিন শীর্ণা স্রোতস্বতীর মতো বয়ে গেল। দিনগুলি সবই লাগলো এক রকমের। বাগদানের পর মা কোথায় চলে গিয়েছিলেন ; বাড়িখানা এমন নীরব হয়ে গিয়েছিল যেন তা বুকের ওপর চেপে বসছিল।

একদিন সকালে দাদামশায় একটি ছেনি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং চিলে-কোঠার জানলার ফ্রেমের চারধারের সিমেণ্ট ভাঙতে আরম্ভ করলেন। শীতের জন্য জানলার চারধারে সিমেণ্ট লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর দিদিমা এলেন একপাত্র জল ও একখানি কাপড় নিয়ে। দাদামশায় কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপারটা সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর গো ?"

—"তার মানে ?"

—"খুশি হয়েছ কি না ?"

আমাকে সিঁড়ির ওপর যে-রকম করে উত্তর দিয়েছিলেন সেই রকম করে উত্তর দিলেন, "হয়েছে···থামো !"

এই অতি সরল কথা কয়টি এখন আমার কাছে হয়ে উঠলো বিচিত্র অর্থভরা। আমি অনুমান করলাম, সেগুলির অন্তরালে এমন কিছু লুকানো আছে যা অতি তাৎপর্য্যপূর্ণ ও দুঃখময়।

জানলার ফ্রেমটি সাবধানে খুলে দাদামশায় সেটি নিয়ে গেলেন ; দিদিমা জানলাটির কাছে গিয়ে বাইরের নির্ম্মল বাতাস বুক ভরে টেনে নিতে লাগলেন। বাগানে ষ্টারলিং পাখি ডাকছিল ; চড়ুইয়ের ঝাঁক কিচির মিচির করছিল ; ঘরে বরফ-গলা ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ

ভেসে আসছিল। ষ্টোভের গাঢ় নীল টালিগুলি যেন ম্লান হয়ে উঠ্‌ছিল। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা হয়ে যাচ্ছিল হিম। আমি বিছানা থেকে মেঝেয় নেমে পড়লাম।

দিদিমা বললেন, "খালি পায়ে ছুটোছুটি করো না।"

—"আমি বাগানে যাচ্ছি।"

—"বাগানটা এখনও তেমন শুকোই নি। একটু থামো।"

কিন্তু তাঁর কথা শুনতে আমার মন চাইলো না। প্রকৃতপক্ষে বয়স্কদের দেখলেই আমার মনে অসন্তোষ দেখা দিতে লাগলো। বাগানে কচি ঘাসের সবুজ শিষগুলি মাটি ভেদ করে উঠছিল; আপেল ফুলের কুঁড়িগুলো ফোটবার জন্য ফুলে, উন্মুখ হয়ে ছিল; পেৎ-রোভনার ঘরের চালের ওপর শেওলাগুলো নতুন করে সবুজ রঙে রঙিয়ে উঠে চোখে লাগছিল বেশ। চারধারে পাখী ও আনন্দের ধ্বনি। নির্মল, সুরভিত বাতাস কেমন একটা আবেশের সৃষ্টি করছিল। খাদের ধারের, যেখানে পিটার খুড়ো গলা কেটে ছিলেন, ঘাসগুলো ছিল লম্বা, লাল—তুষার-চূর্ণের সঙ্গে গিয়েছিল মিশে। সেগুলো দেখতে ভাল লাগছিল না—তার মধ্যে বসন্তের ভাব ছিল না কিছুই। কালো চিমনিটা কেমন অবসন্নভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল—সমস্ত খাদটাকেই লাগছিল বিশ্রী। সেই লম্বা ঘাসগুলোকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে, চিমনিটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে অনাবশ্যক আবর্জনাটাকে দূর করে দিয়ে খাদের মধ্যে আমার নিজের জন্য একটি বাসা তৈরি করবার ক্রুদ্ধ বাসনা আমাকে পেয়ে বসলো। সেখানে আমি সারা গ্রীষ্মকাল বয়স্কদের কাছ থেকে দূরে একা বাস করবো।

কথাটা মনে হতেই কাজ আরম্ভ করে দিলাম। বাড়িতে যা হচ্ছিল, তা থেকে তৎক্ষণাৎ আমার মন অন্য দিকে গেল এবং বহুকাল

আমার সারা মনকে অধিকার করে রইলো। সে-সময়ে বাড়িতে অনেক-কিছু ঘটছিল,কিন্তু সেগুলি আমার কাছে প্রত্যহ হয়ে উঠ্‌ছিল, কম গুরুত্বপূর্ণ।



মা ও দিদিমা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, “তুমি ও রকম মুখ ভার করে বেড়াচ্ছো কেন?” বাড়ির প্রত্যেকেই আমার কাছে হয়ে উঠেছিলেন অপরিচিত। সকালে খাবার সময়, সন্ধ্যায় চায়ের সময়, রাতে খবার সময়ও সেই সবুজ বৃদ্ধাটি প্রায়ই আসতো—তাকে দেখাতো বেড়ার গায়ে একটা পচা খুঁটির মতো।···

তার ছেলের মতোই সেও ছিল বড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তার কাছে যেতে ভাল লাগতো না। তার ছেলেকে সে প্রায়ই বলতো, “এ ছেলেটার শাসনের খুব দরকার; বুঝলে, জেনিয়া?”

বাধ্য ছেলেটির মতো মাথা হেলিয়ে ভ্রূকুটি করে সে চুপ্‌ করে থাক্‌তো। সবুজ স্ত্রীলোকটি সমানে ভ্রূকুটি করতো।

আমি সেই বৃদ্ধা ও তার ছেলেটিকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতাম। তার জন্য অনেক শাস্তিও ভোগ করে ছিলাম। একদিন দুপুরে খেতে বসে চোখ দুটো ভয়ঙ্কর ঘোরাতে ঘেরোতে সে বললে, “ও আলেশেনকা, এত তাড়াতাড়ি আর অমন বড় গ্রাস তুলে খাচ্ছ কেন? ওটা বার করে ফেল বাবা!”

আমি গ্রাসটা মুখ থেকে বার করে কাঁটাতে আবার গেঁথে সেটা বৃদ্ধার হাতে দিয়ে বললাম, “নিন গরম আছে।”

মা আমাকে টেবিল থেকে তুলে দিয়ে চিলে-কোঠায় নির্ব্বাসন দিলেন। সেখানে দিদিমা এসে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁর হাসি যাতে শোনা না যায়, সে জন্য মুখে হাত চাপা দিয়ে রইলেন। বললেন, “ওরে শয়তান, বাঁদর।”

তাঁকে মুখে হাত চাপা দিয়ে থাকতে দেখে, আমার মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠলো ; আমি সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে চিমনির পাশে বহুক্ষণ বসে রইলাম।

একদিন আমার ভাবী বি-পিতার চেয়ারে মাখিয়ে রেখে দিলাম চর্বি, আমার নতুন দিদিমার চেয়ারে চেরীর আঠা। এবং দুজনেই তাঁদের আসনে আটকে গেলেন। বড় মজা লাগলো, কিন্তু দাদামশায় যখন আমাকে মারলেন আর মা চিলে-কোঠায় এসে আমাকে টেনে নিয়ে তাঁর হাঁটুতে চেপে ধরে বললেন, "শোন! তুমি এ রকম দুষ্টু কেন? যদি জানতে এতে আমার মনে কত কষ্ট হয়!" তাঁর চোখ দুটি ছাপিয়ে স্বচ্ছ অশ্রুধারা ঝরতে লাগলো, তখন আমার পক্ষে হল বড় বেদনাদায়ক। মনে হতে লাগলো, এর চেয়ে যদি তিনি আমাকে মারতেন তাহলে ভাল হত। বললাম, ম্যাকসিমোফদের প্রতি আর কখন রূঢ় ব্যবহার করবো না—কখন না, তিনি যেন না কাঁদেন।

তিনি কোমল কণ্ঠে বললেন, "হয়েছে, হয়েছে! তুমি কেবল উদ্ধত হয়ো না। শিগগিরিই আমাদের বিয়ে হবে ; আমরা মস্কো চলে যাবো। তারপর ফিরে এলে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে। ইউজেন বাসিলিচের মন বড় কোমল আর ও বুদ্ধিমান। তার সঙ্গে তোমার বেশ বনবে। তুমি গ্রামার স্কুলে পড়তে যাবে ; পরে ওর মতো ছাত্র হয়ে উঠবে। তারপর হবে ডাক্তার—যা তোমার ইচ্ছে। এখন গিয়ে খেলা কর।"

এই 'পরে' ও 'তারপর'গুলো আমার কাছে সিঁড়ির মতো বোধ হতে লাগলো, যেন সেগুলো তাঁর কাছ থেকে অনেক নিচে, দূরে অন্ধকার ও শুষ্কতার দিকে চলে গেছে। এই সিঁড়িগুলো যে দিকে গেছে সেদিকে আমার জন্য সুখ ও আনন্দ নেই। বলবার বড় ইচ্ছা

হচ্ছিল, "মা বিয়ে করো না। তোমার খাওয়া-পরার জন্যে আমি রোজগার করবো।"



আমার বাগানের কাজটা এগিয়ে যাচ্ছিল। একদিন দাদামশায় আমার কাজটি দেখে বললেন, "বেশ চমৎকার করেছো! কিন্তু ঘাসগুলো তুমি কেবল ছিঁড়েছো, শিকড়গুলো এখনও আছে। তোমার কোদালখানা আমাকে দাও, আমি ওগুলো তুলে দিচ্ছি।



শেষে কোদালখানা ফেলে দিয়ে তিনি ধোবিখানাটার পিছনে গেলেন। আমি খুঁড়তে লাগলাম। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের আঙুলগুলো কোদাল দিয়ে ফেললাম প্রায় থেঁৎলে।

তাতে মায়ের বিয়েতে তাঁর সঙ্গে গির্জ্জায় যেতে পারলাম না। সেখান থেকে দেখলাম তিনি ম্যাকসিমফের হাতে ভর দিয়ে মাথা নিচু করে, পেভমেনট ও সবুজ ঘাসের ওপর সাবধানে পা ফেলছেন, ফাটলগুলো পার হয়ে যাচ্ছেন যেন সূচালো পেরেকের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন।

শান্তভাবে বিয়ে হয়ে গেল। গির্জ্জা থেকে ফিরে এসে তাঁরা চা খেলেন। তাঁদের স্ফূর্ত্তি দেখা গেল না। মা তখনই পোশাক ছেড়ে তাঁর ঘরে গেলেন জিনিষ-পত্র বাঁধা-ছাঁদা করতে। আমার বি-পিতা এসে আমার পাশে বসে বললেন, "আমি তোমাকে কিছু রঙ দেব বলেছিলাম; কিন্তু এই শহরে ভাল রঙ পাওয়া যায় না। আর আমার নিজের যা আছে তাও তোমাকে দিতে পারি না। কিন্তু তোমাকে মস্কো থেকে কিছু এনে দেব।"

—"সেগুলো দিয়ে করবো কি?"

—"তুমি আঁকতে ভালোবাস না?"

—"কেমন করে আঁকতে হয় জানি না।"

—"তাহলে অন্য কিছু এনে দেব।"

তখন মা সেখানে এলেন। "বললেন, আমরা শিগগিরই ফিরে আসবো, বর্মাতে। সেখানে তোমার বাবাকে পরীক্ষা দিতে হবে। ওঁর পড়াশুনা শেষ হয়ে গেলে আমরা ফিরে আস্‌বো।"





আমি যেমন বয়স্ক ব্যক্তি তাঁরা এমনিভাবে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলায় খুশি হলাম। কিন্তু একটা দাড়িওয়ালা লোকও যে তখনও লেখাপড়া করছিল, এ কথা শুনতে বড় অদ্ভুত লাগলো।



—"আপনি কি পড়ছেন?"

—"জরিপ।"

জরিপ জিনিষটা কি সে কথা জিজ্ঞেস করবার কষ্টটুকু আর স্বীকার করলাম না।

পরদিন খুব সকালে মা চলে গেলেন। আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। এবং মাটি থেকে শূন্যে তুলে তিনি এমন ভাবে আমার চোখের দিকে তাকালেন যে, সে দৃষ্টি আমার অপরিচিত। তিনি আমাকে চুম্বন করতে করতে বললেন, "বিদায়।"

আকাশখানি তখনও ছিল রক্তিম। দাদামশায় সেদিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "ওকে আমার বাধ্য হয়ে থাকতে বলো।"

মা আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন, "তোমার দাদামশায়ের কথা শুনে চলো।"

আমি প্রত্যাশা করছিলাম, তিনি আমাকে অন্য কিছু বলবেন। কিন্তু দাদামশায় তাকে বলতে না দেওয়ায় আমি তাঁর ওপর ভয়ঙ্কর রেগে উঠলাম।

তাঁরা দ্রোজকিতে উঠে বসলেন। কিসে যেন মায়ের স্কারট

আটকে গেল। মা সেটা খুলবার জন্য অনেকক্ষণ রাগের সঙ্গে চেষ্টা করলেন।

দাদামশায় আমাকে বললেন, "ওকে সাহায্য কর, পার না? তুমি কি কাণা?"



কিন্তু আমি সাহায্য করতে পারলাম না—দুঃখে আমি একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম।

ম্যাকফিয়ের্স তার গাঢ় নীল ট্রাউজারে ঘেরা পা দুখানা আস্তে আস্তে দ্রোজ্‌কিতে ঢুকিয়ে দিলেন আর দিদিমা তাঁর হাতে দিলেন কতকগুলি পোঁটলা। তিনি সেগুলি তাঁর হাঁটুর ওপর পর পর সাজিয়ে সকলের ওপরেরটা থুৎনি দিয়ে চেপে ধরলেন।

আর একখানি দ্রোজ্‌কিতে বসেছিল সে সবুজ বুদ্ধাটি তার বড় ছেলেটিকে নিয়ে।

তাঁরা চলে গেলেন। মা কয়েকবার ফিরে রুমাল নাড়লেন। দিদিমাও কান্নায় গলে গিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে হাত নাড়লেন। দাদামশায় চোখ দুটো মুছে ভাঙা ভাঙা ভাবে বললেন, "এর ফল—ভাল—কিছুই হবে না।"

আমি ফটকের খুঁটির ওপর বসে দেখতে লাগলাম, দ্রোজকি দুখানা উঠে নেমে চলেছে; তারপর মোড় ঘুরলো। তখন আমার বোধ হল, আমার হৃদয় যেন সহসা রুদ্ধ ও অর্গলবদ্ধ হয়ে গেল। তখনও খুব সকাল। বাড়িগুলির জানলার খড়খড়ি খোলেনি, রাস্তা জনশূন্য। এমন প্রাণশূন্যতা আমি কখনও দেখি নি। দূরে রাখালের বাঁশী শোনা যাচ্ছিল; মনে কেমন একটা অস্বস্তি এনে দিচ্ছিল।

আমার কাঁধ ধরে দাদামশায় বললেন, "খেতে চল। এটা পরিষ্কার যে, তোমার ভাগ্য আমার সঙ্গেই থাকা।"

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি আমরা বাগানে ব্যস্ত থাকতাম। দাদামশায় মাটি কুপিয়ে জমি পাট করতেন, রাসপবেরির ঝোপগুলো বেঁধে দিতেন, আপেল গাছগুলোর গা থেকে শেওলা তুলে ফেলতেন, শুঁয়ো পোকা মারতেন আর আমি আমার সেই বাড়িটা তৈরি করতাম, সাজাতাম। তিনি পোড়া কড়িগুলোর শেষ দিক কেটে ছড়ি তৈরি করে মাটিতে পুঁতে রাখতেন; আর আমি তার মাথায় আমার পাখীর খাঁচাগুলি টাঙিয়ে রাখতাম। তারপর শুকনো ঘাস দিয়ে আমি একখানি জাল বুনে আসনটার ওপর চাঁদোয়ার মতো করে টাঙিয়ে দিলাম, যাতে রোদ ও শিশির আটকায়।



দাদামশায় বললেন, "তোমার মায়ের কাছ থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছো। তাঁর অন্য সন্তান হবে। তোমার চেয়ে তাঁর কাছে সে হবে বেশি। আর ঐ দিদিমাটি—উনি মদ খেতে শুরু করেছেন।"

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন যেন কিছু শুনছেন। তারপর অনিচ্ছার সঙ্গে দুঃখে ভরা কথাগুলি বললেন, "এই দ্বিতীয়বার উনি মদ ধরলেন। মাইকেল যখন সৈনিক হয়ে যায় উনি তখনও মদ ধরেছিলেন।...উঃ!...আমি শিগগিরই মরে যাবো—তার মানে, তোমার আর কেউ থাকবে না...তুমি থাকবে একা...তোমার খাওয়া-পরার সংস্থান নিজেকেই করতে হবে। বুঝলে?...ভাল!...নিজের জীবিকার জন্যে নিজেই কাজ করতে শিখবে...কারো কাছে মাথা নুইয়ো না! শান্তভাবে, শান্তিতে, সৎপথে জীবন যাপন করবে। লোকে যা বলে শুনবে, কিন্তু তোমার নিজের পক্ষে যা সব চেয়ে ভাল তাই করবে।"

সারা গ্রীষ্মকালটি, অবশ্য আবহাওয়া যখন খারাপ হত সেই সময়টি ছাড়া আমি কাটালাম বাগানে। দিদিমা মাঝে মাঝে বাগানে শুতেন। তিনি সঙ্গে আনতেন এক পাঁজা বিচালি। সেগুলো আমার

কৌচের কাছে বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে আমাকে অনেকক্ষণ গল্প বল্‌তেন। আমি মাঝে মাঝে অবান্তর মন্তব্যে তাঁর কথায় বাধা দিতাম, "দেখ !···একটা তারা খসে পড়লো ! ওটা হচ্ছে কোন নির্ম্মল আত্মা, কষ্ট পাচ্ছে···কোন মা পৃথিবীর কথা ভাবছে ! ওর মানে কোন সৎ পুরুষ বা নারী এই মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করলো !"

অথবা তিনি আমাকে দেখাতেন, "একটা নতুন তারা উঠেছে; দেখ ! ওটাকে দেখাচ্ছে একটা বড় চোখের মতো···ওগো আকাশের উজ্জ্বল জীব···ভগবানের পবিত্র অলঙ্কার !···"

দাদামশায় তাঁকে ধমকাতেন। "তোমার ঠাণ্ডা লাগবে, সর্দ্দি হবে। সন্ন্যাস রোগ ধরবে। চোর এসে তোমাকে খুন করবে।"

কখন কখন সূর্য্য যখন অস্ত যেত, আকাশে বয়ে যেত আলোর নদী। মনে হত যেন সবুজ মখমলের মতো বাগানের ওপর ঝরে পড়ছে লাল-সোনালি রাশি রাশি ভস্ম। তখন সব কিছু হয়ে উঠতো আর একটু কালো ও বড় এবং গোধূলি আলোক-বেষ্টনির সঙ্গে সঙ্গে যেন উঠতো ফুলে। রৌদ্রে অবসন্ন হয়ে গাছের পাতাগুলো পড়তো এলিয়ে, ঘাসের আগাগুলি পড়তো নুয়ে। সব কিছুকে মনে হত আরও ঐশ্বর্য্যময়। এবং সঙ্গীতের মতো স্নিগ্ধকর নানা রকমের সুরভী বিতরণ করতো। সেখানে সঙ্গীতও ছিল, সৈন্যদের তাঁবু থেকে গমকে গমকে তা ভেসে আসতো।

রাত্রি আস্‌তো। তার সঙ্গে অন্তরে আসতো মায়ের সোহাগের মতো সতেজ নির্ম্মল এক ভাব। স্তব্ধতা তার তপ্ত অমসৃণ হাতখানি দিত অন্তরে বুলিয়ে এবং যা ভোলবার—দিবসের সূক্ষ্ম ধূলিকণা, তিক্ততা —তা যেত ধুয়ে মুছে। চিৎ হয়ে শুয়ে অতল গভীর আকাশে উজ্জ্বল তারাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে লাগতো চমৎকার।···অন্ধকার হয়ে

আসতো আরও গাঢ়, স্তব্ধতা হতো আরও গভীর, কিন্তু শব্দের পর উঠ্‌তো সূক্ষ্ম, অনুভব করা যায় কি না যায় এম্নি দীর্ঘ শব্দতরঙ্গ। এবং প্রত্যেকটি শব্দ—তা সে ঘুমের ঘোরে পাখীর গানই হোক বা সজারুর ছোটার শব্দই হোক অথবা কোন মৃদু মনুষ্য কণ্ঠস্বরই হোক—দিনের শব্দগুলি থেকে ছিল পৃথক। তার মধ্যে থাকতো তার বিচিত্র নিজস্ব কিছু।...



দিদিমা সেক্ষণ ঘুমোতেন না ; যুক্ত হাত দুখানির ওপর মাথা রেখে তিনি শুয়ে থাকতেন এবং আমার কাছ থেকে সামান্য ইঙ্গিত পেলেই গল্প বলতেন আমি শুনছি কিনা সেদিকে একটুও খেয়াল করতেন না।

তাঁর শব্দ-স্রোতের প্রভাবে আমি অজ্ঞানিতে তন্দ্রা ঘোরে ডুবে যেতাম এবং পাখির ডাকের সঙ্গে উঠতাম জেগে। আমার চোখে সোজা এসে লাগতো অরুণ কিরণ ; এবং রৌদ্রে তপ্ত প্রভাত-বাতাস আমাদের চারধারে মৃদু ভাবে বয়ে যেত। আপেল গাছের পাতাগুলো দুলে দুলে শিশির ঝরাতো, সদ্যোলব্ধ স্ফটিক-স্বচ্ছতায় ঘাসগুলোকে দেখাতো আরও উজ্জ্বল ও সতেজ ; তার ওপর ভাসতো কুয়াশার আমেজ। ঊর্দ্ধগগনে, এত ঊর্দ্ধে যে চোখেই পড়তো না, লারক্‌ গান গাইতো ; এবং শিশিরে যে-সব রঙ ও শব্দ ফুটে উঠতো সেগুলো জাগিয়ে তুলতো শান্তিময় আনন্দ, জাগিয়ে তুল্‌তো অবিলম্বে কিছু কাজ করার এবং সমস্ত জীব-জগতের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে দিন যাপনের বাসনা।

এই সময়টি ছিল আমার সারা জীবনের সব চেয়ে শান্ত চিন্তা-শীলতার মুহূর্ত। আর গ্রীষ্মকালেই আমার আত্ম-শক্তির চেতনা জেগে উঠে অন্তরে বদ্ধমূল ও স্পষ্ট হয়। আমি হয়ে পড়তাম লাজুক ও অসামাজিক।

দাদামশায়ের কথাবার্ত্তা প্রত্যহ হয়ে উঠছিল আরও নীরস বিষণ্ণ ও অসন্তোষে ভরা। আমার আর ভাল লাগতো না। তিনি প্রায়ই দিদিমার সঙ্গে ঝগড়া করতেন এবং তিনি যখনই জাকফ-মামা বা মাইকেল-মামার বাড়ি যেতেন তখন তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতেন। একবার দিদিমা দিন কতক বাইরেই রয়ে গেলেন; দাদামশয় সে সময় নিজেই রান্না-বান্না করতেন, হাত পুড়িয়ে ফেলতেন, যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠতেন, গালাগাল দিতেন, কাঁচের বাসন-পত্র ভেঙে ফেলতেন। তখন তিনি হয়ে উঠেছিলেন লোভী। কখন কখন তিনি আমার কুঁড়েতে এসে, ঘাসে-ঢাকা আসনে আরাম করে বসতেন এবং আমাকে কিছুক্ষণ নীরবে লক্ষ্য করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করতেন. "তুমি এমন চুপচাপ কেন?"

—"চুপ-চাপ থাকতে ভাল লাগছে। কেন?"

তারপর তিনি উপদেশ আরম্ভ করতেন, "দেখ, আমরা ভদ্রলোক নয়। আমাদের শিক্ষা দেবার মাথাব্যথা কারো নেই। আমাদের যা-কিছু নিজেদেরই করে নিতে হবে। আর সব লোকের জন্যে বই লেখা হয়, স্কুল গড়ে তোলা হয়। কিন্তু আমাদের জন্যে কেউ সময় নষ্ট করে না। আমাদের পথ নিজেদেরই করে নিতে হবে।" বল্‌তে বল্‌তে চুপ করতেন। আত্মভোলা, ও স্থির হয়ে বসে থাকতেন। পরিশেষে তাঁর উপস্থিতি আমার কাছে হয়ে উঠ্‌তো পীড়াদায়ক।

শরৎকালে তিনি বাড়িখানি বিক্রয় করে ফেললেন। বিক্রয়ের অল্পকাল আগে চা খেতে খেতে হঠাৎ বলে উঠেছিলেন, "দেখ, মা, আমি তোমাকে খাইয়েছি-পরিয়েছি—কিন্তু তোমার এবার নিজের অন্নের সংস্থান নিজেই করে নেবার সময় এসেছে।"

দিদিমা খবরটি শান্তভাবে নিয়ে ছিলেন, যেন তিনি অনেক দিন

থেকে এটি আশা করছিলেন। তিনি ধীরে সুস্থে নস্যের কৌটাটি নিয়ে খানিকটা নস্য নাকে পূরে বলেছিলেন, "ঠিক আছে। যদি এই রকমই হয়, তাহলে তাই-ই হোক্!"



দাদামশায় একটি ছোট পাহাড়ের তলায় একখানি পুরোনো বাড়ির দুখানি অন্ধকার ভিত-ঘর ভাড়া করলেন।

আমরা এই বাসাটিতে উঠে গেলে দিদিমা একপাটি পুরোনো গাছের ছালের জুতো নিয়ে ষ্টোভের আগুনে দিয়ে উবু হয়ে বসে, গৃহ-উপদেবতাকে জাগিয়ে বললেন, "ঘরের দানো, বংশের দানো, এই যে তোমার শ্লেজ-গাড়ি ; আমাদের নতুন বাড়িতে এসো আমাদের কাছে, আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন করে তোলো।"

দাদামশায় উঠোন থেকে জানালা দিয়ে এই ব্যাপার দেখে বলে উঠলেন, "এই বিধর্মী। দাড়া তোকে দেখাচ্ছি। তুই আমার মুখে কালি দেবার চেষ্টা করছিস।"

তিন দিন দর কষাকষি ও পরস্পরকে গালাগাল দেবার পর দাদামশায় ঘরের আসবাব-পত্র সব বিক্রয় করলেন এক পুরোনো মাল-পত্র ব্যবসায়ীর কাছে। সে লোকটি ছিল তাতার। দিদিমা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কখন কাঁদলেন, কখন হাসলেন, আর বলতে লাগলেন, "ঠিক হয়েছে! ওগুলো টেনে বার কর। ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেল।"

আমার নিজেরও কান্না পাচ্ছিল। আমার বাগান ও ছোট ঘরখানির জন্যে দুঃখ হচ্ছিল।

দুখানা গাড়িতে চড়ে আমরা নতুন বাড়িতে গেলাম। যে-গাড়িখানিতে নানা রকমের বাসন-পত্রের মধ্যে আমাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল সেখানি ভীষণ দুলতে লাগ্‌লো, যেন আমাকে কতকগুলো

মাল-পত্র সমেৎ তখনই বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এবং দু' বছর ধরে, আমার মায়ের মৃত্যুর সামান্য কাল আগে অবধি আমার মনে এই ধারণা সকলের চেয়ে বেশি করে জেগে ছিল যে, আমাকে বাইরে কোথাও ফেলে দেওয়া হয়েছে। বাসা বদলের অল্পকাল পরেই, দাদামশায় সবে ভিত-ঘর দুখানিতে ঘর-সংসার পেতে বসেছেন, এমন সময় মা এলেন। তিনি তখন হয়ে গেছেন পাংশু, শীর্ণ; তাঁর প্রকাণ্ড চোখ দুটি হয়ে উঠেছে অদ্ভুত রকমে উজ্জ্বল। তিনি এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন, তাঁর বাবা, মা ও আমাকে সেই প্রথম দেখ্ছেন। আমার বি-পিতাটি পিছনে হাত দুখানি দিয়ে মৃদু শিষ দিতে দিতে সারা ঘরে বেড়াতে বেড়াতে গলা খাঁকাড়ি দিতে লাগ্লেন।

আমার গালে তাঁর তপ্ত হাত দুখানি চেপে মা আমাকে বললেন, "ও ভগবান! তুমি কি ভয়ঙ্কর বড় হয়ে উঠেছো।" তাঁর পেটের কাছটা দেখাচ্ছিল খুব ফোলা।

আমার বি-পিতা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "কেমন আছ, ছোকরা? কেমন হচ্ছে?" তারপর বাতাস শুকে আবার বললেন, "জায়গাটা বড় স্যাঁৎ স্যেঁতে!"

দুজনকেই দেখাচ্ছিল ক্লান্ত, যেন তাঁরা বহুক্ষণ ধরে ছুটছিলেন। তাঁদের পোশাক হয়ে পড়েছিল বিশৃঙ্খল, ময়লা। তাঁরা যখন চা খাচ্ছিলেন, দাদামশায় বৃষ্টির জলে ধোওয়া জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাহলে আগুনে তোমাদের সব নষ্ট হয়ে গেছে?"

আমার বি-পিতা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "সব! নিতান্ত কপাল ভাল বলে আমরা বেঁচে গেছি।"

—"বটে!...আগুন যা-তা নয়!"

দিদিমার কাঁধে হেলান দিয়ে মা তাঁর কানে কানে কি যেন বললেন। যেন চোখে আলো লাগছে দিদিমা এম্নি ভাবে চোখ মিট্ মিট্ করলেন।



হঠাৎ দাদামশায় খুব স্পষ্ট, শান্ত ও বিদ্বেষভরা কণ্ঠে বললেন, "আমার কানে যে-গুজব এসেছে মশায়, ইউজেন বাসিলেফ, আগুন-টাগুন বাজে কথা, তুমি তাস-খেলায় সব হারিয়েছ।"



ঘরখানা স্তব্ধ হয়ে গেল। সে স্তব্ধতা ভঙ্গ হতে লাগলো কেবল স্যামোভারের সোঁ সোঁ ও জানলার সাসিতে বৃষ্টির চট্‌পট্ শব্দে। অবশেষে মা মিনতিমাখা কণ্ঠে বললেন, "পাপাশা—"

দাদামশায় কথাগুলো এমন জোরে বলে উঠলেন যে কানে তালা ধরে গেল, "কি বলতে চাও—'পাপাশা?' তারপর? আমি তোমাকে বলি নি কি ত্রিশ বছরের লোকের সঙ্গে কুড়ি বছরের যে তাকে মানায় না?...বড় ঘরের ছেলে!...কি?...বল?"

তাঁরা চারজনে গলা ছেড়ে চীৎকার করতে লাগলেন; আমার বি-পিতা চীৎকার করতে লাগলেন সকলের চেয়ে জোরে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে একটা কাঠের গাদার ওপর গিয়ে বসলাম। ঘরগুলোর দেওয়াল ছিল খালি, কড়িগুলোর খাঁজে খাঁজে শোণ গজিয়ে ছিল; শোণগুলোর মাঝে ছিল আরশুলার ঝাঁক। মা আর বি-পিতা রাস্তার দিকে জানলা-দেওয়া ঘর দুখানাতে থাকতেন; আমি দিদিমার সঙ্গে থাকতাম রান্নাঘরে। তার একটি জানলা ছিল ছাদের দিকে। ছাদের আর এক দিকে একটা কারখানার চিমনি উঠে গিয়ে ছিল আকাশের দিকে। আমাদের ঠাণ্ডা ঘরগুলো সর্ব্বদা ভরা থাকতো কিছু পোড়ার গন্ধে। ভোরের বেলা নেকড়েগুলো ডাকতো, "খেউ—উ—উ—"

দিদিমা সাধারণ পরিচারিকার কাজ করতেন; রাঁধতেন, ঘর ধুতেন, কাঠ কাটতেন এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যান্ত জল আনতেন। তিনি ঘরে আসতেন শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে। কখন কখন রান্না সেরে বাডিস পরে, স্কারটটা ওপরে তুলে তিনি শহরে যেতেন। বলতেন, "দেখে আসি বুড়ো কেমন আছে।"

বলতাম, "আমাকেও সঙ্গে নাও।"

—"তুমি জমে যাবে। দেখ কি রকম বরফ পড়ছে।" এবং তিনি রাস্তা দিয়ে বা তুষারাচ্ছন্ন মাঠ ভেঙে প্রায় চার ক্রোশ পথ হেঁটে যেতেন!

মায়ের রঙ হয়ে গিয়েছিল হলুদ। তখন তিনি অন্তঃসত্তা। গায়ে ছাই রঙের ছেঁড়া একখানা শাল জড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘুরে বেড়াতেন।

তাঁকে জিজ্ঞেস করে ছিলাম, "তুমি এখানে থাকো কেন?"

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "চুপ্!"

তিনি কদাচিৎ আমার সঙ্গে কথা বলতেন; যখন বলতেন তাও কোন কিছু করতে বলবার জন্য, "ওখানে যাও!...এখানে এস!... এটা আনো!"

আমাকে ঘন ঘন রাস্তায় বার হতে দেওয়া হত না এবং প্রত্যেক বারই বাড়ি ফিরতাম অন্য ছেলেদের মারের দাগ গায়ে নিয়ে। কারণ মারামারি করাটা ছিল আমার প্রিয়, বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র আনন্দ। মা আমাকে চামড়ার ফিতে দিয়ে মারতেন, কিন্তু শাস্তিটা আমাকে আরও উত্তেজিত করে তুলতো। পরের বার আমি শিশু-সুলভ তেজের সঙ্গে লড়তাম। তার জন্য মা আমাকে আরও খারাপ শাস্তি দিতেন। এমনি ভাবে চলতে লাগলো। শেষে একদিন আমি তাঁকে বললাম, তিনি যদি আমাকে মারা না ছাড়েন তাহলে তাঁর হাত কামড়ে দিয়ে

মাঠে ছুটে পালিয়ে যাব এবং সেখানে শীতে জমে মরবো। বিস্ময়ে তার কাছ থেকে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং বললেন, "তুমি একটা বুনো জানোয়ারের মতো হয়ে উঠছো।"

যে-বৃত্তিকে বলা হয় প্রেম তা এখন আমার হৃদয়ে পরিপূর্ণ ভাবে এবং রামধনুর মতো শিহরণে পুষ্পিত হয়ে উঠতে লাগলো। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ গাঢ় নীল, ধূমায়িত অগ্নিশিখার মতো প্রায়ই স্ফুরিত হত; এবং আমার অন্তরে জ্বলতো এক পীড়াদায়ক রোষভাব—সেই অন্ধকার অর্থহীন অস্তিত্বের চেতনা।

আমার বি-পিতা আমার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করতেন, মায়ের সঙ্গে কদাচিৎ কথা বলতেন এবং শিষ দিয়ে বেড়াতেন, কাসতেন এবং খাবার পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাঠি দিয়ে সযত্নে তাঁর অসমান দাঁতগুলি খুঁটতেন। মায়ের সঙ্গে তাঁর ঘন ঘন ঝগড়া হতে লাগলো। একদিন তিনি পা ঠুকে চীৎকার করে উঠলেন: "তুমি বোকা তাই অন্তঃসত্ত্বা হয়েছ, সেজন্যে আমি কাউকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে বলতে পারি না- -গরু কোথাকার!"

তাতে আমি বিস্মিত, এত ক্রুদ্ধ হয়ে এতখানি উঁচুতে লাফিয়ে উঠেছিলাম যে, ছাদে আমার ঠুকে যায় এবং জিভ্ কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ে।

শনিবারে মজুরেরা দলে দলে আমার বি-পিতার সঙ্গে দেখা করতে ও তাঁর কাছে তাদের খাদ্য-টিকিট বেচতে আসতো। সেগুলো তাদের কারখানার দোকানে দিয়ে টাকার বদলে খাদ্য নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাদের টাকার দরকার। আমার বি-পিতা অর্দ্ধেক দামে টিকিটগুলো কিনতেন।

মায়ের প্রসবের আগে অবধি আমাকে এই নিরানন্দ জীবন-যাপন করতে হ'ল। তারপর আমাকে আবার পাঠানো হল দাদামশায়ের কাছে। দাদামশায় তখন থাকতেন কুনাভিনে একখানি সরু ঘরে।

তিনি আমাকে দেখেই তীক্ষ্ণস্বরে হেসে উঠে বললেন, "এ কি? লোকে বলে নিজের মায়ের চেয়ে ভাল বন্ধু আর নেই; কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে, মা নয়, বুড়ো হতভাগা দাদামশাইই বন্ধু। উঃ!"

নতুন বাড়িখানির চারধার আমি ভাল করে দেখবার আগেই মা ও শিশুটিকে সঙ্গে করে দিদিমা এসে পৌঁছলেন। মজুরদের কাছ থেকে ছেচড়ামি করে টাকা আদায় করবার জন্য আমার বি-পিতাকে কারখানা থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তিনি আর একটি কাজের সন্ধান করেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে রেল-ষ্টেশনে বুকিং আফিসের কাজে নেওয়া হয়।

দীর্ঘ, বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাত্রার পর আর একবার আমি মায়ের সঙ্গে একটি গোদামের ভিত-ঘরে বাস করতে লাগলাম। তিনি স্থায়ী হতেই আমাকে স্কুলে পাঠালেন—প্রথম থেকেই তা আমার ভাল লাগলো না।

মায়ের জুতো পরে, দিদিমার একটা বডিস্-কেটে-তৈরী-কোট, ও হলদে রঙের শার্ট গায়ে দিয়ে আমি স্কুলে যেতাম। আমার পাজামাটাকে আরও লম্বা করে দেওয়া হয়েছিল। আমার পোশাকটা অবিলম্বে হয়ে উঠ্‌লো উপহাসের সামগ্রী। সেই হল্‌দে শার্টের জন্য আমার নাম দেওয়া হ'ল "রুইতনের টেক্কা।"

ছেলেদের সঙ্গে আমি অচিরেই বন্ধুত্ব স্থাপন করলাম, কিন্তু শিক্ষক ও পাদ্রি আমাকে পছন্দ করতেন না।

শিক্ষকটি ছিলেন যকৃৎ-রোগগ্রস্তের মতো হল্‌দে রঙের, মাথায়

টাক। তাঁর নাক দিয়ে অনবরত রক্ত পড়তো। নাকে তুলো গুঁজে তিনি ক্লাসে আস্তেন এবং টেবিলের ধারে বসে আমাদের অনুনাসিক স্বরে প্রশ্ন করতেন। একটা কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে তুলোটা নাক থেকে বার করে সেটাকে বার করে মাথা ঝাঁকাতেন। তাঁর মুখখানা ছিল থ্যাবড়া, তামাটে রঙের। তাতে একটা রুক্ষ ভাব ফুটে থাকতো। মুখের খাঁজগুলোতে ছিল সবুজ আভা। কিন্তু তাঁর চেহারার মধ্যে সব চেয়ে বিকট ছিল কাঁসা-রঙের চোখ দুটো। সে দুটো এমন বিশ্রী ভাবে আমার মুখে আটকে থাকতো যে, মনে হ'ত চোখ দুটোকে আমার গাল থেকে হাত দিয়ে মুছে ফেলে দিতেই হবে।



দিন কয়েক আমি ছিলাম প্রথম বিভাগে, ক্লাসের সকলের ওপরে। আমার বসবার জায়গা ছিল শিক্ষকের একেবারে কাছে; তখন আমার অবস্থা হয়ে ছিল দুর্বিষহ। বোধ হত তিনি আমাকে ছাড়া আর কাউকেই দেখ্তে পাচ্ছেন না, এবং সর্ব্বদা খোনা স্বরে বল্তেন, "পিয়েশ—কফ্, তুমি পরিষ্কার শার্ট পরবে। পিয়েশ—কফ পায়ের শব্দ করো না। পিয়েশ—কফ, তোমার জুতোর ফিতে আবার খুলে গেছে।"

কিন্তু তাঁর ধৃষ্টতার ফল আমি তাঁকে দিয়েছিলাম। একদিন একটা জমাট তরমুজের অর্দ্ধেক কেটে নিয়ে তার সব শাঁস চেঁচে ফেলে দিয়ে খোলাটা বাইরের দরজার মাথায় সরু দড়ি দিয়ে কপি-কলের সঙ্গে আটকে রেখে দিলাম। দরজাটা খুলতেই তরমুজটা গেল ওপর দিকে উঠে; কিন্তু শিক্ষক মশায় দরজা বন্ধ করতেই খোলাটা নেমে এসে তাঁর টেকো-মাথায় বসে গেল টুপির মতো। অবশ্য এই নষ্টামীর ফলও আমাকে পেতে হয়েছিল।

আর একবার তাঁর টেবিলের ওপর নস্য ছড়িয়ে রেখেছিলাম; তাতে তিনি এত হেঁচে ছিলেন যে, তাঁকে বাধ্য হয়ে ক্লাস ছেড়ে গিয়ে তাঁর ভগ্নীপতিকে তাঁর জায়গায় পাঠিয়ে দিতে হয়। ভগ্নীপতিটি ছিলেন একজন সামরিক কর্ম্মচারী। তিনি সারা ক্লাসকে দিয়ে গান গাইয়েছিলেন, "ঈশ্বর জারকে রক্ষা করুন" এবং "ও, স্বাধীনতা! আমার স্বাধীনতা!" যারা সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে পারে নি, তাদের তিনি মাথায় মেরেছিলেন রুলার দিয়ে।



ধর্ম্ম-শিক্ষকটি ছিলেন সুপুরুষ, তরুণ এক পাদ্রি। তাঁর মাথাভরা চুল ছিল। আমার বাইবল্ ছিল না বলে তিনি আমাকে পছন্দ করতেন না, আর আমি তাঁর কথা বলার ধরনকে বিদ্রূপ করতাম সেজন্যও। ক্লাসে ঢুকে তাঁর প্রথম কাজ ছিল আমাকে জিজ্ঞেস করা, "পিয়েশকফ, তুমি সে বইখানা এনেছো কি না? হাঁ। বইখানা!"

—"না; আমি সেখানা আনি নি। হাঁ।"

—"তার মানে কি—হাঁ?"

—"না।"

—"তুমি বাড়ি যেতে পারো। হাঁ—বাড়ি, কারণ আমি তোমাকে পড়াতে চাই না। হাঁ! আমি পড়াতে চাই না!"

তাতে আমার মনে বিশেষ কষ্ট হয় নি। আমি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে গ্রামের নোঙরা পথে পথে সারা ঘণ্টা ঘুরে বেড়ালাম, আর আমার চারধারে কোলাহলময় জীবন-যাত্রাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

পাদ্রিটির মুখখানি ছিল সুন্দর, খ্রীষ্টের মতো; চোখ দুটি নারীর চোখের মতো সোহাগ-মাখা, হাত দুখানি ছোট—কোমল। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি এমন কোমল ছিলেন না। তবুও তারা তাঁকে ভালোবাসতো।

আমার শিক্ষার উন্নতি হতে লাগলো ভালই। তা সত্ত্বেও আমাকে শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হ'ল অশোভন আচরণের জন্য আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম। কারণ দেখলাম, আমার পক্ষে খুব বিশ্রী সময় আসছে। মায়ের মেজাজ প্রত্যহই হয়ে উঠছিল রুক্ষ। তিনি আমাকে প্রায়ই মারতেন।



কিন্তু সাহায্যও পাওয়া গেল শীঘ্র। বিশপ গ্রীসানফ্ একদিন হঠাৎ স্কুল দেখ্তে এলেন। তিনি মানুষটি ছিলেন ছোট-খাটো; দেখ্তে গুণীনের মতো। যদি আমার ঠিক মনে পড়ে, তাঁর পিঠে ছিল কুঁজ।

তিনি টেবিলের ধারে বসে হাত নেড়ে জামার হাতা থেকে হাত দুখানি মুক্ত করে নিয়ে বললেন, "ছেলেরা, এস এক সঙ্গে কিছু কথা-বার্ত্তা বলি।"

তাঁর কালো পোশাকে তাঁকে দেখাচ্ছিল বড় মজার, মাথায় ছিল ছোট কলসীর মতো একটি টুপি।

তাঁর কথায় সারা ক্লাসটি সরগরম ও চঞ্চল হয়ে উঠলো এবং সর্ব্বত্র একটা অপরিচিত আনন্দ দেখা দিল।

আরও অনেকের পর তিনি আমাকে তাঁর টেবিলের কাছে ডেকে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বয়স কত? মোটে? তুমি কত লম্বা! মনে হয় তুমি প্রায়ই বাইরে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতে, থাকতে কি? অ্যাঁ?"

লম্বা, ধারালো নখশুদ্ধ একখানি শুকনো হাত টেবিলের ওপর রেখে, আর একখানির আঙুল দিয়ে পাত্‌লা দাড়িগুলো চেপে ধরে মুখখানি আমার মুখের খুব কাছে এনে বললেন, "বল দেখি, বাইবেলের গল্পগুলোর মধ্যে কোন্ গল্পটি তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে?"

তাঁর চোখ দুটি ছিল করুণায় ভরা। কিন্তু আমি যখন তাঁকে বললাম, আমার বাইবেল নেই, শাস্ত্রের ইতিহাস আমি পড়ি নি তখন তিনি বললেন, "কি রকম? তুমি জান, তোমার এটা পড়া অবশ্যই দরকার। কিন্তু তুমি হয়তো কারো মুখে শুনে কিছু শিখেছো? তুমি স্তবগুলো জানো? ভাল! আর প্রার্থনাগুলো!…হাঁ!…আর সাধু-মহাত্মাদেব চবিত কথাও?…পড়েছো?…তাহলে মনে হয় বিষয়টা তুমি ভালই জান।"



সেই মুহূর্তে আমাদেব পাদ্রিটি উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি হাঁপাচ্ছিলেন। বিশপ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন; কিন্তু তিনি আমার বিষয় বলতে আরম্ভ করতেই বিশপ হাত তুলে বললেন, "…এক মিনিট…ঈশ্বরভক্ত আলেকসির গল্পটি আমাকে বল তো!"

পরের পদ্যটি ভুলে গিয়েছিলাম বলে প্রথম পদ্যটির যেখানে পূর্ণচ্ছেদ ছিল সেখানে থামতেই তিনি বললেন, "চমৎকার পদ্যগুলো—কি বল বাবা? আচ্ছা এবার অন্য কিছু বল—রাজা ডেভিডেব সম্বন্ধে বল।…বলে যাও, আমি মন দিয়ে শুনছি।"

দেখলাম, তিনি বাস্তবিকই মন দিয়ে শুনছেন এবং পদ্যগুলো তাঁর ভাল লাগছে। তিনি আমাকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন এবং হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি স্তবগুলো শিখেছো? কে শিখিয়েছে? দাদামশায়টি ভাল, কি বল? অ্যাঁ? খারাপ? অমন কথা বলো না!…কিন্তু তুমি খুব দুষ্টু নও?"

আমি ইতস্তত করতে লাগলাম; কিন্তু পরিশেষে বললাম, "হাঁ"।

শিক্ষকমশায় ও পাদ্রিও আমার স্বীকারোক্তি বাচালতার সঙ্গে সমর্থন করলেন; বিশপমশায় চোখ দুটি নিচু করে তাঁদের কথা

শুনলেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "ওঁরা তোমার বিষয় যা বলছেন শুনছো? এখানে এস!"

তাঁর হাতখানি, তা থেকে সাইপ্রেস কাঠের মতো গন্ধ বার হচ্ছিল, আমার মাথায় রেখে বললেন, "তুমি এত দুষ্ট কেন?"

—"পড়াশুনো নীরস লাগে।"

—"নীরস? বাবা, এ কথা ঠিক নয়। পড়াশুনো যদি নীরস লাগে তাহলে তুমি পণ্ডিত হতে পারবে না; কিন্তু তোমার শিক্ষকেরা বলেন তুমি খুব চালাক ছাত্র। তার মানে তোমার দুষ্টু হবার অন্য কারণ আছে।"

তাঁর বুকের ভেতর থেকে একখানি ছোট বই বার করে তার ওপর লিখ্‌তে লিখ্‌তে তিনি বললেন, "পিয়েশকফ, আলেক্‌সি। এই নাও!...তাহলেও বাবা, তোমার নিজেকে সাম্‌লে চল্‌তে হবে, যাতে দুষ্টু না হও তার চেষ্টা করতে হবে।...আমরা তোমাকে একটু দুষ্টুমি করতে দেব; কিন্তু ওটা ছাড়াও লোককে জ্বালাতন করবার আর কত জিনিষ আছে। তাই নয়, ছেলেরা?"

বহু কণ্ঠ আনন্দে উত্তর দিলে, "হাঁ।"

—"কিন্তু দেখছি, তোমরা নিজেরা খুব বেশি দুষ্টু নও। আমার কথা ঠিক তো?"

ছেলেরা সকলে হাসতে হাস্‌তে এক সঙ্গে উত্তর দিলে, "না। আমরাও খুব দুষ্টু—খুব।"

বিশপমশায় চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে, হঠাৎ আমাদের সকলকে—এমন কি শিক্ষকমশায় ও পাদ্রিকেও হাসিয়ে বললেন, "একথাটা কিন্তু সত্যি ভাই, তোমাদের বয়সে আমিও ছিলাম দুষ্টু। তোমাদের কি মনে হয়?"

ছেলেরা হেসে উঠলো। অবশেষে তিনি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "দেখ, তোমাদের সঙ্গে থাকতে বড় ভাল লাগে; কিন্তু আমার এখন যাবার সময় হয়েছে।"

হাত তুলে জামার হাতা গুটিয়ে তিনি আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

কাউল তুলিয়ে তিনি বললেন, "আমি আবার আসবো। আবার আসবো। তোমাদের জন্যে কতকগুলো ছোট ছোট বই আন্‌বো।"

ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি শিক্ষকমশায়কে বললেন, "ওদের ছুটি দিন; বাড়ি যাক্।"

তিনি আমার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে শান্ত ভাবে বললেন, "তাহলে তুমি শান্ত হয়ে চলবে, চলবে না?...এই কথা রইলো?...বুঝ্‌তে পারি তুমি কেন দুষ্টু...বিদায় বাবা।"

আমি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লাম। আমার অন্তরে বিচিত্র ভাব উদ্বেলিত হতে লাগলো এবং শিক্ষকমশায় ক্লাসের সকলকে ছুটি দিয়ে কেবল আমাকে রেখে যখন বললেন, আমাকে জলের চেয়েও শান্ত এবং তৃণের চেয়েও নম্র হতে হবে, তখন তাঁর কথাগুলি মন দিয়ে স্বেচ্ছায় শুনলাম।

পাদ্রিমশায় তাঁর ফার-কোটটি গায়ে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "আর আজ থেকে তোমাকে আমার পড়াবার কাজে সাহায্য করতে হবে। শান্ত হয়ে বসে থাকতে হবে। হাঁ,—শান্ত হয়ে বসতে হবে।"

কিন্তু স্কুলে যখন অবস্থাটা ভাল হয়ে উঠছিল, বাড়িতে তখন ঘটলো এক অপ্রীতিকর ঘটনা। একদিন মায়ের একটি রুবল্ চুরি করলাম। অপরাধটা করলাম কিছু না ভেবেই। এক সন্ধ্যায় মা আমার ওপর বাড়ির ও খোকার দেখাশোনার ভার নিয়ে বেরিয়ে

গেলেন। একা থাক্‌তে ভাল লাগছিল না, তাই আমার বি-পিতার "জনৈক চিকিৎসকের স্মৃতিকথা" নামে একখানি বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে দুখানা নোট দেখতে পেলাম—একখানা দশ রুব্‌লের, একখানা এক রুব্‌লের। বইখানা আমি বুঝতে পারলাম না, তাই বন্ধ করে রাখলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার মাথায় এল, এক রুবল্ পেলে আমি কেবল একখানা বাইবল্ই কিনতে পারবো না, সেই সঙ্গে একখানা রবিনসনক্রুশোও কিনতে পারবো। এই ধরনের একখানা বই আছে এ কথা আমি স্কুলে অল্পকাল আগেই শুনেছিলাম। একদিন স্কুলে টিফিনের সময় তুষারপাত হচ্ছিল; আমি ছেলেদের রূপকথা বলছিলাম। তখন তাদের মধ্যে একজন অবজ্ঞার সুরে বলে উঠলো, "রূপ-কথাগুলো বাজে! আমি ভালোবাসি 'রবিনসনের' গল্প। ওটা সত্যি গল্প।"

দেখলাম, আরও জন কতক ছেলে 'রবিনসন ক্রুশোর' গল্প পড়েছে এবং তারা বইখানার সুখ্যাতি করতে লাগলো। দিদিমার রূপকথাগুলো তারা পছন্দ করলে না দেখে, ঠিক করলাম আমি নিজে রবিনসন ক্রুশো পড়বো, যাতে তাদের বল্‌তে পারি গল্পটা "বাজে"।

পরদিন আমি স্কুলে আনলাম, একখানা বাইব্‌ল আর অ্যানডারসনের ছেঁড়া দু'খণ্ড রূপকথা। সেই সঙ্গে আনলাম, তিন পাউন্‌ড্‌ সাদা পাঁউরুটি ও এক পাউন্‌ড্‌ সসেজ। ভ্লাদিনারসকু গির্জ্জার দেওয়ালের গায়ে একখানি ছোট অন্ধকার দোকানের শো-কেসে একখানি "রবিনসনও" ছিল। পাতলা হলদে মলাট-দেওয়া বই। তার ওপরে ছিল একটি দাড়িওয়ালা লোকের ছবি। বইখানার চেহারা আমার ভাল লাগলো না। এমন কি ছেঁড়া হলেও রূপ-কথার বই দুখানার বাইরের চেহারাটি ছিল ভাল।

দীর্ঘ খেলার সময়টাতে আমি ছেলেদের মধ্যে রুটি ও সসেজ বিতরণ করলাম এবং আমরা পড়তে আরম্ভ করলাম "নাইটিংগেল" নামে সেই চমৎকার গল্পটি।

"চীনদেশে সব লোকই চীনে, এমন কি, সম্রাটও চীনেম্যান।" মনে পড়ে এই বাক্যটির অনাড়ম্বর আনন্দময় ধ্বনিটি কেমন ভাবে আমার অন্তর স্পর্শ করেছিল। গল্পটিতে ছিল আরও অনেক চমৎকার চমৎকার অংশ।

কিন্তু স্কুলে গল্পটি পড়বার অনুমতি পাওয়া গেল না। বাড়িতেও সময় হল না। বাড়িতে এসে দেখি মা আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ফ্রাইংপ্যান তার ওপর ধরে ডিম ভাঙছেন। তিনি আমাকে অদ্ভুত, চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি সেই রুবলটা নিয়েছো?"

—"হাঁ, নিয়েছি—ঐ বইখানার ভেতর থেকে।"

ফ্রাইংপ্যানটা দিয়ে তিনি আমাকে খুব মেরে অ্যানডারসনের বইখানা কেড়ে নিয়ে কোথায় যেন লুকিয়ে রাখলেন। সেখানা আমি আর খুঁজে পেলাম না। মারের চেয়ে এই শাস্তিটা আমার পক্ষে হল আরও খারাপ।

কয়েক দিন স্কুলে গেলাম না। সেই সময়ে আমার বি-পিতা নিশ্চয়ই আমার কাহিনীটি তাঁর কোন বন্ধুর কাছে বলে থাকবেন। তিনি বলেছিলেন তাঁর ছেলেদের কাছে। তারা আবার গল্পটি বলেছিল স্কুলে। তাই আমি আবার যখন স্কুলে গেলাম, তখন নতুন আখ্যায়িকাটি শুনতে পেলাম—"চোর।"

বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট, কিন্তু সত্য নয়। কারণ রুবলটি যে আমিই নিয়েছি এ কথা আমি গোপন করি নি। আমি তাদের ব্যাপারটি বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তারা বিশ্বাস করলে

না। তাই ছুটির পর বাড়ি গিয়ে মাকে বললাম, "আমি আর স্কুলে যাচ্ছি না।"

তিনি আমার অন্তঃসত্তা হয়েছিলেন। তখন জানলার কাছে বসে আমার ভাই সাস্‌কাকে স্তন্য পান করাচ্ছিলেন। তাঁর মুখখানি হয়ে গিয়েছিল পাংশু। তিনি মাছের মতো হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এবং শান্ত ভাবে বললেন, "তুমি ভুল করছো। তুমিই যে রুবলটি নিয়েছিলে একথা কারোই জানা সম্ভব নয়।"



—"তুমি নিজে গিয়ে তাদের সকলকে জিজ্ঞেস করো।"

—"তুমি নিজেই কথাটা বলে বেড়িয়ে থাকবে। স্বীকার কর—তুমি নিজে বলেছিলে? সাবধান, কাল আমি বার করবো কথাটা কে স্কুলে রটিয়েছে।"

আমি তাঁকে ছাত্রটির নাম বললাম। তাঁর মুখখানি করুণভাবে কুঞ্চিত হয়ে গেল এবং চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

আমি রান্নাঘরে গিয়ে আমার বিছানাটিতে শুয়ে পড়লাম। বিছানা বল্‌তে ষ্টোভের পিছনে দুটি কাঠের বাক্স। সেখানে শুয়ে মায়ের কান্না শুনতে পেলাম, "হা ঈশ্বর!"

ঘরে তেলচিটে কাপড়-চোপড় শুকোচ্ছিল। সেগুলোর বিশ্রী গন্ধ আর সইতে না পেরে উঠে আঙিনায় গেলাম, কিন্তু মা আমাকে ডাকলেন, "কেথোয় যাচ্ছো? যাচ্ছো কোথায়? আমার কাছে এস।"

দু'জনে মেঝেয় বস্‌লাম। সাসকা মায়ের জানুর ওপর শুয়ে তাঁর জামার বোতাম ধরে মাথা তুলে বললে "বুভুগা"। "পুগোভকাকে" (বোতামকে) সে বল্‌তো তাই।

আমি মায়ের গা ঘেঁষে বসলাম। তিনি আমাকে চুম্বন করে বললেন, "আমরা…গরীব; প্রত্যেকটি কোপেক…প্রত্যেকটি কোপেক…"

কিন্তু যে-কথাটি তিনি বল্‌তে আরম্ভ করেছিলেন, তা শেষ করলেন না, আমায় তপ্ত হাতখানি দিয়ে চেপে ধরলেন।

তারপরে হঠাৎ বলে উঠলেন, “কি জঞ্জাল—জঞ্জাল!”

সাস্‌কা কথাটি বিকৃত করে উচ্চারণ করলে।



সে ছেলেটি ছিল অদ্ভুত। তার শরীরটি ছিল কিম্ভূতকিমাকার, মাথাটি ছিল প্রকাণ্ড, চোখ দুটি সুন্দর গাঢ় নীল। নীরবে হাসতে হাসতে এমনভাবে সে চারধারে তাকাতো ঠিক যেন কাউকে আশা করছে। কি করে যেন তার আঙুল থেকে বা'র হত ভায়লেট ফুলের গন্ধ। বিনা অসুখেই সে হঠাৎ মারা যায়। অন্য দিনের মতোই সেদিনও সকালে সে ছিল খুশী, কিন্তু সন্ধ্যায় যখন গির্জ্জায় উপাসনার ঘণ্টা বাজ্‌ছে তখন তার মৃত্যু হয়। মা যা করবেন বলেছিলেন সেই মতো কাজও করেছিলেন। স্কুলের অবস্থাটা হল ভালই। কিন্তু শীঘ্রই আবার একটি গোলমালে জড়িয়ে পড়লাম।

একদিন সন্ধ্যায় চা খাবার সময় আঙিনা থেকে রান্নাঘরে ঢুকছি এমন সময় মায়ের কাতর কান্না শুনতে পেলাম, “ইউজেন, তোমায় মিনতি করি, মিনতি করি—”

আমার বি-পিতা বললেন, “ধ্যেৎ!”

—“কিন্তু তুমি সেই মেয়েটার কাছে যাচ্ছ—আমি জানি।”

—“তাতে কি?”

কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁরা দুজনেই চুপ করে রইলেন। তারপর কাস্‌তে কাস্‌তে মা বললেন, “কি জঘন্য জঞ্জাল তুমি!”

আমার বি-পিতাকে মাকে মারতে শুনলাম। ছুটে ঘরের ভেতর গিয়ে দেখলাম, মা হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন। তাঁর পিঠ ও কনুই দুটো রয়েছে একখানা চেয়ারে লেগে, বুকখানি আছে সামনের দিকে

এগিয়ে, মাথাটি পড়েছে পিছনের দিকে হেলে ; গলায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হচ্ছে আর চোখ দুটি ভীষণ জ্বল্‌ছে। আর সেই লোকটা তার সব চেয়ে ভাল পোশাকটি পরে, গায়ে নতুন ওভারকোট চড়িয়ে, লম্বা পা বাড়িয়ে তাঁর বুকে লাথি মারছে। টেবিলের ওপর থেকে আমি একখানি ছুরি তুলে নিলাম। ছুরিখানার হাতলটা ছিল হাড়ের ; তার ওপর ছিল রুপোর কাজ করা। ছুরিখানা দিয়ে পাঁউরুটি কাটা হ'ত। বাবার ঐ একটি মাত্র জিনিষ মায়ের কাছে ছিল। ছুরিখানা শক্ত ক'রে ধরে আমার গায়ের সব শক্তি দিয়ে আমার বি-পিতার পাজরায় মারলাম।

সৌভাগ্য যে মা ম্যাকসিমফকে ঠিক সময়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ছুরিখানা পাশ ঘেঁসে ঢুকে গিয়ে তাঁব ওভারকোটে খুব বড় একটা গর্ত্ত করে গায়ের চামড়া ছড়ে ফেল্‌লে মাত্র। আমার বি-পিতা পাজরাটা চেপে ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। মা আমাকে চেপে ধরে শূন্যে তুলে ফেললেন। তারপর আর্ত্তনাদ করে মেঝেয় ছুড়ে ফেলে দিলেন। আমার বি-পিতা আঙিনা থেকে ফিরে এসে আমাকে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে গেলেন।

তারপর অনেক রাত্রে, এ-সব সত্ত্বেও তিনি যখন বেরিয়ে গিয়েছিলেন, মা ষ্টোভের পিছনে আমার কাছে এসে আমাকে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমাকে ক্ষমা কর ; দোষটা ছিল আমারই ! বাবা, তুমি কি করে এমন কাজ করতে পারলে ?...ছুরি দিয়ে... ?"

স্পষ্ট মনে আছে, আমি তাঁর কাছে কি ভাবে বলেছিলাম, আমার বি-পিতাকে খুন করবো, আর নিজেও আত্মহত্যা করবো। মনে হয়, আমি তা করতামও, অন্তত তার চেষ্টাও করতাম। এখনও চোখের

সামনে ভাসছে সেই বিণনী বসানো পাজামা-পরা জঘন্য পাখানা একটি নারীর বক্ষে আঘাত করছে। তার বহু বৎসর পরে সেই হতভাগ্য ম্যাকসিমফ আমার চোখের সামনে একটি হাসপাতালে মারা যান। সে-সময়ে তাঁর সঙ্গে আমি আশ্চর্য্যভাবে সখ্যতার বাঁধনে বাঁধা হয়ে পড়ে ছিলাম। চোখের জলের ভেতর দিয়ে দেখলাম তাঁর সুন্দর চঞ্চল চোখ দুটির আলোটুকু ক্রমেই ম্লান হয়ে আস্তে আস্তে শেষে একেবারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সেই করুণক্ষণে আমার হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেও আমি ভুলতে পারি নি যে, তিনি আমার মাকে লাথি মেরেছিলেন।

আমাদের উচ্ছৃঙ্খল রুষ-জীবনের পীড়াদায়ক বিভীষিকার কথা যখনই মনে পড়ে, তখন প্রায়ই নিজের মনে প্রশ্ন করে থাকি, সেগুলো বলে লাভ আছে কিনা। আর তারপরই দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে নিজের প্রশ্নের উত্তর দিই—"লাভের। কারণ এটা হচ্ছে সত্য ও জঘন্য বাস্তব, যা আজও দূর হয় নি। এই সত্যের মূল অবধি স্মৃতি থেকে, লোকের মন থেকে, আমাদের সঙ্কীর্ণ, হীন জীবন থেকে উৎপাটিত করতে হবে।"

তা ছাড়া আরও একটি গুরুতর কারণ আমাকে এই বিভীষিকাগুলি বর্ণনা করতে ব্যাকুল করছে। যদিও সেগুলো এমন ঘৃণ্য, যদিও সেগুলো আমাদের পীড়া দেয় এবং বহু সুন্দর অন্তর নির্জীব করে ফেলে তবুও রুষদেশবাসীর অন্তর এখনও এমন সুস্থ, সবল ও তরুণ যে তারা সেগুলোর ওপরে উঠ্‌তে পারে। কারণ আমাদের এই চমকপ্রদ জীবনধারায় কেবল আমাদের পাশবিক দিকটাই বৃদ্ধি পায় না ও পুষ্ট হয় না, এই পাশবিকতার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি লাভ করছে, এ-সব সত্ত্বেও বিজয়ী হয়ে উঠছে এক ধরনের প্রাণবান, সবল ও সৃষ্টিক্ষম মনুষ্যত্ব।

তা আমাদের নব-জীবনের পথে অনুপ্রেরণা দান করছে। তখন আমরা সকলেই শান্তিতে ও পারস্পরিক প্রেমে জীবন ধারণ করতে পারবো।



## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আবার আমি এলাম দাদামশায়ের কাছে।

তাঁর সাদর সম্ভাষণ হল, “কিরে ডাকাত, কি চাস্?” কথাগুলি বলবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি টেবিলে টোকা দিতে লাগলেন। এবং আবার বললেন, “আমি তোমাকে আর খাওয়াতে যাচ্ছি না; তোমার দিদিমা তোমাকে খাওয়ান গে।”

দিদিমা বললেন, “আমি তাই করবো।”

দাদামশায় বলে উঠলেন, “বেশ, যদি খাওয়াতে চাও খাওয়াও।” তারপর শান্ত হয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, “ও আর আমি এখন আলাদা থাকি। আমাদের কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।”

দিদিমা জানলার নিচে বসে তাড়াতাড়ি আঙুল চালিয়ে লেস্ তৈরি করছিলেন। সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার কথা দিদিমা হাস্তে হাসতে বললেন। তিনি দিদিমাকে দিয়েছিলেন সমস্ত বাসন-পত্র। দেবার সময় বলেছিলেন, “এই তোমার ভাগ; আমার কাছে আর কিছু চেও না।”

আর তিনি নিয়েছিলেন, দিদিমার একটা শিয়ালের ফারের ক্লোকসমেৎ সব পুরোনো কাপড়-চোপড়। এবং সেগুলো সাত শ' রুবলে বেচে, টাকাগুলো তাঁর য়িহুদি ধর্ম্মপুত্রটির কাছে সুদে খাটাতে দিয়েছিলেন। সে লোকটার ছিল ফলের কারবার। পরিশেষে দাদামশায়কে পেয়ে বস্লো লোভ-ব্যাধি। তিনি লজ্জাসরম হারিয়ে

ফেললেন। তাঁর সাবেক সহ-কর্ম্মী, ধনী ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে বল্‌তে আরম্ভ করলেন যে, ছেলেরা তাঁর সর্ব্বনাশ করেছে। এবং সাহায্য করবার জন্য তাদের কাছে টাকা চাইতে লাগলেন। তারা তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। তিনি তার সুযোগ নিলেন। তারা তাঁকে মুক্ত হস্তে দান করতে লাগলো বেশ মোটা টাকার নোট। নোটগুলো তিনি দিদিমার মুখের সামনে গর্ব্ব ভরে নেড়ে, তাঁকে শিশুর মতো বিদ্রূপ করে বলতে লাগলেন, "দেখ্, বোকা, তোকে এর শতাংশও লোকে দেবে না।"



এই ভাবে যে-টাকাগুলো তিনি পেতেন, এক বন্ধুর কাছে সুদে খাটাতে দিলেন।

আমাদের সংসারের সমস্ত খরচ খুব সতর্কতার সঙ্গে ভাগ করা হত। একদিন দিদিমার টাকা থেকে কেনা জিনিষ-পত্র দিয়ে আহার্য্য প্রস্তুত করা হ'ত; আর পরের দিনের খাবার খরচ দিতেন দাদামশায়। কিন্তু তাঁর খাদ্যাদি দিদিমার মতো ভাল হ'ত না। কারণ দিদিমা কিনতেন ভাল মাংস; আর দাদামশায় কিন্‌তেন মেট্‌লি ও ছাঁট। তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব চা-চিনির ভাণ্ডার ছিল; কিন্তু একই পাত্রে চা তৈরী হত। দাদামশায় উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলতেন, "থামো! একটু থামো!...কতখানি চা দিয়েছ?"

চায়ের পাতাগুলো হাতে ঢেলে নিয়ে তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে মেপে বলতেন, "তোমার চাগুলো আমার চায়ের চেয়ে সরু। কাজেই আমি কম চা দেব। কারণ আমার চা-গুলো বড়।"

তিনি এ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখতেন যাতে দিদিমা তাঁর ও দিদিমার নিজের জন্য সমান চা ঢালেন আর তিনি যতবার পেয়ালায় চা ঢালবেন দিদিমাও ঢালবেন ততবার।

সবটুকু চা ঢালবার ঠিক আগেই দিদিমা জিজ্ঞেস করতেন, "শেষ পেয়ালাটা কি হবে?"

দাদামশায় টি-পটটার ভেতর দেখে নিয়ে বলতেন, "শেষ পেয়ালাটার মতো যথেষ্ট আছে।"

এমন কি বিগ্রহের সামনের প্রদীপটার জন্যেও তিনি পৃথক ভাবে তেল কিনতেন—আর এই কাণ্ডটি ঘটতো তাঁদের দুজনের পঞ্চাশ বৎসরের মিলিত শ্রমের পর!

দাদামশায়ের এই সব চালাকিতে আমি আনন্দ ও বিরক্তি দুই-ই বোধ করতাম, কিন্তু দিদিমার কাছে সেগুলো ছিল কেবল মজার।

তিনি আমাকে সান্ত্বনার স্বরে বলতেন, "তুমি চুপ কর! তাতে কি? উনি হচ্ছেন বুড়ো, একেবারে বুড়ো মানুষ। ওঁর ভিমরতি হয়েছে এই যা। ওঁর বয়স হবে আশী বছর কি তার চেয়েও বেশি। উনি ছেলেমানুষী করুন। তাতে কার কি ক্ষতি হয়? আর আমি নিজের আর তোমার জন্যে একটু খাটবো—তাতে কিছু নয়।"

আমি যৎসামান্য উপার্জ্জন শুরু করলাম। ছুটির দিনে খুব সকালে একটা থলি নিয়ে আঙিনায় আঙিনায় হাড়, ন্যাকড়া, কাগজ ও পেরেক কুড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম। ন্যাকড়া-কারবারীরা ত্রিশ সের ন্যাকড়া ও ছেঁড়া কাগজ বা পেরেকের জন্য দিত বিশ কোপেক; আর বিশ সের হাড়ের জন্য দিত দশ বা আট কোপেক। ছুটির দিন ছাড়াও স্কুলের পর এই সব কুড়োতাম এবং শনিবারে জিনিষগুলো ত্রিশ কোপেক বা আধ রুবলে বেচতাম। কপাল ভাল হলে কখন কখন তার চেয়ে পেতাম বেশি। দিদিমা টাকাগুলো আমার কাছ থেকে নিয়ে তাঁর স্কারটের পকেটে তাড়াতাড়ি পুরে আমার দিকে তাকিয়ে

প্রশংসা করতেন, "বা! মানিক আমার। এ দিয়ে আমাদের খোরাকি চলবে···খাসা কাজ করেছো।"

একদিন তাঁকে দেখলাম, আমার পাঁচটি কোপেক হাতে নিয়ে, সেগুলোর দিকে তাকিয়ে নীরবে কাঁদছেন। ন্যাকড়া কুড়োনের চেয়ে আরও লাভের কাজ ছিল ওকানদীর ধারে কাঠের আড়ং বা চর থেকে কাঠ ও তক্তা চুরি করা।



আমি কয়েকটি দোসর জোগাড় করে ছিলাম। একজন ছিল সাংকা ভিয়াখির, এক ভিখারীর ছেলে। তার বয়স হবে বছর দশেক। ছেলেটি ছিল কোমলমনা, ধীর প্রকৃতি। আর একজন ছিল কোসট্রাম, তার আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। সে ছিল লম্বা, রোগা। তার চোখ দুটো ছিল খুব কালো। তার তখন তেরো বছর বয়স। এক জোড়া পায়রা চুরি করবার জন্য তাকে পাঠানো হয়ে ছিল চোর-বদমায়েসদের একটা বসতিতে। দলে ছিল এক ক্ষুদে তাতার; নাম খাবি। বারো বছর বয়সের "পালোয়ান"। সে ছেলেটি ছিল সরল। তার অন্তর কোমল। আর ছিল ইয়াজ, একজন কবর-চৌকিদার ও কবর-কাটার ছেলে। তার বয়স ছিল আট বছর। সে ছিল মাছের মতো মূক। তার মূর্চ্ছা রোগ ছিল। সকলের চেয়ে বয়সে বড় ছিল গ্রিন্‌কো চারকা, এক দর্জ্জির ছেলে। সে ছিল বুদ্ধিমান ও সরল। ঘুষি চালাতে সে ছিল ভীষণ ওস্তাদ। আমরা সকলে ছিলাম একই রাস্তার বাসীন্দা।

আমাদের গ্রামে চুরিকে অপরাধ গণ্য করা হ'ত না। ওটা একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর কার্য্যত অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট বাসীন্দাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায় ছিল তাই-ই। মেলা দেড়মাস থাকতো। কিন্তু তা তাদের সারা বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারতো না।

অনেক ভদ্র-পরিবারও "নদীতে যৎসামান্য কাজ-কর্ম্ম করতেন"—জোয়ারে যে-সব কাঠ ও তক্তা ভেসে যেত সে-সব ধরে এক এক বারে পৃথকভাবে বা এক সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কিন্তু এই পেশাটির মধ্যে প্রধান ছিল বজরা থেকে চুরি করা। অথবা ভলগা বা ওকার তীরে ঘোরা-ঘুরি করে যা-কিছু ঠিকমতো ও সাবধানে না রাখা হ'ত তাই-ই হাতানো। বয়স্করা রবিবারে তাদের সাফল্যের বড়াই করতো আর ছোটরা শুনে শিখতো।



বসন্তকালে, মেলার আগে গরমের সময় যখন গ্রামের পথ-ঘাট মাতাল, মজুর, গাড়োয়ান ও নানা রকমের কারিগরে ভরে যেত তখন গ্রামের ছেলেদের কাজ ছিল তাদের পকেট হাতড়ানো। তারা চুরি করতো ছুতোরের যন্ত্রপাতি, অসাবধান গাড়োয়ানদের চাবি, ঘোড়ার সাজ, আর গাড়ির চাকার লোহা। কিন্তু আমাদের ছোট দলটি এ ধরনের কাজ-কর্ম্মে যোগ দিত না। চারকা একদিন স্থির কণ্ঠে জানিয়ে দিলে, "আমি চুরি করবো না। মা আমাকে চুরি করতে দেয় না।"

খাবি বললে, "আর আমার ভয় করে।"

ক্ষুদে চোরদের প্রতি কোসট্রামের ছিল গভীর ঘৃণা। সে "চোর" কথাটি উচ্চারণ করতো অদ্ভুত জোর দিয়ে। সে যখন দেখতো অপরিচিত ছেলেরা মাতালদের পকেট মারছে, তখন সে তাদের তাড়িয়ে দিত আর তাদের কাউকে ধরতে পারলে তাকে দিত বেদম প্রহার। সে বালক হলেও নিজকে মনে করতো বয়স্ক ব্যক্তি।...

ভিয়াখির চুরি করাটাকে মনে করতো পাপ। কিন্তু চর থেকে খুঁটি ও তক্তা নেওয়াকে পাপ বলে ধরা হ'ত না। সে ভয় আমাদের কারোই ছিল না।

আমাদের লুঠের মাল বেচে লাভটা ছটি ভাগে ভাগ করতাম।

সেটা সময় সময় আমাদের ভাগে পড়তো পাঁচ বা সাত কোপেক করে। সেই টাকায় একটা দিন বেশ আরামে থাকা সম্ভব ছিল; কিন্তু ভিয়াখিরের মা তাকে মারতো যদি সে এক গেলাস ব্র্যাণ্ডি বা ভদ্‌কার জন্য কিছু না আনতো। কোস্‌ট্রোম টাকা জমাতো, পায়রার বাসা তৈরি করবে বলে। চারকার মায়ের অসুখ ছিল। তাই সে যতখানি সম্ভব কাজ করতো। খাবিও টাকা জমাতো দেশে ফিরে যাবার আশায়। সেখান থেকে তার কাকা তাকে নিয়ে এসেছিল; কিন্তু আসবার অল্পকাল পরেই লোকটি নিজনিতে ডুবে মরে! খাবি ভুলে গিয়েছিল সেই শহরটার কি নাম। তার কেবল এইটুকু মনে ছিল, জায়গাটা ভলগার কাছে কামা নদীর ধারে। কি একটা কারণে আমরা এই শহরটাকে নিয়ে মজা করতাম; তাতারটিকে ক্ষেপাতাম।

প্রথমে খাবি আমাদের ওপর রাগ করতো। একদিন ভিয়াখির তাকে তার পাখীর মতো গলায় বললে, "তোমার কি হয়েছে? তোমার সাথীদের ওপর তুমি নিশ্চয়ই রাগ কর নি?"

তাতে তাতারটি লজ্জিত হয়। পরে আমরা যখন কামার ধারে সেই অজানা শহরটির গান গাইতাম, তখন সে তাতে আনন্দে যোগ দিত।

তবুও তক্তা চুরির চেয়ে আমরা ন্যাকড়া ও হাড় কুড়োনোই পছন্দ করতাম বেশি। বসন্তকালে যখন তুষার গলে যেত এবং বৃষ্টিতে পথ ও পেভমেণ্ট সব ধুয়ে পরিষ্কার করে দিত তখনই এই কাজটি ছিল মজার। যেখানে মেলা বস্‌তো তার কাছে নর্দ্দমায় আমরা প্রচুর পেরেক ও লোহার টুকরো কুড়িয়ে পেতাম; মাঝে মাঝে পয়সা ও টাকাও পেতাম। কিন্তু চৌকিদারকে শান্ত করতে, যাতে সে আমাদের তাড়া না করে বা আমাদের থলে কেড়ে না নেয়, সেজন্য তাকে কয়েকটি কোপেক দিতে বা প্রগাঢ় সম্মান দেখাতে হত। কিন্তু টাকা পাওয়া

সহজ ছিল না। তা সত্ত্বেও আমরা সকলে বেশ সদ্ভাবে ছিলাম। তবে কখন কখন আমাদের মধ্যে একটু-আধটু বাদ-বিতণ্ডা হত বটে কিন্তু কখনো যে গুরুতর কলহ হত এ কথা মনে পড়ে না।

আমাদের দলে যারা লিখতে-পড়তে পারতো সে কেবল চারকা আর আমি। ভিয়াখির আমাদের খুব ঈর্ষা করতো; বলতো, "আমার মা মরলেই আমিও স্কুলে যাব। মাস্টারের কাছে বুকে হেঁটে গিয়ে আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে নেবার প্রার্থনা জানাবো। লেখা-পড়া শেষ হয়ে গেলে আরক বিশপের কিম্বা হয়তো স্বয়ং সম্রাটের বাগানের মালি হব।"

তার মা বসন্তকালে এক বৃদ্ধের সঙ্গে এক বোতল ভদকা শুদ্ধ একটা কাঠের গাদা চাপা পড়ে মারা গেল। বৃদ্ধটি গির্জ্জা-বাড়ির জন্যে চাঁদা আদায় করে বেড়াতো। সকলে স্ত্রীলোকটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চারকা ভিয়াখিরকে বললে, "চল, আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমার মা তোমাকে লিখতে-পড়তে শেখাবে।"

এবং খুব অল্পকালের মধ্যেই ভিয়াখির গর্ব্বভরে মাথা তুলে সাইন-বোর্ডের গায়ে লেখা "মুদিখানা" কথাটি পড়তে পারতো। তবে সে পড়তো "বালাকেইনিয়া"। চারকা তাকে সংশোধন করে দিত, "আরে ওটা 'বাকালেইনিয়া'।

—"জানি—কিন্তু অক্ষরগুলো চারধারে এমন লাফায়! ওরা লাফায় তার কারণ ওদের পড়া হচ্ছে বলে খুশি হয়।"

তুষারপাতের ও ঝড়-বৃষ্টির দিনে কবরস্থানে ইয়াজের বাড়িতে আমরা জড় হতাম। সেখানে তার বাবাও থাকতো। আমরা চা, চিনি, পাঁউরুটি কিনতাম, আর কিনতাম ইয়াজের বাবার জন্য কিছু ভদকা। চারকা তাকে কঠোর স্বরে হুকুম করতো, "এই অকর্ম্মা চাষী, স্যামোভারে আগুন দাও।"

সে হেসে তাই করতো। চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমরা কাজের কথা আলোচনা করতাম; আর সে আমাদের সুপরামর্শ দিত। একদিন বললে, "দেখ, পরশু দিন টুমভের ওখানে ভোজ হবে···সেখানে হাড় কুড়োতে পারবে।"

চারকা মন্তব্য করলে, "সেখানকার সব হাড় রাঁধুনিটা কুড়িয়ে নেয়।"···

ইয়াজের বাবা বলতো, "তোমরা চোর···।"

ভিয়াখির বলতো, "আমরা মোটেই চোর নয়।"

—"তাহলে ক্ষুদে চোর!"

চারকা কখন কখন তাকে ধমক দিত, "চুপ করো।"

যে-সব বাড়িতে রোগী থাকতো সে সে-সব বাড়ি গুণতো বা আন্দাজ মতো বলতো গ্রামের কত লোক শীঘ্রই মরবে। তার এ-সব কথা শুনতে ভালো লাগতো না। সেজন্য ইচ্ছা করেই সে ঐসব কথা আরও নীরস করে আমাদের বলতো। বলতো, "তাহলে ভয় পাচ্ছো? শিগগিরই কোন মোটা-সোটা লোক মরবে। আর কবরে সে অনেক দিন ধরে পচবে।"

আমরা তাকে থামাতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু সে থামতো না। বলতো, "তোমরা জানো তোমাদেরও মরতে হবে। এই নর্দ্দমায় অনেক কাল বেঁচে থাকতে পারবে না।"

ভিয়াখির বলতো, "বেশ। আমরা মরলে স্বর্গে আমাদের দেবদূত করবে।"

ইয়াজের বাবা বিস্ময়ে নিশ্বাস বন্ধ করে বলে উঠতো, "তো—মা—দের? তোমরা? দেবদূত?"

কিন্তু কখন কখন লোকটি গলার স্বর অদ্ভুত ভাবে নামিয়ে বলতো,

“শোন, খোকারা···! পরশু দিন ওরা একটি স্ত্রীলোককে কবর দিয়ে গেছে···বুঝলে ছোকরা. আমি তার ইতিহাস জনি···স্ত্রীলোকটা কি ছিল বল তো?”



সে প্রায়ই নারীদের বিষয় আলোচনা করতো, আর সে-সব আলোচনা হত অশ্লীল। তবুও তার কথার মধ্যে ছিল কতকটা মর্ম্মস্পর্শী ও করুণ ভাব। তার কথা আমরা মন দিয়ে শুন্‌তাম।···



সেখানকার যে-সব নারীদের সে কবর দিয়েছিল তাদের সকলেই জীবনের কাহিনী সে জানতো।

আমি যখন সেই অতীতের দিকে ফিরে তাকাই তখন দেখি আমাদের দিন খারাপ কাটেনি। অসঙ্গতিপূর্ণ সেই স্বাধীন জীবন ছিল আমার কাছে মোহন।

স্কুলে আবার আমার দিনগুলি হয়ে উঠলো কঠোর ও দুঃখের। ছেলেরা আমার নাম রেখেছিল “ন্যাকড়া কুড়ুয়ে” ও “ভবঘুরে।” একদিন তাদের সঙ্গে ঝগড়ার পর তারা শিক্ষককে বল্‌লে আমার গা থেকে নর্দ্দামার গন্ধ বার হচ্ছে, তারা আমার পাশে বসতে পারছে না। মনে পড়ে, এই অভিযোগটি আমাকে কতখানি মনকষ্ট দিয়েছিল। তারপর আমার পক্ষে স্কুলে যাওয়া হল কত কঠিন। অভিযোগটা হয়েছিল বিদ্বেষ বশে। প্রত্যহ সকালে আমি ভাল করে স্নান করতাম; এবং যে-পোশাক পরে ন্যাকড়া কুড়োতাম সে পোশাকে স্কুল যেতাম না।

যাহোক্ পরিশেষে আমি পরীক্ষায় পাস করে বাঁধানো “গস্‌পেল” ও “ক্রিলভের গল্প” এবং “ফাতা-মারগানা” নামে আর একখানি বই পুরস্কার পেলাম। শেষের বইখানা বাঁধানো ছিল না; নামটাও ছিল আমার কাছে দুর্ব্বোধ্য। সেই সঙ্গে আমাকে প্রশংসা করে একখানি

প্রশংসা-পত্রও কর্ত্তারা দিয়েছিলেন। পুরস্কারগুলি বাড়ি নিয়ে গেলে দাদামশায় খুশি হয়েছিলেন এবং আমাকে তাঁর মনের কথাটিও জানিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বইগুলো আমার কাছ থেকে নিয়ে বাক্সে বন্ধ করে রাখবেন। দিদিমা দিন কতক অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন। তাঁর হাতে একটি কপর্দকও ছিল না। দাদামশায় অনবরত দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন আর বলতেন, "তুমি আমার সব খেয়ে ফেলবে। উঃ!" তাই আমি বইগুলি একটি ছোট দোকানে নিয়ে গিয়ে পঞ্চান্ন কোপেকে বেচে টাকা কয়টি দিদিমাকে দিলাম। আর প্রশংসা-পত্রখানার ওপর যা-তা লিখে নষ্ট করে সেখানা দিলাম দাদামশায়ের হাতে। দাদামশায় সেখানা উল্টে না দেখেই আমার হাত থেকে নিয়ে এক জায়গায় সরিয়ে রাখলেন; আমার নষ্টামীটা তখন ধরতে পারলেন না, কিন্তু পরে তার মূল্য আমি পেয়েছিলাম।

স্কুল-জীবন তো শেষ হয়ে গেল। আবার আমি পথে পথে দিন কাটাতে আরম্ভ করলাম। জীবনটা হল আগের চেয়ে ভালই।

তখন বসন্তের মাঝামাঝি; সহজেই টাকা রোজগার হচ্ছিল। রবিবারে আমাদের সমগ্র দলটি খুব ভোরে উঠে যেত মাঠে বা বনে। বনের গাছ-পালা তখন কচি কোমল, সতেজ পাতায় ভরে উঠেছে। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এলে তবে সকলে বাড়ি ফিরতাম। তখন সকলেই হতাম ক্লান্ত। কিন্তু সে ক্লান্তিতে ছিল আনন্দ। আমাদের পরস্পরের সঙ্গ হত আরও নিবিড়।

কিন্তু এই ধরনের জীবন বেশি দিন থাকে নি। দেনা করবার ফলে আমার বি-পিতাকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়েছিল। তাই তিনি আবার অদৃশ্য হয়েছিলেন। মা আমার ছোট ভাই নিকোলাইকে

নিয়ে দাদামশায়ের কাছে ফিরে এসেছিলেন। কাজেই আমাকে নার্স হতে হল। কারণ দিদিমা গিয়েছিলেন বাইরে এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে থেকে তার কাপড় সেলাই করবার কাজ করতে।

মা এমন দুর্ব্বল ও রক্তশূন্য হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি প্রায় হাঁটতেই পারতেন না। তিনি যখন চারধারে তাকাতেন, তাঁর চোখে একটা ভীষণ ভাব ফুটে উঠতো। আমার ভাইটির হয়েছিল গলগণ্ড এবং তার সারা গায়ে হয়েছিল যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত। সে এমন দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছিল যে, জোরে কাঁদতে পারতো না। যখন ক্ষিদে পেত তখন কেবল একটু গোঁ গোঁ শব্দ করতো। তাকে খাওয়ালে সে ঘুমিয়ে পড়তো এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিড়াল ছানার মতো খুব আস্তে অদ্ভুত ভাবে মিউ মিউ শব্দ করতো।

তাকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে দাদামশায় বলেছিলেন, "ওর প্রচুর ভাল খাবার খাওয়া দরকার; কিন্তু তোমাদের সকলকে খাওয়াবার মতো যথেষ্ট আমাদের নেই।"

মা ঘরের কোণটিতে বিছানায় বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাঙা গলায় বলেছিলেন, "ও বেশি কিছু চায় না।"

—"একজনের জন্যে একটু, আর একজনের জন্যে আর একটু এম্নি কোরেই গাদা হয়।" তারপর আমার দিকে ফিরে হাত নেড়ে বলেছিলেন, "নিকোলাইকে রোদে রাখতেই হবে—খানিকটা বালির মধ্যে।"

আমি এক বস্তা পরিষ্কার বালি টেনে বার করে যেখানে খুব রোদ পড়তো সেখানে ঢেলে গাদা করে, দাদামশায়ের কথামতো আমার ভাইটিকে তার মধ্যে গলা অবধি ডুবিয়ে বসিয়ে রাখতাম। ছেলেটা বালির মধ্যে বসে থাকতে ভালবাসতো; বড় মিষ্টি করে কপচাতো,

তার উজ্জ্বল চোখ দুটি মেলে আমার দিকে তাকাতো। তার চোখ দুটি ছিল অসাধারণ। তাতে সাদা মণি ছিল না, ছিল কেবল নীল তারা ; আর চারধারে উজ্জ্বল বেষ্টনি।



আমার এই ভাইটির প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। জানলার নিচে, তার পাশে বালির ওপর যখন শুয়ে থাকতাম মনে হত সে যেন আমার মনের সব কথা বুঝতে পারছে। জানলাটা দিয়ে দাদামশায়ের তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ শোনা যেত. “ও যদি মরে—মরতে ওর বেশি কষ্ট হবে না—তুমি বাঁচবার সুযোগ পাবে।”

মা কাসির দমকে তাঁর কথার উত্তর দিতেন।

হাত দুখানি বালি থেকে মুক্ত করে ছোট সাদা মাথাটি দোলাতে দোলাতে সে আমার দিকে বাড়িয়ে দিত। তার মাথায় চুল ছিল সামান্য ; যে-কয়টি ছিল তাও প্রায় সাদা। তার ছোট মুখখানিতে ছিল বৃদ্ধ ও বিজ্ঞের মতো ভাব। আমাদের কাছে যদি কোন মুরগী বা বিড়াল আসতো কোলাই তার দিকে তাকিয়ে থাকতো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে প্রায় অর্থভরা হাসি হাস্‌তো। তার সেই হাসি আমাকে বিচলিত করতো। একি সম্ভব যে সে বুঝ্‌তে পারতো, তার সঙ্গ আমার ভাল লাগছে না, আমি তাকে সেখানে রেখে বাইরে রাস্তায় ছুটে যেতে চাই ?

আমাদের বাড়ির আঙিনাটা ছিল ছোট, চাপা ও নোংরা। ফটকের কাছ থেকে ধোবিখানা অবধি ছিল ছাপ্পড়ের পর ছাপ্পড় ও ছোট ছোট কুঠরি। সেগুলোর চাল ছিল পুরোনো নৌকো ভাঙা দিয়ে তৈরী। যে-সব খোঁটা, তক্তা, ভিজে কাঠের টুক্‌রো আশ-পাশের বাসীন্দারা ওকার বরফ গলবার বা বন্যার সময় সংগ্রহ করতো সে-সবই ছিল তার উপকরণ। আঙিনাটি জুড়ে ছিল নানা রকমের

ভিজে কাঠের গাদা। রোদে সেগুলো রসে উঠ্‌তো ও পচা গাঢ় দুর্গন্ধ ছাড়তো।



আমাদের পাশের বাড়িটা ছিল একটা কসাইখানা। সেখানে ছাগল-ভেড়া-বাছুর কাটা হত। প্রায় প্রত্যহ সকালে সেখান থেকে শোনা যেত বাছুরের ডাক ও ভেড়ার কাতর চীৎকার। এবং সময়ে সময়ে রক্তের গন্ধ এমন উগ্র হয়ে উঠতো যে আমার মনে হত যে সেটা বাতাসে যেন লাল জালের মত হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

বাছুর-ভেড়াগুলোর শিংয়ের মাঝখানে কসাইরা যখন কুড়ুলের হাতল দিয়ে মারতো আর তারা চীৎকার করতো কোলাই তখন চোখ মিট মিট করে তাকাতো, ঠোঁট দিয়ে শব্দ করতো, যেন সে স্বরটা নকল করতে চায়; কিন্তু পারতো না, কেবল করে উঠতো, "ফু—"

দুপুরে জানলা দিয়ে গলা বার করে দাদামশায় ডাকতেন, "খাবার।"

বাচ্চাটিকে তিনি নিজে খাওয়াতেন। তাকে হাঁটুর ওপর বসিয়ে তার মুখে আলু ও পাঁউরুটি গুঁজে দিতেন। সেগুলো তার পাতলা ঠোঁট দুখানির চারধারে ও থুৎনিতে লেগে যেত। তাকে একটু খাইয়েই দাদামশায় তার ফোলা পেটটায় আঙুলের খোঁচা দিয়ে নিজের মনে আলোচনা করতেন, "এতেই হবে, না, আরও একটু দেব?"

তখন অন্ধকার কোণ থেকে মায়ের গলার স্বর শোনা যেত, "দেখ! ও আরও পাঁউরুটি চায়।"

দাদামশায় বলতেন, "বোকা মেয়ে! ও কি করে বুঝবে ওর কতখানি খাওয়া দরকার?" কিন্তু আবার তাকে খানিকটা খেতে দিতেন।

এই খাওয়ানোর ব্যাপারটা দেখে আমার বড় লজ্জা বোধ হত; আমার গলার ভেতর যেন একটা পুঁটুলি ঠেলে উঠ্‌তো।

অবশেষে দাদামশায় বলতেন, "এতেই হবে। ওকে মায়ের কাছে নিয়ে যাও।"

কোল্যাকে কোলে নিতাম। সে কাঁদতে কাঁদতে টেবিলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিত। মা অতি কষ্টে উঠে শুষ্ক, মাংসহীন, লম্বা, সরু হাত দুখানা বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতেন।

তিনি প্রায় মূক হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর গাঢ় কণ্ঠস্বর শোনাই যেত না। তিনি কোণটিতে সারাদিন নীরবে পড়ে থেকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন আমি তা অনুভব করতাম। জানতামও। বিশেষ করে আঙিনায় যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসতো দাদামশায় প্রায়ই মৃত্যুর কথা বলতেন। তাঁর বলার রীতি ছিল বৈচিত্র্যহীন। তখন জানলার ধারে একটা পচা, তপ্ত দুর্গন্ধ ঘুরে বেড়াতো।

দাদামশায়ের জানলাটি ছিল সামনের কোণটিতে, প্রায় বিগ্রহটির তলায়। তিনি সেদিকে মাথা করে শুতেন। অন্ধকারে বহুক্ষণ তাঁর বকর বকর শোনা যেত। "আমাদের মরবার সময় হয়ে এসেছে। ভগবানের সামনে কেমন ভাবে দাঁড়াবো? তাঁকে কি বলবো? সারা জীবন ধরে আমরা সংগ্রাম করে আসছি। আমরা কি করেছি? আর কি উদ্দেশ্যে সে-সব করলাম?"

আমি স্টোভ আর জানলাটির মাঝে মেঝেয় শুতাম। শোবার যথেষ্ট জায়গা পেতাম না বলে উনুনের মধ্যে পা দুখানা ঢুকিয়ে দিতাম। আরশুলাগুলো আমার পায়ে শুড়শুড়ি দিত। এই কোণটিতে আমি একটুও আনন্দ বা আরাম পেতাম না। কারণ দাদামশায় রাঁধবার সময় উনুন খোঁচানো ডাণ্ডাটার গোড়া দিয়ে জানলাটা অনবরত

ভাঙতেন। দাদামশায়ের মতো চালাক লোককে ডাণ্ডাটার আগা কেটে ছোট করে না নিতে দেখে আমার বড় মজা লাগতো; খুব আশ্চর্য্য বোধ হত।



একদিন উনুনে যখন পটে একটা কি সিদ্ধ হচ্ছিল তিনি ডাণ্ডাটা তখন এমন অসতর্ক ভাবে চালিয়েছিলেন যে জানলার ফ্রেমটা ও দুখানা সার্সি গিয়েছিল ভেঙে আর পটটা উল্টে পড়ে উনুনটাকেও আস্ত রাখেনি। বৃদ্ধ তাতে এমন রেগে উঠেছিলেন যে, মেঝেয় বসে চীৎকার করেছিলেন।

সেদিন তিনি বেরিয়ে গেলে আমি একখানা রুটি-কাটা ছুরি দিয়ে ডাণ্ডাটার প্রায় সিকি বা এক তৃতীয়াংশ কেটে ফেলে দিলাম। কিন্তু যখন সেটা তাঁর চোখে পড়লো তিনি আমাকে ভৎর্সনা করলেন, "শয়তান। ওটা করাত দিয়ে কাটা উচিত ছিল। টুকরোটা দিয়ে আমরা একটা বেলন তৈরি করে বেচ্‌তে পারতাম!" এবং হাত দুখানা উন্মাদের মতো ছুড়ে তিনি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মা বললেন, "তোমার ওতে মাথা গলানো উচিত হয় নি…"

মা আগষ্ট মাসে এক রবিবারে প্রায় দুপুরের দিকে মারা যান। আমার বি-পিতা তার অল্পকাল আগে ফিরে এসেছিলেন এবং কোথায় যেন একটা চাকরি পেয়েছিলেন। ষ্টেশনের ধারে একটা নতুন ফ্ল্যাটে দিদিমা কোলাইকে তাঁর কাছে নিয়ে যান।

মৃত্যুর দিন সকালে মা আমাকে বললেন, "ইউজেন বাসিলিয়েফের কাছে যাও। তাকে আমার কাছে আসতে বলো।"

তাঁর এমন খাটো, হালকা, পরিষ্কার কণ্ঠস্বর আমি সম্প্রতি শুনি নি।

বিছানা থেকে উঠে দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে তিনি আবার বললেন, "ছুট দাও—শিগগির।"

আমার মনে হচ্ছিল, তিনি হাসছেন, তাঁর চোখে ফুটে উঠেছে এক নতুন আলো।

আমার ধর্ম-পিতা গিয়েছিলেন গির্জ্জায়। দিদিমা আমাকে পাঠালেন তাঁর জন্য কিছু নস্য আনতে। তৈরী নস্য হাতের কাছে ছিল না বলে আমাকে দাঁড়াতে হল। তারপর নস্য নিয়ে দিদিমার কাছে ফিরে এলাম।



সেখান থেকে দাদামশায়ের বাড়ি গিয়ে দেখি মা একটি পরিষ্কার ও লিলাক-রঙের ফ্রক পরে, সুন্দর করে চুল বেঁধে টেবিলের ধারে বসে আছেন। তাঁকে আগের মতোই দেখাচ্ছে চমৎকার। এক অব্যক্ত আশঙ্কায় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি ভাল বোধ করছো, মা!"

তিনি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "এদিকে এস! কোথায় ছিলে? অ্যাঁ?"

আমি উত্তর দেবার আগেই তিনি এক হাতে আমার চুলের মুঠি ধরে আর এক হাতে করাত থেকে তৈরী একখানা ছুরি নিয়ে ছুরিখানা বার কয়েক ঘুরিয়ে আমাকে তার ফলার চওড়া দিকটা দিয়ে মারলেন। ছুরিখানা তাঁর হাত থেকে পিছলে মেঝেয় পড়ে গেল। বললেন, "তুলে দাও!"

ছুরিখানা কুড়িয়ে নিয়ে আমি টেবিলের ওপর ছুড়ে ফেললাম। তিনি আমাকে তাঁর কাছ থেকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। আমি ষ্টোভের ধারে বসে সভয়ে তাঁর কাজ-কর্ম্ম লক্ষ্য করতে লাগলাম।

চেয়ার থেকে উঠে তিনি ধীরে নিজের জায়গাটিতে গিয়ে বিছানায়

শুয়ে পড়ে রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগলেন। তাঁর হাত দু'খানি নড়তে লাগলো; দুবার মুখে হাত না ঠেকে লাগলো বালিশে। আমাকে বললেন, "একটু জল দাও..."



একটি কলসী থেকে একটি পেয়ালায় খানিকটা জল ঢেলে তাঁকে দিলাম। তিনি কষ্টে মাথা তুলে একটু জল খেলেন। তারপর তাঁর ঠাণ্ডা হাতখানি দিয়ে আমার হাতখানা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গভীর শ্বাস টানলেন। তারপর কোণে যেখানে বিগ্রহটি ছিল সেদিকে একবার তাকিয়ে আমার দিকে চোখ ফেরালেন ও ঠোঁট দুখানি নাড়লেন যেন হাসলেন। এবং ধীরে তাঁর চোখের দীর্ঘ পাতা দুখানি বন্ধ করলেন। তাঁর কনুই দুটি দেহের দুপাশে লেগে রইলো; আঙুলগুলি হালকাভাবে একটু একটু নড়ছিল। হাত দুখানি ধীরে বুকের ওপর উঠে গলার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। তাঁর মুখখানির ওপর পড়লো ছায়া; তাতে সারা মুখখানি গেল ছেয়ে। চামড়ার রঙ হয়ে গেল হলদে, নাকটিকে করে ফেললো তীক্ষ্ণ। তাঁর মুখটুকু গেল হাঁ হয়ে যেন তিনি কিসের জন্য বিস্মিত হয়েছেন; কিন্তু তাঁর নিশ্বাস শোনা যাচ্ছিল না। জানিনা, কতক্ষণ মায়ের বিছানার পাশে পেয়ালাটি হাতে করে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখখানিকে অসাড় ও পাংশু হয়ে যেতে দেখেছিলাম।



দাদামশায় যখন ঘরে এলেন তাঁকে বললাম, "মা মারা গেছেন।"

তিনি বিছানার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, "তুমি মিছে কথা বলছো কেন?" তিনি ষ্টোভের কাছে গিয়ে জল-ছিটুনিটা নিয়ে ভীষণ জোরে নাড়তে লাগলেন।

মা মারা গেছেন জানতাম। আমি দাদামশায়ের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, তিনিই ব্যাপারটা জেনে নিন।

আমার বি-পিতা এলেন খালাসির পোশাক পরে মাথায় সাদা টুপি দিয়ে। তিনি নিঃশব্দে একখানি চেয়ার তুলে মায়ের বিছানার কাছে সেটা নিয়ে গেলেন এবং হঠাৎ সেটা দড়াম করে মেঝেয় ফেলে শিশুর মতো গলায় জোরে বলে উঠলেন, "হা—ও মরে গেছে। দেখুন!"

দাদামশায় চোখ দুটি বিস্ফারিত করে সেই যন্ত্রটি হাতে নিয়ে স্টোভের কাছ থেকে অন্ধের মতো হোঁচট খেয়ে নিঃশব্দে সরে গেলেন।

* * * * *

মায়ের অন্ত্যেষ্টির কয়েক দিন পর দাদামশায় আমাকে বললেন, "লেক্‌সি, আর তুমি আমার গলগ্রহ হয়ো না। এখানে তোমার আর স্থান নেই। তোমাকে সংসার-পথে বেরিয়ে পড়তে হবে।"

তাই আমি বেরিয়ে পড়লাম দুনিয়ার পথে।

শেষ